لا اله الا الله محمد رسول الله

নবীনেতা

মুহাম্মদ মুস্তফা

(সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম)

হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রাঃ)
(খলীফাতুল মসীহ্ সানী আলমুস্‌লেহুল মাওউদ)

ভাষান্তর ঃ- শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান

প্রকাশনায় ঃ
প্রকাশনা বিভাগ,
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪ বক্‌শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

প্রকাশকাল ঃ
ঈদুল আযহা - ১৪১৩
১৯ জ্যৈষ্ঠ - ১৪০০
২ জুন - ১৯৯৩

প্রচ্ছদ ঃ মীর মোবাশ্বের আলী

মুদ্রণে ঃ
ইন্টারকন এসোসিয়েটস
৩/১, গার্ডেন রোড, ঢাকা।

শুভেচ্ছা বিনিময় ঃ টাকা ৫০.০০ (পঞ্চাশ) মাত্র

ভূমিকা

এ হচ্ছে খোদা এবং রসূলের এক সত্যিকার প্রেমিকের নির্মল হৃদয় থেকে উৎসারিত পূত-পুণ্য কথার ডালি, যা পেশ করা হচ্ছে সম্মানিত পাঠকবৃন্দের মঙ্গলার্থে। এতে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমগ্র জীবনের অবস্থাদি এবং ঘটনাবলী এমন আকর্ষণীয় এবং হৃদয়গ্রাহীভাবে বর্ণিত হয়েছে, যা নিজেই নিজের তুলনা। হয়তো উচ্চাঙ্গীন এই রচনার সৌন্দর্য প্রকাশ করা সম্ভব নিম্নের চরণদু'টির দ্বারা ঃ

أَحَادِيثُ قَدْ صِيغَتْ فَتَلْهِي بِحُسْنِهَا
عَنِ الْوَشْيِ وَشُمَّتْ لَا غَنْتْ عَنِ الْمِسْكِ

অর্থাৎ- এর বিষয়বস্তুর পরিবেশনা এবং এর রচনাশৈলী এমন অনবদ্য যে, যা তার আপনার অলঙ্কারে আপনি সজ্জিত এবং আপনার রঙে আপনি রঞ্জিত হয়ে স্বতন্ত্র এক সৌন্দর্যে অনুপম হয়ে উঠেছে। এবং সুগন্ধিযুক্ত কোন জিনিষের সঙ্গে যদি এর তুলনা করা হয়, তাহলে বলতে হবে যে, এর সুঘ্রাণ কস্তুরীর ঘ্রাণকেও হার মানায়।

আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর বান্দার প্রেমভরা হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ থেকে উত্থিত এই পুণ্য কথাকে মানবের হেদায়াত বা সৎপথ প্রদর্শনের কারণ করুন, এবং তাঁর রসূল মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লামের সত্যতা প্রকাশের মাধ্যম করুন। আমীন।

খাকসার

জালালুদ্দীন শামস্
(ইনচার্জ, তালীফ ও তসনিফ)

রাবওয়া
ডিসেম্বর, ১৯৫৪ ইং

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নিবেদন

আল্‌হামদুলিল্লাহ। **'নবীনেতা মুহাম্মদ মুস্তফা** সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম' পুস্তকটি প্রকাশিত হলো। এই পুস্তকের মূল 'নবীয়ূঁ কা সরদার' গ্রন্থখানি বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতের দ্বিতীয় খলিফা হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ (রাঃ) কৃত কোরআন করীমের মহাভাষ্য 'তফসীরে কবীর' গ্রন্থের ভূমিকার অংশ বিশেষ।

হযরত রসূলে পাক (সাঃ) এর এই জীবনী গ্রন্থখানির দু'একটি বৈশিষ্ট্যের কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজনঃ

(১) নিরপেক্ষ ইতিহাস রচনা বড়ই কঠিন। সে কারণেই প্রায় সব ইতিহাসের তথ্যাদি নিয়েই বিতর্ক ওঠে। এই জীবনী গ্রন্থটিতে, খুব বিস্তারিত না হলেও, মনে হয়, গ্রন্থকার আঁহযরত (সাঃ) এর জীবনকে দেখে দেখে লিখেছেন। নিরপেক্ষ মন নিয়ে লিখেছেন। কাজেই, এই গ্রন্থখানির আগা-গোড়াই ত্রুটিহীন বিশ্বস্ত দলীল। তাই, এর বিবরণে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই।

(২) বৈরী ও বিদ্বেষপরায়ণ লেখকরা আঁহযরত (সাঃ) সম্পর্কে এমন বহু কথা লিখে গেছে যার সবটাই হিংসা, ঘৃণা নাপাকি ও কুরুচির কালিতে লেখা। এই প্রামান্য গ্রন্থটিতে, তাদেরকে প্রায় ক্ষেত্রে স্পর্শ না করেই, তাদের সমস্ত অপবিত্র মিথ্যার এবং আপত্তির জবাব দান করা আছে। উল্লেখ্য যে, গ্রন্থটির এই বিস্ময়কর স্টাইলের অনুসরণ করেছেন (স্যার) চৌধুরী মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান (রাঃ) তাঁর রচিত Muhammad : Seal of the Prophets গ্রন্থে।

(৩) বর্ণনায় এই গ্রন্থ অনবদ্য। প্রামানিকতায় অনন্য। হৃদয়গ্রাহিতায় অনুপম। এই রচনার ছত্রে ছত্রে স্ফূরিত হচ্ছে প্রকৃত তত্বের নির্মল আলো। এর পাতায় পাতায় পবিত্র আত্মার পরশ অনুভূত হয়। তাই বলা যায়, জীবনী সংক্রান্ত রচনায় বিশ্বসাহিত্যে এর তুলনা নেই।

বাংলা অনুবাদে মূল উর্দু রচনার অন্তরঙ্গের মাধুর্য এবং বহিরঙ্গের সৌন্দর্য ধরে রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা নেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু স্বার্থকতায় পূর্ণতা আসেনি। এছাড়া, কিছু কিছু মুদ্রণ প্রমাদও রয়ে গেছে। এজন্য আমরা দুঃখিত।

বাংলা তরজমা দেখে দিয়েছেন জনাব মকবুল আহমদ খান, নায়েবে ন্যাশনাল আমীর, ২য় এবং প্রুফ দেখেছেন জনাব মৌঃ মুতিউর রহমান। আল্লাহ্‌ পাক তাঁদেরকে যাযায়ে খায়ের দান করুন। এবং তিনি কৃপা করে আমাদের সবাইকে কবুল করুন। আমীন।

বিনীত
অনুবাদক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুসরণ-অনুকরণের সার্থকতায়

মানব স্বভাবে অনুসরণ-অনুকরণের প্রবণতা রয়েছে। এ প্রবণতার সঠিক ব্যবহারে ব্যক্তি ও সমাজ প্রভূতভাবে উপকৃত হয়, অপব্যবহারে তেমনি উভয়ই মারাত্মকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এমন কি অনুসরণ-অনুকরণ মানব জীবনকে সার্থকতায় বা ব্যর্থতায় পর্যবসিত করতে পারে। আদর্শগত ব্যাপারে কথাটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্ তাঁর প্রিয়তম সৃষ্টি মানুষকে আদর্শগত অনুসরণ-অনুকরণের সাম্ভাব্য বিভ্রান্তি হতে বাঁচানোর জন্য নবী প্রেরণ করে আসছেন। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পূর্বেকার নবীগণের প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট কোন গোষ্ঠি, সম্প্রদায় বা এলাকার জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। অপরদিকে হযরত নবী করীম (সাঃ) বিশ্বনবী রূপে প্রেরিত হয়েছেন। তাই তাঁর অনুসরণ-অনুকরণে বিশ্ববাসী সকলের সামগ্রিক কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

সঠিক অনুসরণ-অনুকরণের জন্যে আদর্শ পুরুষের সঠিক জীবনীর সাথে পরিচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এদিক থেকে বিবেচনা করলে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া যায় না, তা হলো মহানবী (সাঃ)-এর পূর্বেকার কোন নবীরই জীবনী এবং কুরআন পাকের পূর্বেকার কোন ঐশী কিতাবই সঠিক অবস্থায় পাওয়ার উপায় নেই। কেননা তাঁদের জীবনীতে ও কিতাবে অনুগামীরা প্রচুর যোগ বিয়োগ করে মূলকে অনেকাংশে হারিয়ে ফেলেছে। অপরদিকে আল্লাহ্ নিজ হাতে কুরআন পাকের হেফাযতের ভার নেয়ায় তা মানবীয় হস্তক্ষেপ হতে রক্ষা পেয়েছে ও পাচ্ছে। অবশ্য রসূলে করীম (সাঃ)-এর জীবনীতে তাঁর অনুগামীদের দাবীদার ও অন্যান্য অনেকেই কল্প-কাহিনীর সংযোগ ঘটাতে কোনই কার্পণ্য করেনি। এ কল্পকাহিনীর বেড়াজাল ছিন্ন করতেই হবে নতুবা তাঁকেও সঠিকভাবে জানা, বুঝা ও অনুসরণ-অনুকরণ করা যাবে না। কুরআন পাকে আল্লাহ্ রসূল করীম (সাঃ) সম্পর্কে যে সব কথা বলেছেন তাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে জগতের সামনে তাঁর জীবনী ও সমসাময়িক ঘটনাবলীর তাৎপর্য তুলে ধরতে হবে। এক্ষেত্রে আহমদীয়া মুসলিম জামাতকে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে হবে। বস্তুতঃ 'নবীয়ুঁ কা সরদার (সাঃ)' গ্রন্থের সম্মানিত প্রণেতা হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহ্মদ (রাঃ) সেই কর্তব্যই সম্পাদন করেছেন। তাই এই জীবনীতে হুযূর (সাঃ)-কে সঠিকভাবে অনুসরণ-অনুকরণের প্রচুর উপাদান পাওয়া যাবে।

বাংলায় 'নবীনেতা মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)' নামে এ মহৎ গ্রন্থটির তর্জমা ও প্রকাশনায় যিনি এবং যাঁরা যেভাবে জড়িত আছেন তাঁদের সামগ্রিক কল্যাণ কামনা করছি। তাঁদেরকে পুরস্কৃত করুন আল্লাহ্র দরবারে সে আকুতিও জানাচ্ছি। আমীন।

খাকসার

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ।

তারিখ ঃ
ঈদুল আযহা, ১৪১৩
১৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪০০
২ জুন , ১৯৯৩

শুদ্ধি পত্র

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২২	২১	এইভাবে	এই ভেবে
৩১	১৯	ক্রোধ	ক্রোধে
৩৫	৩১	থামলো	থামালো
৫৩	৫	পেড়েছিল	পেরেছিল
৭৩	২৯	পহাড়া	পাহারা
১৬৩	২৩	লিখলেন	লিখালেন
১৯৬	১২	কে	সে
১৯৭	১৪	করলেন	করছেন
১৯৭	২০	দেয়	দেন
২০০	২৫	সেনাবাহিনী	সেনাবাহিনীসহ
২০১	২৩	জাতি	জাতির
২২৮	২২	চান	চাননি

সূচীপত্র

	ক্রমিক নং	পৃষ্ঠা নং
১।	সূচনা	১১
২।	হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর আবির্ভাব কালে মূর্তি-পূজা	১৪
৩।	মদ ও জুয়া	১৬
৪।	বাণিজ্য	১৬
৫।	আরবদের অন্যান্য অবস্থা, অভ্যাস ও বৈশিষ্ট্য	১৭
৬।	মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জন্ম	১৯
৭।	মজলিসে-এ-হিল্‌ফুল ফুজুল	১৯
৮।	আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সাথে হযরত খাদিজা (রাঃ)-এর বিবাহ	২১
৯।	গোলামদের মুক্তিদান ও জায়েদ প্রসঙ্গ	২২
১০।	হেরা গুহায়-আল্লাহ্‌র এবাদতে	২৪
১১।	প্রথম কোরআনী ওহী	২৪
১২।	ঈমান আনলেন হযরত আবু বকর (রাঃ)	২৬
১৩।	মুমিনদের ছোট্ট জামাত	২৭
১৪।	মক্কার নেতাদের বিরোধিতা	২৭
১৫।	মুমিন ক্রীতদাসদের উপরে মক্কার কাফেরদের অত্যাচার	২৯
১৬।	স্বাধীন মুসলমানদের উপরে অত্যাচার	৩২
১৭।	রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উপরে অত্যাচার	৩৪
১৮।	ইসলামের বাণীর প্রচার	৩৬
১৯।	আবু তালিবের কাছে কাফেরদের অভিযোগ এবং আঁ-হযরত (সাঃ)-এর অবিচলতা	৩৭
২০।	আবিসিনিয়ায় হিযরত	৩৯
২১।	হযরত উমরের (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ	৪২
২২।	মুসলমানদেরকে বয়কট করা	৪৫
২৩।	আঁ-হযরত (সাঃ)-এর তায়েফ সফর	৪৬
২৪।	মদীনাবাসীদের ইসলাম গ্রহণ	৫২
২৫।	ইস্‌রা (কাশফী ভ্রমণ)	৫৫
২৬।	রোমানদের বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী	৫৫
২৭।	আকাবার প্রথম বা'য়াত	৬০
২৮।	মদীনায় হিযরত	৬২

২৯।	সোরাকার পশ্চাদ্ধাবন এবং তার সম্পর্কে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর এক ভবিষ্যদ্বাণী	৬৫
৩০।	আঁ-হযরত (সাঃ)মদীনা গেলেন	৬৭
৩১।	হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ)-এর বাড়ীতে অবস্থান	৭০
৩২।	হযরত আনাস (রাঃ)-এর সাক্ষ্য	৭১
৩৩।	মক্কা থেকে পরিবারের লোকজনকে আনয়ন এবং মস্‌জিদুন্ নববীর ভিত্তি স্থাপন	৭২
৩৪।	মদীনার পৌত্তলিক গোত্রগুলির ইসলাম গ্রহণ	৭২
৩৫।	মুসলমানদেরকে কষ্ট দেওয়ার লক্ষ্যে মক্কাবাসীদের পুনরায় প্রচেষ্টা	৭৪
৩৬।	আনসার ও মুহাজেরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন	৭৫
৩৭।	মুহাজের, আনসার ও ইহুদীদের মধ্যে চুক্তি	৭৬
৩৮।	মক্কাবাসীদের নতুন দুষ্কৃতি	৭৮
৩৯।	আঁ-হযরত (সাঃ)-এর প্রতিরক্ষামূলক পরিকল্পনা	৭৯
৪০।	মদীনায় ইসলামী শাসনের ভিত্তি স্থাপন	৮০
৪১।	কোরেশদের বাণিজ্য কাফেলার আগমন এবং বদর যুদ্ধ	৮১
৪২।	একটি শক্তিশালী ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা	৮৮
৪৩।	বদরের যুদ্ধবন্দী	৯০
৪৪।	'ওহোদ' এর যুদ্ধ	৯১
৪৫।	বিজয় পরাজয়ে পরিণত	৯৪
৪৬।	ওহোদ থেকে প্রত্যাবর্তন এবং মদীনাবাসীদের আত্মবিলীনতা	১০১
৪৭।	মদ হারাম ঘোষণা ও তার প্রভাব	১০৪
৪৮।	ওহোদ যুদ্ধের পর কাফের গোত্রগুলোর অপবিত্র মৈত্রী	১০৬
৪৯।	কোরআনের সত্তর জন হাফিযকে হত্যা করার মর্মান্তিক ঘটনা	১১১
৫০।	বনী মুস্তালিকের যুদ্ধ	১১৩
৫১।	মদীনার উপরে সারা আরবের সম্মিলিত আক্রমণ ঃ খন্দকের যুদ্ধ	১১৬
৫২।	খন্দকের যুদ্ধের সময়ে ইসলমী সৈন্যের সঠিক সংখ্যা কত ছিল ?	১১৯
৫৩।	বনু কোরায়যার বিশ্বাসঘাতকতা	১২১
৫৪।	মুনাফেক ও মুমিনের অবস্থা	১২৬
৫৫।	ইসলামে মৃতব্যক্তির লাশের সম্মান	১২৮
৫৬।	মুসলমানদের উপরে সম্মিলিত বাহিনীর আক্রমণ	১২৮
৫৭।	বনু কোরায়যা ও মুশরেকদের মিলিত আক্রমণের প্রস্তুতি এবং তাদের ব্যর্থতা	১৩১

৫৮।	বনু কোরায়যার বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি	১৩৪
৫৯।	বনু কোরায়যা কর্তৃক মনোনীত বিচারক সায়াদ (রাঃ)-এর রায় ছিল তৌরাত মোতাবেক	১৩৭
৬০।	মুসলমানদের বিজয়ের সূচনা	১৪০
৬১।	ইহুদী ও খৃষ্টান ধর্মে যুদ্ধনীতি	১৪৩
৬২।	যুদ্ধ সম্পর্কে ইসলামের শিক্ষা	১৪৫
৬৩।	পরিখার যুদ্ধের পর মুসলমানদের উপরে কাফেরদের আক্রমণ	১৫৭
৬৪।	পনের শত সাহাবীসহ রসূলে পাক (সাঃ)-এর মক্কা যাত্রা	১৫৮
৬৫।	হোদায়বিয়ার সন্ধির শর্তাবলী	১৬২
৬৬।	রাজা-বাদশাহ্দের নামে পত্র প্রেরণ	১৬৫
৬৭।	কায়সার-এ রোম হিরাক্লিয়াস-এর নিকট পত্র	১৬৬
৬৮।	রোমান সম্রাট কায়সারের সিদ্ধান্ত ঃ মুহাম্মদ (সাঃ) সত্য নবী	১৬৮
৬৯।	পারস্য সম্রাটের নামে পত্র	১৭২
৭০।	আবিসিনিয়ার বাদশাহ্ নাজ্জাশীর নামে পত্র	১৭৪
৭১।	মিশরের শাসনকর্তা মুকাউকিসের নামে পত্র	১৭৭
৭২।	বাহ্রাইনের আমীরের নামে পত্র	১৭৯
৭৩।	খায়বারের পতন	১৮০
৭৪।	তিনটি বিস্ময়কর ঘটনা	১৮২
৭৫।	কাবার তওয়াফ (প্রদক্ষিণ)	১৮৬
৭৬।	আঁ হযরত (সাঃ)-এর বহুবিবাহের বিরুদ্ধে আপত্তির একটি জবাব	১৮৭
৭৭।	খালেদ বিন্ ওলিদ এবং উমর ইবনুল আস-এর ইসলাম গ্রহণ	১৮৮
৭৮।	মূতার যুদ্ধ	১৮৮
৭৯।	মক্কা বিজয়	১৯৪
৮০।	হোনায়েনের যুদ্ধ	২১২
৮১।	মক্কা ও হোনায়েনের বিজয়ের পর	২১৮
৮২।	তাবুকের যুদ্ধ	২২১
৮৩।	বিদায় হজ্জ এবং আঁ-হযরত (সাঃ)-এর ভাষণ	২২৫
৮৪।	আঁ-হযরত (সাঃ)-এর ওফাত	২২৯
৮৫।	আঁ হযরত (সাঃ)-এর মৃত্যুতে সাহাবাগণের অবস্থা	২৩৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

সূচনা

খোদাতা'লার এ এক অতি বড় নিদর্শন এবং ইসলামের সত্যতারও এক মহিমান্বিত প্রমাণ যে, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামের জীবনের ঘটনাবলী যেরূপ প্রকাশ্যে বিদ্যমান রয়েছে সেরূপ প্রকাশ্যে অন্য আর কোন নবীর জীবনের ঘটনাবলী বিদ্যমান নেই। অবশ্য এতে সন্দেহ নেই যে, এইরূপ বিস্তারিত বিবরণ থাকার দরুনই মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামের উপরে যত বেশী আপত্তি উত্থাপন করা সম্ভব হয়েছে তত বেশী আপত্তি অন্য আর কোন নবীর অস্তিত্বের উপরে উত্থাপন করা সম্ভবপর হয়নি। কিন্তু এতেও কোন সন্দেহ নেই যে, সেই সকল আপত্তি অপনোদনের পর মানুষ যেরূপ পরিশ্রুত হৃদয়ে এবং পরিতুষ্ট চিত্তে মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামের সত্তার সহিত প্রেম করতে পারে, সেরূপ প্রেম অন্য আর কোন মানুষের সাথে কখনই করতে পারে না। কেননা, যাঁর জীবনের ঘটনাবলী গোপন থাকে তার সহিত ভালবাসায় বিপত্তি ঘটবার আশংকা সব সময়েই থেকে যায়। মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামের জীবন তো ছিল একটি উন্মুক্ত গ্রন্থ । শত্রুদের যাবতীয় আপত্তি খণ্ডিত হয়ে যাওয়ার পর সেই গ্রন্থের এমন কোন পৃষ্ঠা আর বাকী থাকে না, যেখান থেকে তাঁর জীবনের অনুরূপ আরও কোনও নতুন দিক বা আপত্তি বের করা সম্ভব; কিংবা তার এমন কোনও পাতা আর বাকী থাকে না যা খুললে অন্য ধরনের আরও কোন তত্ত্ব বা হকীকত আমাদের সামনে উদ্‌ঘাটিত হতে পারে।

আসমানী গ্রন্থসমূহের প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য মানুষের বুদ্ধিতে প্রবেশ করানোর জন্য প্রয়োজন সেগুলির সাথে উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত পেশ করা। এবং সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত কেবল তিনিই হতে পারেন যার উপরে অবতীর্ণ হয় সেই গ্রন্থ। এই বিষয়টি সূক্ষ্মও বটে, দার্শনিকও বটে। কিন্তু অনেক ধর্ম এর কোন তাৎপর্যই উপলব্ধি করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, হিন্দু ধর্ম তো বেদের গ্রন্থগুলোকে পেশ করে থাকে বটে, কিন্তু ঐগুলোর আনয়নকারী ঋষিদের ও মুনীদের ইতিহাস সম্পর্কে একবারেই কিছু বলে না। হিন্দু ধর্মের পণ্ডিতরা আজও পর্যন্ত এর কোন প্রয়োজনও অনুভব করছেন না। একইভাবে, ইহুদী ও

খৃষ্টান পণ্ডিত ও পাদ্রীরা অত্যন্ত খোলাখুলিভাবে বলে থাকেন যে, বনী ইসরাঈলের অমুক নবীর মধ্যে অমুক দোষ ছিল এবং অমুক নবীর মধ্যে অমুক দোষ ছিল। ওঁরা এই কথাটা বুঝতে চান না যে, যে ব্যক্তিকে খোদাতা'লা নিজের বাণীর জন্য মনোনীত করেছেন, সেই বাণী যদি সেই ব্যক্তিরই সংশোধন করতে না পারে, তাহলে তা পরের সংশোধন করবে কীভাবে। এবং, যদি সেই ব্যক্তি সংশোধনের যোগ্য না-ই হতেন, তাহলে খোদাতায়ালা কেন তাঁকে মনোনীত করেছিলেন। এর কারণ আর কি ছিল যে, তিনি তাঁকেই মনোনীত করেছিলেন, অন্য কাউকে করেন নি ? এতে কি খোদাতায়ালার কোন অপারগতা ছিল যে, তিনি যবুরের জন্য বাধ্য হয়েই দাউদকে (আঃ) মনোনীত করেছিলেন? তিনি তো ঐ বনী ইসরাঈলদের মধ্য থেকে অপর কোন ব্যক্তিকেও মনোনীত করতে পারতেন? কাজেই, এই উভয় প্রকারের কথাই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। যদি এরূপ ধারণা করা হয় যে, খোদাতায়ালা যার উপরে তাঁর বাণী অবতীর্ণ করেছিলেন সেই বাণী সেই ব্যক্তিরই সংশোধন করতে পারেনি, কিংবা যদি এরূপ ধারণা করা হয় যে, খোদাতায়ালা এমন এক ব্যক্তিকে মনোনীত করেছিলেন, যে ব্যক্তি সংশোধনের যোগ্যই ছিল না, তাহলে এই উভয় প্রকারের ধারণাই হবে বুদ্ধি-বিবেচনার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আসলে, বিভিন্ন ধর্মে নিজ নিজ গুরুদের নিকট থেকে দূরবর্তী হয়ে পড়ার দরুন (অর্থাৎ সময়ের ব্যবধান বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন) এই ধরনের ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। তবে, এও হতে পারে যে, মানবীয় বুদ্ধি যথেষ্ট পরিপক্ক না হওয়ার কারণে প্রাচীনকালের ঐ সকল ভুল-ভ্রান্তি ঠাহর করা বা উপলব্ধি করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু ইসলামের শুরু থেকেই এর গুরুত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব হয়েছিল। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামের বিবি হযরত আয়েশা রাযি আল্লাহু আনহার বিয়ে হয়েছিল তের/চৌদ্দ বছর বয়সে; এবং মাত্র সাত বৎসরের মত সময় তিনি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলেন। রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর সময় তাঁর (রাঃ) বয়স হয়েছিল একুশ বছর। তিনি (রাঃ) লেখাপড়াও জানতেন না। তথাপি, তাঁর কাছে প্রকৃত তত্ত্ব অতি সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়ে উঠেছিল। একদিন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে রসূলে করীম (সাঃ)-এর চরিত্র সম্পর্কে কিছু জানতে চাইলে তিনি বলেছিলেন,

كَانَ خُلُقُهُ كُلَّهُ الْقُرْآنَ

অর্থ ঃ- তাঁর চরিত্র ছিল সম্পূর্ণ কোরআন। *(বুখারী ও আবু দাউদ)*

অর্থাৎ 'আঁ' হযরত (সাঃ)-এর চরিত্র সম্পর্কে কি জিজ্ঞেস করছ, যা কিছু তিনি বলতেন তা সবই ছিল কোরআন থেকে এবং তাঁর কাজ-কর্ম কোরআনের

বাস্তব তা'লীম বা ডেমনস্ট্রেশন ছাড়া আলাদা আর কিছুই ছিল না। প্রতিটি চারিত্রিক সৌন্দর্য যার বর্ণনা আছে কোরআন করীমে, তার উপরে তাঁর অনুশীলন বা আমল ছিল সার্থক ও পরিপূর্ণ। এবং প্রতিটি আমল বা অনুশীলন যা তিনি করতেন তারই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে কোরআন করীমে'। এই কথা কতই না সূক্ষ্ম! মনে হয়, রসূলে করীম (সাঃ)-এর চরিত্র এত বেশী প্রকাশ্য এবং এত বেশী উৎকৃষ্ট ছিল যে,- একজন নব্যযুবতী যিনি শিক্ষিতাও ছিলেন না, তাঁর দৃষ্টিকেও আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছিল এমনি সামগ্রিকভাবে। হিন্দু, খৃষ্টান, ইহুদী ও মসীহি দর্শন যে বিষয়ের তাৎপর্য অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছে, সেই বিষয়ের তাৎপর্য অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন হযরত আয়েশা রাযি আল্লাহো আনহা। তিনি একটি ছোট্ট কথার মধ্যেই এই সূক্ষ্ম দর্শন ব্যক্ত করেছেন যে, এটা কি করে সম্ভব হতে পারে যে, একজন ভাল লোক, একজন সাধু ব্যক্তি দুনিয়াকে যা শিক্ষা দান করবেন, তা নিজে তিনি অনুসরণ বা আমল করবেন না? অথবা, তিনি নিজে করবেন পুণ্যকাজ, অথচ তা দুনিয়ার জন্য গোপন করবেন? এজন্যই, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামের চরিত্র জানবার জন্য তোমাদের কোন ইতিহাসের প্রয়োজন নেই। তিনি ছিলেন একজন সৎ, সত্যনিষ্ঠ, সরল ও প্রকাশিত মানুষ। তিনি যা বলতেন তা-ই করতেন, এবং যা করতেন তা-ই বলতেন। আমরা তাঁকে দেখেছি তাই কোরআন করীম বুঝেছি, এবং তোমরা যারা পরে আসছ তারাও কোরআন করীম পড় এবং পড়ে মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামকে বুঝ।

"আল্লাহুম্মা সাল্লে 'আলা মুহাম্মাদিন

কামা সাল্লায়তা 'আলা ইব্রাহীমা

ওয়া 'আলা আলে ইব্রাহীমা ওয়া বারেক ওয়া সাল্লেম

ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।"

মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব কালে —

মূর্তি পূজা

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম যে যামানায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই যামানার অবস্থাকেও তাঁর জীবনের একটা অংশ বলে গণ্য করতে হবে। কেননা, সেই প্রেক্ষাপটকে সামনে রাখলেই কেবল মানুষ তাঁর জীবনের ঘটনাবলীর তাৎপর্য সত্যিকার অর্থে উপলব্ধি করতে পারবে। তিনি মক্কা মুকাররমায় জন্ম গ্রহণ করেন। এবং তাঁর জন্ম হয়েছিল সৌর হিসাব মতে ৫৭০ খৃষ্টাব্দের* আগষ্ট মাসে। তাঁর জন্মের পর তাঁর নাম রাখা হয়েছিল 'মুহাম্মদ'— যার অর্থ হচ্ছে, প্রশংসা করা হয়েছে, অর্থাৎ প্রশংসিত। যে সময়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন যে সময়ের সমস্ত লোক, সামান্য কিছু সংখ্যক বাদে, মোশরেক বা অংশীবাদী ছিল। ঐ সমস্ত লোক নিজেদেরকে হযরত ইব্রাহীম আলায়হেস্ সালামের বংশধর বলে দাবী করতো। এবং বিশ্বাস করতো যে, ইব্রাহীম (আঃ) মোশরেক বা অংশীবাদী ছিলেন না। কিন্তু, এতদ্সত্ত্বেও, তারা শিরক বা অংশীবাদিতায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। এবং সেজন্য তারা এই যুক্তিও দেখাত যে, কোন কোন মানুষ উন্নতি করতে করতে খোদাতায়ালার এরূপ নৈকট্যে উপনীত হন যে, তাঁদের শাফায়াত বা সুপারিশ খোদাতায়ালার দরগাহে নিশ্চিতরূপে গৃহীত হয়ে যায়। এবং যেহেতু খোদাতায়ালার সত্তা অতিশয় উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, সেহেতু সব মানুষের পক্ষে তথায় উপনীত হওয়া সম্ভবপর নয়। কেবলমাত্র কামেল ইনসান বা পূর্ণ মানবই সেখানে পৌঁছাতে পারেন। একারণেই, যে কোন সাধারণ মানুষের জন্য এটা জরুরী যে, সে যেন কোন না কোন উছিলা বা মাধ্যম অবলম্বন করে এবং সেই উছিলার কল্যাণে খোদাতায়ালার সন্তুষ্টি ও সাহায্য লাভ করে। এই আজগুবী ও নিকৃষ্ট বিশ্বাসের দরুন তারা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে একত্ববাদী মানার পরেও নিজেদের জন্য শিরক বা অংশীবাদিতাকে একটা

---

* *লাইফ অব মোহাম্মদ ঃ স্যার উইলিয়াম মুইর, পৃষ্ঠা-৫, ১৮৫৭ সনে মুদ্রিত।*

অবলম্বন হিসেবে তৈরী করে নিয়েছিল। ইব্রাহীম (আঃ) ছিলেন অতীব পবিত্র। তিনি খোদার সমীপে সরাসরি পৌঁছে যেতে পারতেন। কিন্তু মক্কার লোকেরা তো সেই মর্যাদার অধিকারী ছিল না। কাজেই তারা বড় বড় মানুষকে উছিলা বানাবার প্রয়োজন বোধ করতো। যে প্রয়োজনের তাগিদে তারা সেই সব মানুষের বা তাদের নামে তৈরী মূর্তিগুলোর এবাদত বা পূজো করতো। এবং এভাবেই নিজেদের ধারণা অনুযায়ী তাদেরকে খুশী করে খোদাতায়ালার দরবারে তাদেরকে নিজেদের জন্য উছিলা বানিয়ে নিত। এই আকিদা বা ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে যে নানাপ্রকার ক্ষতিকর বিষয় ও বহু ফাঁক-ফোকর রয়ে গেছে সেগুলির প্রতি তাদের দৃষ্টি কখনই নিবদ্ধ হতো না। কেননা, তারা কোনও একত্ববাদী শিক্ষাদাতা পায়নি। যখন কোন জাতির মধ্যে শিরক শুরু হয়ে যায়, তখন তা ক্রমাগত বাড়তেই থাকে। একটা থেকে দু'টো দু'টো থেকে তিনটা--- এভাবে বাড়তেই থাকে। তাই, মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামের জন্মের সময়ে কাবা ঘরের ভিতরে (যা কিনা এখন মুসলমানদের পবিত্র মস্‌জিদ এবং হযরত ইব্রাহীম ও হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর নির্মীত এবাদত গৃহ) ঐতিহাসিকদের বর্ণনামতে তিন শ' ষাটটি মূর্তি ছিল। অর্থাৎ চান্দ্র মাসগুলোর হিসেবে প্রতিদিনের জন্যই ছিল একটা করে মূর্তি। এই সব মূর্তি ছাড়াও আশে পাশের এলাকাগুলোতে, বড় বড় গঞ্জে বন্দরে, এবং বড় বড় গোত্র বা কবিলাগুলোর কেন্দ্রে কেন্দ্রেও পৃথক পৃথক মূর্তি ছিল। এক কথায় আরবের প্রত্যেকটি এলাকা শিরক বা অংশীবাদিতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল।

আরবের লোকেরা বাকভঙ্গীর চর্চা ও উন্নতির দিকে বিশেষ মনোযোগী ছিল। তারা তাদের ভাষাকে, কথা বলার স্টাইলকে অধিকতর সমৃদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালাতো। কিন্তু, এই বিষয়টি ছাড়া ওদের কাছে অন্য আর কোন জ্ঞান আহরণের কোন সার্থকতাই ছিল না। ইতিহাস, ভূগোল, গণিত ইত্যাদি বিষয়ের কোন একটিতেও তারা কোন জ্ঞান আহরণের চেষ্টা করতো না। তবে, তারা জ্যোতিষ্ক বিজ্ঞানে অনেকটা পারদর্শী ছিল। কেননা, মরুভূমির মধ্যে তাদেরকে চলাচল করতে হতো। সেখানে কোন মাইল ফলক ও কোন দিক নির্দেশক চিহ্ন ছিল না। কাজেই, মরুভূমিতে ভ্রমণ করার সময় তাদেরকে জ্যোতিষ্কবিজ্ঞানের সাহায্য নিতে হতো। সারা আরবে একটিও মাদ্রাসা ছিল না। বলা হয় যে, মক্কা মুকার্রমাতেও মাত্র কয়েকজন লোক লিখতে পড়তে পারতো। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে আরব ছিল একটি পরস্পর-বিরোধী গুণাবলী বিশিষ্ট জাতি। তাদের মধ্যে বহু মারাত্মক পাপের প্রচলন ছিল। তবু, এমন কিছু পুণ্যকাজও তারা করতো যা তাদের জাতীয় মানদণ্ডকে বেশ কিছুটা উন্নত রাখতে পেরেছিল।

মদ ও জুয়া

মদের সাংঘাতিক আসক্ত ছিল আরবরা। মদের নেশায় বেহুঁশ হওয়া কিংবা মাতলামী করা তাদের নিকটে কোন দূষণীয় ব্যাপারই ছিল না। বরং তা প্রশংসার ব্যাপার ছিল। কোন অভিজাত ব্যক্তির আভিজাত্যের চিহ্নসমূহের মধ্যে এই চিহ্ন থাকারও প্রয়োজন ছিল যে, তিনি তাঁর বন্ধুবান্ধব ও পাড়া-প্রতিবেশীদেরকে খুব করে মদ খাওয়াবেন। ধনী ব্যক্তিদের জন্য জরুরী ছিল, দিনে পাঁচবার মদের আসর বসানো, এবং এই ধরনের আসর ছিল তাদের জাতীয় ক্রীড়া। এটাকে তারা একটা ফাইন আর্ট বানিয়ে নিয়েছিল। তারা জুয়া খেলতো। কিন্তু এজন্য খেলতো না যে, এতে তাদের মালসম্পদ বৃদ্ধি পাবে। জুয়া খেলাকে তারা বদান্যতা ও গৌরবের বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। জুয়াড়ীদের মধ্যে এই অঙ্গীকার হতো যে, যে ব্যক্তি জিতবে সে তার জিতের মাল থেকে তার বন্ধুবান্ধব ও গোত্রীয় লোকদের দাওয়াত খাওয়াবে। যুদ্ধের সময় তারা জুয়ার মাধ্যমেই প্রয়োজনীয় টাকা-পয়সা সংগ্রহ করতো। যুদ্ধ চলাকালে আজকের দিনেও লটারী করার রেওয়াজ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু, ইয়োরোপ ও আমেরিকার লটারীবাজদের জেনে রাখা ভাল যে, এই প্রথাটার আদি প্রচলনকারী হচ্ছে আরবরা। যখন কোন যুদ্ধ হতো, তখন আরব গোত্র বা কবিলাগুলো নিজেদের মধ্যে জুয়া খেলতো, এবং যে জিততো সে যুদ্ধের অধিকাংশ খরচ বহন করতো। বস্তুতঃ, দুনিয়াবী আরাম-আয়েশ ও স্বস্তি-শান্তি থেকে বঞ্চিত আরবরা তা সব পুষিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতো মদ ও জুয়ার মাধ্যমেই।

বাণিজ্য

আরবরা ব্যবসায়ী ছিল এবং তাদের ব্যবসায়ের কাফেলা বহুদূর দূরান্তে চলে যেতো। আবিসিনিয়ার সঙ্গে তাদের ব্যবসায় ছিল। সিরিয়া ও ফেলিস্তিনের সঙ্গেও তারা ব্যবসায় করতো। হিন্দুস্থানের সঙ্গেও তাদের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। তাদের ধনী ব্যক্তিরা হিন্দুস্থানের তৈরী তরবারির বিশেষ কদর করতো। কাপড়-চোপড় বেশীর ভাগ আসতো ইয়েমেন ও সিরিয়া থেকে। এই সব ব্যবসায় ছিল আরবের শহরবাসীদের হাতেই। বাকী আরবরা, ইয়েমেন ও দক্ষিণের কিছু কিছু এলাকার অধিবাসী ছাড়া, বেদুঈনের জীবনযাপন করতো, তাদের না ছিল কোন শহর-বন্দর, না কোন বসতী। গোত্রগুলো দেশের এলাকাসমূহ ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিতো। নিজেদের এলাকার মধ্যেই তারা চলাফেরা করতো। একস্থানে পানি ফুরিয়ে গেলে তারা অন্য স্থানে চলে যেতো। এবং যেখানে পানি পাওয়া যেতো সেখানেই তাঁবু গাড়তো। ভেড়া, বকরী, উট, দুম্বা ছিল ওদের সম্পদ। এসব পশুর

পশম দিয়ে ওরা নিজেদের কাপড়-চোপড় তৈরী করতো। চামড়া দিয়ে বানাতো তাঁবু। বাকী যা থাকতো তা কোন বাজারে নিয়ে বিক্রী করে দিতো।

আরবদের অন্যান্য অবস্থা, অভ্যাস ও বৈশিষ্ট্য

সোনা ও চান্দির প্রতি আরবদের আকর্ষণ ছিল বটে, কিন্তু সোনাচান্দি তাদের কাছে অতিশয় দুষ্প্রাপ্য ছিল। এমনকি, তাদের সাধারণ লোকেরা এবং গরীব লোকেরা অলংকারাদি তৈরী করতো কড়ি দিয়ে এবং প্রসাধনী বানাত সুগন্ধি দ্রব্যাদি দিয়ে। খরবুজা, কুমড়া ইত্যাদির বীচি দিয়ে ওরা গলার হার বানাতো এবং তাদের স্ত্রীলোকেরা ওই সব হার পরেই অলংকার পরার সখ পূরণ করতো। জেনা-ব্যভিচার ছিল সর্বত্রই। চুরি কম ছিল, কিন্তু ডাকাতি ছিল বেশুমার। একে অপরের মাল লুট করাকে ওরা মনে করতো গোত্রীয় অধিকার। কিন্তু, কথা দিয়ে কথা রক্ষা করা আরবদের মধ্যে যেমন ছিল, তেমন আর অন্য কারো মধ্যেই ছিল না। যদি কোন লোক কোন ক্ষমতাবান ব্যক্তি বা গোত্রের কাছে এসে বলতো, 'আমি তোমার বা তোমাদের নিরাপত্তার মধ্যে আশ্রয় নিচ্ছি' তাহলে সেই ব্যক্তি বা গোত্রের পক্ষে এটা অপরিহার্য হয়ে পড়তো যে, সেই আশ্রয়প্রার্থীকে সে বা তারা নিরাপত্তা দান করবে। যদি সেই গোত্র বা ব্যক্তি সেই আশ্রয়প্রার্থীকে নিরাপত্তা দান না করতো, তাহলে তারা সমগ্র আরবে হেয় প্রতিপন্ন হতো। কবিদের খুব সম্মান-সমাদর ও প্রতিপত্তি ছিল। তাদেরকে গোত্রের নেতারূপেই গণ্য করা হতো। নেতাদের জন্য ভাষার উপরে দখল রাখার প্রয়োজন হতো, তাই তাদেরকে কবিও হতে হতো। অতিথি-পরায়ণতা সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল। মরু-ভূমিতে পথহারা কোন মুসাফির যদি কোন কবিলা বা গোত্রে পৌঁছে যেত এবং বলতো, 'আমি তোমাদের মেহমান হয়ে এসেছি' তাহলে তারা সঙ্গে সঙ্গে বকরী, দুম্বা, উট যবাই করা শুরু করে দিত। তাদের কাছে মেহমানের ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে কোন তারতম্য ছিল না। মেহমানের আসাটাই ছিল তাদের কাছে সম্মান ও গৌরববৃদ্ধির ব্যাপার তাই গোত্রের পক্ষে এটা অবশ্য করণীয় হতো যে, মেহমানকে সম্মান করার মাধ্যমে নিজেদের সম্মান বৃদ্ধি করা।

নারীদের কোন অধিকার ছিল না। কোন কোন কবিলার মধ্যে পিতা কর্তৃক আপন কন্যাকে হত্যা করাটা সম্মানের বিষয় ছিল। ঐতিহাসিকরা একটা ভুল তথ্য লিখে গেছেন যে, সমগ্র আরবেই বালিকাদেরকে হত্যা করার প্রথা চালু ছিল। কিন্তু, এই জাতীয় প্রথা স্বাভাবিক কারণে সারা দেশে প্রচলিত হওয়া সম্ভবপর ছিল না। কেননা, সারা দেশেই এই প্রথা প্রচলিত থাকলে তো দেশে আর কারো কোনও বংশধর বেঁচে থাকতো না। আসল কথা হচ্ছে, আরব,

হিন্দুস্থান ও আরও কোন কোন দেশে যেখানে এই প্রথা চালু ছিল, সেখানে কোন কোন বংশের লোক নিজেদেরকে খুব বড় মনে করতো। এবং তাদের মধ্যে কোন কোন বংশ তাদের মেয়েদেরকে বিবাহ দেওয়ার মত যোগ্য বংশ না পাওয়ার কারণে বাধ্য হয়ে মেরেই ফেলতো। এই কুপ্রথাটা নিঃসন্দেহে জুলুম ছিল। কিন্তু গোত্রের সব মেয়েকেই মেরে ফেলা হতো, একথা ঠিক নয়; আরবদের কোন কোন গোত্রের মধ্যে এমন ভয়ানক প্রথাও চালু ছিল যে, তারা মেয়েদেরকে জীবিতই কবর দিত। কোন কোন গোত্র গলা টিপে মারতো। কেউ কেউ অন্য ভাবেও মেরে ফেলতো। নিজের আপন মা ছাড়া আরবরা বিমাতাকে মা মনে করতো না। এমনকি বাপ মারা গেলে ছেলে তার বিমাতাকে বিয়ে করতো। তারা বিমাতাকে নেকাহ্ করাটাকে খারাপ কিছু মনে করতো না। বহু বিবাহ সাধারণ ব্যাপার ছিল। বিবাহ করার ক্ষেত্রে স্ত্রীর সংখ্যার কোন সীমাবদ্ধতা ছিল না। একাধিক বোনকে একই ব্যক্তি বিবাহ করতে পারতো।

যুদ্ধ-বিগ্রহে তারা সাংঘাতিক জুলুম করতো। তারা হিংসার উন্মাদনায় মৃত ব্যক্তির বুক চিরে কলিজা বের করে চিবাতো, নাক, কান কেটে ফেলতো, চোখ উপড়ে ফেলতো।

গোলামী অর্থাৎ দাস প্রথা একটা সাধারণ ব্যাপার ছিল। তারা আশে পাশের দুর্বল কবিলাগুলোর লোকজন ধরে এনে গোলাম বানিয়ে রাখতো। গোলামদের কোন হক্ বা অধিকার ছিল না। প্রত্যেক মালিক তার গোলামের সাথে যেমন খুশী ব্যবহার করতো। এতে কোন প্রকার বাধ্যবাধকতা ছিল না। এমনকি হত্যা করলেও কেউ কোন অভিযোগের সম্মুখীন হতো না। কেউ অপর কোন ব্যক্তির গোলামকে হত্যা করলেও তার প্রতি মৃত্যুদণ্ড প্রযোজ্য হতো না। হত্যাকারী নিহত গোলামের মালিককে কিছু খেসারত দিলেই মুক্ত হয়ে যেত। দাসীদের সহিত যৌনাচার মালিকদের জন্য বৈধ বলে স্বীকার করা হতো। দাসীদের সন্তানরাও গোলাম রূপে গণ্য হতো। নিজের ঔরসজাত সন্তানের মা হলেও দাসী দাসীই থাকতো।

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও উন্নতির অন্যান্য ক্ষেত্রে আরবরা বহু পিছনে পড়ে ছিল। আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে আরব বহু পিছনে ছিল।

নারীদের সহিত সম্পর্কের ক্ষেত্রে আরবরা অন্যান্য জাতির তুলনায় অনেক পিছনে পড়ে ছিল।

তবে, অনেক মানবিক ও বীরোচিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারীও ছিল আরবরা। এসব ক্ষেত্রে তারা এতটা অগ্রসর ছিল যে, সমসাময়িক দুনিয়াতে অন্যান্য জাতিগুলোর মধ্যে তা পরিলক্ষিত হতো না।

মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লামের জন্ম

উল্লিখিত প্রেক্ষাপটে জন্ম গ্রহণ করেন মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম। তাঁর জন্মের পূর্বেই তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ মারা যান। তাঁকে এবং তাঁর মা আমিনাকে তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিব গ্রহণ করেন আপন অভিভাবকত্বে। আরবের প্রথা অনুযায়ী তাঁকে দুধ খাওয়ানোর জন্য তায়েফের নিকটবর্তী এলাকায় বসবাসকারী জনৈক স্ত্রীলোকের কাছে দেওয়া হয়। আরবরা নিজেদের বাচ্চাদেরকে গ্রামের স্ত্রীলোকদের কাছে দিয়ে দিতো, যাতে বাচ্চারা ভালভাবে কথা শিখতে পারে এবং তাদের স্বাস্থ্য ভাল হয় ও সুন্দর হয়। তাঁর বয়স যখন ছয় বছর তখন তাঁর মা মদীনার আত্মীয় স্বজনের বাড়ী থেকে তাঁকে নিয়ে ফেরার সময় মাঝ পথে মারা যান। এবং সেখানেই সমাধিস্থ হন। তাঁকে মক্কায় ফিরে নিয়ে আসে এক দাসী, যে তাঁকে তাঁর দাদার হাতে তুলে দেয়। তাঁর বয়স যখন আট বছর তখন তাঁর লালন-পালনকারী দাদাও মারা যান। অতঃপর, তাঁর চাচা আবু তালিব স্বীয় পিতার ওসীয়্যত অনুসারে তাঁর অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন। দু'তিনবার আরবের বাইরে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল তাঁর। এর মধ্যে একবার তাঁর ১২ (বার) বছর বয়সে তিনি চাচা আবু তালিবের সঙ্গে এক বাণিজ্য সফরে সিরিয়ায় গিয়েছিলেন। এই ভ্রমণ সম্ভবতঃ সিরিয়ার দক্ষিণ-পূর্বে বাণিজ্য-শহরগুলো পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। কেননা, এই সফর প্রসঙ্গে বায়তুল মুকাদ্দাস ইত্যাদি স্থানের কোনও উল্লেখ নেই। এর পর যৌবনে পদার্পণ করা পর্যন্ত তিনি বরাবর আরবেই থেকে যান।

মজলিস-এ- হিল্‌ফুল ফুযুল

বাল্যকাল থেকেই তাঁর প্রকৃতিতে চিন্তা ভাবনা করার বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হতো। মানুষের লড়াই ঝগড়ার মধ্যে তিনি কখনও নিজেকে জড়াতেন না। বরং লড়াই ও কলহ মিটায়ে ফেলার চেষ্টাই করতেন তিনি। মক্কা এবং তার আশেপাশের গোত্রগুলোর যুদ্ধ-বিগ্রহ দেখে দেখে চিন্তান্বিত হয়ে যখন মক্কার কিছু সংখ্যক যুবক একটি সংঘ গঠন করলো, যার উদ্দেশ্যে ছিল মজলুমদেরকে

সাহায্য করা, তখন মুহাম্মদ (সাঃ) খুব উৎসাহের সঙ্গে সেই সংঘের সদস্য হয়ে গেলেন। এই সংঘের সদস্যবৃন্দ যে শপথ গ্রহণ করতো, তা হলোঃ

'তারা মজলুমদেরকে সাহায্য করবে
তাদের অধিকার আদায় করে দেবে (ততক্ষণ পর্যন্ত)
যতক্ষণ সাগরে এক ফোঁটা পানিও থাকবে।
আর যদি এইরূপ করতে না পারে, তাহলে
তারা নিজেদের পক্ষ থেকেই মজলুমদের
অধিকার পূর্ণ করে দিবে।'

(ইমাম সুহায়লি; রাউদ আল্ ইউসুফ; ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৬)।

তবে, খুব সম্ভব, এই শপথ অনুসারে কাজ করবার কোন সুযোগ ঘটেনি অন্য কোন সদস্যের একমাত্র আঁ হযরত (সাঃ) ছাড়া। তিনি যখন নবুওয়তের দাবী করলেন, এবং মক্কার নেতা আবু জাহল যখন তাঁর খুব বেশী বিরোধিতা করা শুরু করে দিল এবং লোকদের কাছে বলতে লাগলো যে, তোমরা কেউ মুহাম্মদের (সাঃ) সাথে কথা বলবে না, কেউ তার কথা মানবে না, বরং যতটা পারবে তাকে লাঞ্ছিত করবে। সেই সময় এক ব্যক্তি মক্কায় এসেছিল আবু জাহলের কাছ থেকে তার পাওনা আদায় করার জন্য। সে আবু জাহলের কাছে তার পাওনা চাইলো। আবু জাহল তার দেনা পরিশোধ করতে অস্বীকার করলো। সেই ব্যক্তি মক্কার অন্যান্য লোকদের কাছে বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ করলো। কিন্তু ছেলে-ছোকড়ারা বজ্জাতি করে তাকে পরামর্শ দিল, এ ব্যাপারে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাহায্য চাইতে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল মুহাম্মদ (সাঃ)-কে জব্দ করা। তারা মনে করেছিল যে, মুহাম্মদ (সাঃ) এ ব্যাপারে লোকটাকে সাহায্য করতে চাইবে না। কেননা, তখন সাধারণভাবে মক্কার লোকেরা এবং বিশেষভাবে আবু জাহল তাঁর তীব্র বিরোধিতা করছিল। কাজেই উক্ত সাহায্য না করার দরুন তিনি সকলের কাছে (নাউযুবিল্লাহ্ঃ এথেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই) নিন্দিত হবেন। এবং শপথভঙ্গকারী বলে চিহ্নিত হবেন। তাছাড়া, লোকটিকে সাহায্য করার জন্য তিনি যদি আবু জাহলের কাছে যানও, তাহলে আবু জাহল তাকে লাঞ্ছিত করেই ছাড়বে এবং ঘর থেকে বের করে দেবে।

লোকটি মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নিকটে গেল এবং আবু জাহলের বিরুদ্ধে তার অভিযোগ পেশ করলো। তিনি সঙ্গে সঙ্গে লোকটিকে নিয়ে রওয়ানা দিলেন এবং আবু জাহলের দরজায় গিয়ে কড়া নাড়লেন। আবু জাহল ঘর থেকে বেরিয়ে এলো এবং সে দেখলো যে, তার পাওনাদার মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাথে তার দরজায় খাড়া। তাকে আঁ হযরত (সাঃ) বললেন, এই ব্যক্তির অমুক অমুক পাওনা

তোমাকে দিতে হবে, দিয়ে দাও। আবু জাহল কোন প্রকার উচ্চবাচ্য না করে লোকটির পাওনা পরিশোধ করে দিল। শহরের অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যখন তাকে ধরল, 'আবু জাহল, তুমি আমাদের কাছে তো খুব বলো যে, মুহাম্মদকে লাঞ্ছিত করো, তার সঙ্গে কোন প্রকার সম্পর্ক রেখো না, কিন্তু তুমি তো নিজেই তার কথা মত কাজ করলে, এবং তার ইজ্জত কায়েম করলে।' তখন আবু জাহল তাদেরকে বললো, 'আল্লাহ্‌র কসম! আমার জায়গায় যদি তোমরা হতে, তাহলে তোমরা একই কাজ করতে। আমি দেখলাম, মুহাম্মদের ডানে ও বামে পাগলা উট খাড়া এবং সেগুলো আমার ঘাড় মটকে আমাকে মেরে ফেলতে উদ্যত হয়েছে।' *(ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ১৩৬)।*

আল্লহ্‌তায়ালাই ভাল জানেন তার এই কথার মধ্যে কোন সত্যতা ছিল কি না। হয়তো, সত্যিসত্যিই আল্লাহ্‌তায়ালা তাকে কোন নিদর্শন দেখিয়েছিলেন। অথবা, তার উপরে সত্যের প্রবল প্রভাব পড়েছিল। কেননা, সে যখন এটা দেখেছিল যে, সারা মক্কায় ঘৃণীত ও নির্যাতীত ব্যক্তিটি একজন মজলুমের সাহায্যার্থে একাই কারো কোনও সাহায্য ছাড়াই মক্কার নেতার দরজায় খাড়া হয়ে বলছেন যে, এই ব্যক্তির যা পাওনা তা তোমাকে পরিশোধ করতে হবে, পরিশোধ কর। তখন সত্যের প্রভাব আবু জাহলের দুষ্কৃতির মনোবৃত্তিকে গুঁড়ো করে দিয়েছিল, ফলে তাকে সত্যের সামনে মাথানত করতে হয়েছিল।

আঁ হযরত (সাঃ)-এর সাথে হযরত খাদিজা (রাঃ)-এর বিবাহ

মুহাম্মদ (সাঃ) –এর বয়স যখন ২৫ (পঁচিশ) বছর, তখন তাঁর সৎ কাজের কথা এবং তাঁর খোদাপ্রেম ও খোদাভীতির কথা সর্ব সাধারণ্যে ছড়িয়ে পড়লো। লোকজন তাঁর দিকে আঙ্গুল তুলে দেখাতো এবং বলতো 'দেখ! ঐ একজন সৎ মানুষ যাচ্ছেন, একজন আমানতদার মানুষ যাচ্ছেন।' এই সকল কথা মক্কার একজন সম্পদশালী মহিলার কানেও পৌঁছে গেল। তিনি চাচা আবু তালিবের কাছে বলে পাঠালেন যে, তিনি যেন তাঁর ভাতিজা মুহাম্মদকে বলেন যে, তার যে সমস্ত মালামাল সিরিয়ার বাণিজ্য কাফেলার সঙ্গে যাচ্ছে, তিনি যেন তার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আবু তালিব বিষয়টি তাঁর (সাঃ) কাছে বললে তিনি রাজি হয়ে গেলেন। এই বাণিজ্য সফরে তিনি যথেষ্ট সফলতা লাভ করলেন এবং আশাতিরিক্ত মুনাফা করে ফিরে এলেন। খাদিজা (রাঃ) বুঝতে পারলেন যে, এত বেশী মুনাফা শুধু বাজারের অনুকূল অবস্থার জন্যে সম্ভব হয়নি, বরং তা সম্ভব

হয়েছে বাণিজ্য কাফেলার নেতার সততা ও দক্ষতার কারণে। তিনি তাঁর গোলাম মাইসরাকে, যে ঐ বাণিজ্য সফরে আঁ হযরত (সাঃ)-এর সঙ্গী ছিল, বিষয়টা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। সেও তাঁর ধারণাকেই সমর্থন করলো এবং বললো যে, এই সফরে যেরূপ সততা, দক্ষতা ও সদাচরণের সঙ্গে তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন, সে কেবল তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল। ব্যাপারটা হযরত খাদিজার উপরে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করলো। যদিও তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৪০ (চল্লিশ) বৎসর এবং তিনি দু'বার বিধবা হয়েছিলেন। তবু তিনি তাঁর এক বান্ধবীকে পাঠিয়ে দিলেন এই কথা জানার জন্য যে, তিনি (সাঃ) তাঁকে বিবাহ করতে রাজি হবেন কিনা। সেই বান্ধবী তাঁর নিকটে গেলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তিনি বিবাহ করছেন না কেন। তিনি বললেন, 'আমার তো তেমন কোন সহায়-সম্পত্তি নেই, আমি বিয়ে করবো কীভাবে ?' বান্ধবীটি বললেন, 'সেই অসুবিধা যদি দূর হয়ে যায় ? এবং একজন সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য মহিলার সঙ্গে যদি আপনার বিয়ে হয়ে যায়, তাহলে ?' তিনি বললেন, 'আমি কি এতটা আশা করতে পারি ?' বান্ধবীটি বললেন, সেটা আপনি আমার উপরে ছেড়ে দিতে পারেন।' তিনি বললেন, 'তেমন হলে আমি রাজি আছি।' অতঃপর খাদিজা (রাঃ) তাঁর চাচার মধ্যস্থতায় বিয়ের কথা পাকাপাকি করে ফেলেন এবং তাঁদের বিয়ে হয়ে যায়। একজন গরীব ও এতীম যুবকের জন্য প্রথম বারের মত সম্পদের দুয়ার খুলে গেল। কিন্তু, সেই সম্পদের ব্যবহার তিনি যেভাবে করেছিলেন তা সারা পৃথিবীর জন্য একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

গোলামদের মুক্তিদান ও যায়েদ প্রসঙ্গ

আঁ হযরত (সাঃ)-এর বিবাহের পর হযরত খাদিজা (রাঃ) মনে মনে চিন্তা করলেন যে, আঁ হযরত (সাঃ) এইভাবে সুখী না-ও হতে পারেন যে, তাঁর স্ত্রী একজন বিত্তশালী মহিলা আর তিনি নিজে তারই মুখাপেক্ষী। তাই তিনি রসূলে করীম (সাঃ)-এর কাছে বললেন, 'আমি নিজের সব মাল সম্পদ ও গোলাম আপনার খেদমতে পেশ করতে চাচ্ছি।' তিনি বললেন, 'খাদিজা, এটা তুমি সত্যিসত্যিই বলছ ?' খাদিজা (রাঃ) বললেন, 'হ্যাঁ, সত্যিসত্যিই বলছি।' তখন রসূলে করীম (সাঃ) বললেন, তাহলে আমার প্রথম কাজ এটাই হবে যে, আমি সকল গোলামকে মুক্তি দিয়ে দিব।' তিনি তখনই, হযরত খাদিজার (রাঃ) গোলামদেরকে ডেকে আনলেন এবং তাদেরকে বললেন তোমরা সবাই আজ থেকে মুক্ত।' অতঃপর, তিনি মাল-সম্পদের অধিকাংশই গরীব দুঃখীদের মধ্যে

বিতরণ করে দিলেন। যে সকল গোলাম তিনি আযাদ করে দিলেন তাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল যায়েদ। সে অন্যসব গোলামদের চাইতে বেশ বুদ্ধিমান ও হুশিয়ার ছিল। কারণ, সে ছিল এক সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত বংশের ছেলে। তাকে বাল্যকালেই ডাকাতরা চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল। এবং সে একস্থান থেকে অন্যস্থানে বিক্রী হতে হতে অবশেষে মক্কা শহরে আসে। এই নওজোয়ান নিজের বুদ্ধি ও সতর্কতার কারণে উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে, আযাদীর চেয়ে এই ব্যক্তির গোলামীই উত্তম। যখন আঁ হযরত (সাঃ) গোলামদেরকে মুক্ত করে দিচ্ছিলেন, তখন জায়েদ বললো, 'আপনি তো আমাকে মুক্ত করে দিচ্ছেন বটে, কিন্তু আমি মুক্ত হতে চাই না। আমি আপনার সাথেই থেকে যেতে চাই।' অতএব সে আঁ হযরত (সাঃ)-এর সঙ্গেই থেকে গেল। এবং দিনে দিনে তাঁর (সাঃ) প্রতি তার ভালবাসা বাড়তেই থাকলো।

যায়েদ যেহেতু এক সম্পদশালী বংশের ছেলে ছিল, সেহেতু তার বাপ ও চাচা ডাকাতদের পিছনে পিছনে তাদের ছেলের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছিল। অবশেষে, তারা জানতে পারলো যে, তাদের ছেলে মক্কায় আছে। কাজেই, তারা মক্কায় চলে এলো এবং খোঁজ করতে করতে মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সাঃ)–এর বাড়ীতে উপস্থিত হলো। এবং তাঁর (সাঃ) কাছে প্রার্থনা জানালো, 'আপনি আমাদের বাচ্চাকে মুক্ত করে দিন, পরিবর্তে আপনি যত টাকা চান, নিয়ে নিন'। তিনি বললেন, 'জায়েদকে তো আমি মুক্ত করেই দিয়েছি এবং সে খুশী মনে আপনাদের সাথে যেতে পারে।' তিনি যায়েদকে ডেকে এনে তাকে তার বাপ ও চাচার কাছে দিয়ে দিলেন। পিতা পুত্র মিলিত হলো এবং চোখের জলে হৃদয়ের দুঃখ ধূয়ে ধূয়ে ফিকে করলো। তখন যায়েদকে তার পিতা বললো, 'এই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তোমাকে মুক্ত করে দিয়েছেন, তোমার মা তোমার জন্যে ছট্‌ফট্ করছে, তুমি বাড়ী চলো এবং তাকে স্বস্তি দাও। শান্তি দাও।' যায়েদ বললো, 'মা-বাপ কার না প্রিয়! আমার প্রাণও তাদের ভালবাসায় ভরা, কিন্তু মুহাম্মদ (সাঃ) -এর ভালবাসা আমার হৃদয়ে এমনভাবে ঠাঁই করে নিয়েছে যে, আমি তাঁর কাছ থেকে পৃথক হতে পারবো না। আমি আনন্দিত যে, আমি আপনাদের সাথে মিলিত হতে পেরেছি। কিন্তু মুহাম্মদ (সাঃ)–এর কাছ থেকে পৃথক হওয়া এখন আমার ক্ষমতার বাইরে।' যায়েদের পিতা ও চাচা অনেক জোর করলেন, জেদ করলেন, কিন্তু যায়েদ কিছুতেই রাজি হলো না। যায়েদের এই ভালবাসা দেখে মুহাম্মাদুর রসূলল্লাহ্ (সাঃ) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, 'যায়েদ তো আগে থেকেই মুক্ত, কিন্তু, আজ থেকে সে আমার পুত্র।' যায়েদের এই নতুন অবস্থা দেখে অবশেষে

যায়েদের বাপ ও চাচা স্বদেশের পথে রওয়ানা হয়ে গেলেন। এবং যায়েদ স্বাধীনভাবেই মক্কাতে থেকে গেল।

হেরা গুহায় আল্লাহ্‌র এবাদতে

হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর বয়স যখন ত্রিশ বছর পার হলো তখন তাঁর হৃদয়ে আল্লাহ্‌র এবাদত করার প্রেরণা পূর্বের চাইতে বেশী হতে লাগলো। শহরবাসীদের দুষ্কৃতি, খারাপী ও বদকাজের প্রতি বিরূপ হয়ে তিনি অবশেষে মক্কা থেকে ২/৩ (দুই/তিন) মাইল দূরের এক পাহাড়ের মধ্যে আল্লাহ্‌র এবাদতের জন্য একটা স্থান ঠিক করে নিলেন। জায়গাটা ছিল পাহাড়ের উপরের দিকে পাথর ঘেরা ছোট্ট একটি গুহা। হযরত খাদিজা (রাঃ) একসঙ্গে কয়েকদিনের খাদ্য তৈরী করে দিতেন। সেই খাদ্য নিয়ে তিনি হেরার গুহার ভেতরে চলে যেতেন। এবং সেখানে পাথরের মধ্যে বসে তিনি দিনরাত আল্লাহ্‌তায়ালার এবাদতে নিমগ্ন থাকতেন।

প্রথম কোরআনী ওহী

যখন আঁ হযরত (সাঃ)-এর বয়স চল্লিশ বছর হলো, তখন একদিন তিনি ঐ হেরা গুহার মধ্যে এক কাশ্‌ফে (দিব্যদৃষ্টিতে) দেখতে পেলেন যে, এক ব্যক্তি তাঁকে সম্বোধন করে বলছেন যে, 'পড়ুন'। তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি তো পড়তে জানি না।' এতে সেই ব্যক্তি দ্বিতীয়বার সেই কথা বললেন, তৃতীয় বার বললেন। শেষে তিনি তাঁকে পাঁচটি কথা বলায়ে ছাড়লেনঃ

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۚ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۙ
الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۙ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ؕ

"তুমি পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন, যিনি সৃষ্টি করেছেন ইনসানকে (মানুষকে) এক আঁঠাল-জমাট রক্তপিণ্ড থেকে। তুমি পাঠ কর, কেননা তোমার প্রভু-প্রতিপালক পরম সম্মানীত যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন যিনি শিক্ষা দিয়েছেন ইনসানকে তা-ই যা সে জানতো না।"

(সূরা আল্ আলাক, আয়াত ২-৬)।

এই ছিল সেই প্রথম কোরআনী ওহী (ঐশীবাণী) যা অবতীর্ণ হয়েছিল মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামের উপরে। এর অর্থ ও

তাৎপর্য হলো, সমস্ত পৃথিবীকে আপন প্রভু-প্রতিপালকের নামে (যে প্রভু তোমাকে এবং সমগ্র সৃষ্টিকে পয়দা করেছেন, পাঠ কর এবং এই আসমানী পয়গাম শুনিয়ে দাও যে, সেই খোদা যিনি মানুষকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, তিনি তার হৃদয়ে, তাঁর নিজের (খোদাতায়ালার) প্রতি এবং তাঁর সৃষ্টির প্রতি ভালবাসার বীজ উপ্ত করে দিয়েছেন। হ্যাঁ, সারা দুনিয়াকে এই বাণী শুনিয়ে দাও যে, তোমার প্রভু, যিনি সব চাইতে বেশী সম্মানিত, তিনি তোমার সাথে থাকবেন। তিনি সেই সত্তা যিনি দুনিয়াকে জ্ঞান দান করার জন্য কলম সৃষ্টি করেছেন, এবং মানুষকে সেই সকল বিষয়াদি শেখানোর জন্য প্রস্তুতি নিয়েছেন যা মানুষ ইতোপূর্বে জানতো না'।

এই কয়েকটি কথা কোরআন করীমের সেই সমস্ত শিক্ষার সারমর্ম যা আগামীতে মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) উপরে অবতীর্ণ হওয়া নির্ধারিত ছিল। দুনিয়ার সংশোধনের জন্য এক উত্তম বীজ এর মধ্যে নিহিত আছে। এর তফসীর তো কোরআন শরীফে যথাস্থানে করা যাবে।* এখানে এই আয়াত ক'টির উল্লেখ এ কারণেই করা হলো যে, এ ছিল মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এবং কোরআন শরীফের জন্য এই আয়াতগুলি ছিল ভিত্তিপ্রস্তর স্বরূপ। মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপরে যখন এই বাণী অবতীর্ণ হলো তখন তাঁর হৃদয়ে এই ভীতির সঞ্চার হলো যে, তিনি কি খোদাতায়ালার দেওয়া এত বড় জিম্মাদারী বা দায়িত্ব পালন করতে পারবেন ? অন্য কেউ হলে হয়তো গর্ব ও অহংকারে তার মাথা গরম হয়ে উঠতো এই ভেবে যে, সর্বশক্তিমান খোদা তার উপরে এক বিরাট দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। কিন্তু মুহাম্মাদুর রসূলল্লাহ (সাঃ) দায়িত্ব পালন করতে জানতেন, দায়িত্ব এড়িয়ে চলতে জানতেন না। তিনি এ ঐশীবাণী লাভের পর হযরত খাদিজার (রাঃ) কাছে এলেন। তাঁর চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল, তিনি ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। হযরত খাদিজা (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হয়েছে?' তিনি পুরো ঘটনার বর্ণনা দিলেন এবং বললেন, 'আমার মত দুর্বল মানুষ এত বড় বোঝা কেমন করে বইবে?' হযরত খাদিজা (রাঃ) বললেন,

كَلَّا وَاللّٰهِ مَا يُخْزِيكَ اللّٰهُ أَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ

(বোখারী ঃ বাবু বা'দাল ওহী)।

---

*গ্রন্থকার প্রণীত 'তফসীরে কবীর' দ্রষ্টব্য।

'খোদার কসম! এই বাণী খোদাতায়ালা আপনার উপরে এজন্য নাযিল করেন নি যে, তিনি আপনাকে অযোগ্য ও অকৃতকার্য প্রমাণিত করবেন এবং আপনার সঙ্গ ছেড়ে দিবেন। খোদা কি কখনও এমন করতে পারেন? আপনি তো সেই ব্যক্তি যিনি আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে উত্তম আচরণ করেন, গরীব ও অসহায় ব্যক্তিদেরকে সাহায্য করেন তাদের বোঝা নিজে বহন করেন। যে চরিত্রগুণ এদেশ থেকে উঠে গেছে তা সবই আপনার মাধ্যমে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। আপনি অতিথির সেবাকারী, দুঃখীমানুষের সহায়তাকারী। এই রকম মানুষকে কি খোদাতায়ালা কখনও পরীক্ষার মধ্যে ফেলে রাখতে পারেন?

অতঃপর, তিনি (রাঃ) তাঁর চাচাতো ভাই ওরাকা বিন নওফেলের কাছে তাঁকে নিয়ে গেলেন। ওরাকা ছিলেন খৃষ্টান। তিনি যখন এই ঘটনার কথা শুনলেন তখন সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠলেন, 'আপনার উপরে সেই ফেরেশ্‌তাই নাযিল হয়েছে যে নাযিল হয়েছিল মূসার উপরে।' *(বোখারী ঃ বাবু, বা'দাল ওহী)*

এতো সেই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা যা বর্ণিত হয়েছে দ্বিতীয় বিবরণে (১৮ঃ ১৮)। যখন এই খবর তাঁর মুক্ত করে দেওয়া গোলাম যায়েদ (তখন তাঁর বয়স পঁচিশ/তিরিশ বছর) এবং তাঁর চাচাতো ভাই আলীর (বয়স হবে তখন এগার বৎসর) কাছে পৌঁছল তখন তাঁরা উভয়েই তাঁর (সাঃ)উপরে ঈমান আনলেন।

ঈমান আনলেন হযরত আবু বকর (রাঃ)

হযরত আবুবকর (রাঃ) ছিলেন রসূলে পাক (সাঃ)-এর বাল্যবন্ধু। তিনি ঐ সময় শহরের বাইরে ছিলেন। শহরে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর কানে এই শব্দগুলো পড়তে লাগলো যে, তোমার দোস্ত পাগল হয়ে গেছে। সে বলছে যে, আসমান থেকে ফেরেশ্‌তা নেমে এসে তার সাথে নাকি কথা বলেছে। আবুবকর (রাঃ) কারও কথায় কান না দিয়ে সোজা আঁ হযরত (সাঃ)-এর ঘরের দরজায় গিয়ে কড়া নাড়লেন। তিনি দরজা খুলতেই আবুবকর (রাঃ) তাঁর কাছে বিষয়টা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। রসূলে করীম (সাঃ) তাঁর বাল্যকালের বন্ধুকে ধোকা খাওয়া থেকে বাঁচাবার জন্যে কথাটা কিছু বিস্তারিতভাবে বলতে চাইলেন। আবুবকর (রাঃ) বাধা দিয়ে বললেন, আমাকে শুধু এতটুকু বলুন যে, আপনি এই ঘোষণা দিয়েছেন কিনা যে, খোদাতা'লার ফেরেশ্‌তা আপনার কাছে এসেছে এবং সে আপনার সাথে কথা বলেছে। তিনি (সাঃ) আবারও চাইলেন কথাটা কিছু বিস্তারিতভাবে বলতে। কিন্তু, আবুবকর (রাঃ) কসম দিয়ে বললেন, 'স্রেফ আমার কথার জবাব দিন।' অন্য কোনও কথা বলবেন না।' কাজেই তিনি 'হাঁ' সূচক জবাব দিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গেই আবুবকর (রাঃ) বললেন, 'সাক্ষী থাকুন, আমি

আপনার উপরে ঈমান আনলাম।' তিনি আরও বললেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি তো প্রমাণ দিতে গিয়ে আমার ঈমান দুর্বল করে দিতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু যে ব্যক্তি আপনার জীবনকে দেখেছে, তার কাছে কি আপনার সত্যতার জন্য আর কোনও প্রমাণের প্রয়োজন আছে ?'

মুমিনদের ছোট্ট জামাত

এই ছিল সেই ছোট্ট জামাত, যার উপরে স্থাপিত হয়েছিল ইসলামের বুনিয়াদ। একজন মহিলা যিনি প্রায় বার্ধক্যে উপনীত, একটি এগারো বছরের বালক, একজন মুক্তিপ্রাপ্ত যুবক গোলাম (যে দেশ ছাড়া, সে পরের বাড়ীতে খেটে খায়, যার আপন বলতে কেউ নেই) এবং একজন বন্ধু আর সেই ওহী (ঐশীবাণী) লাভের দাবীদার-এই ছিল সেই ছোট্ট কাফেলা যা দুনিয়াতে আলো ছড়াবার জন্য কুফরী ও অন্ধকারের প্রান্তরে ধাবিত হলো। লোকেরা যখন এই কথা শুনলো তখন তারা হাসি-তামাসা করতে লাগলো, একে অপরকে চোখ টিপে বলতে লাগলো, এই লোকগুলো পাগল হয়ে গেছে। ওদের কথায় কান দিও না। তবে শুনতে চাইলে শুনতে পারো মজা করার জন্য। কিন্তু সত্য তখন তার পূর্ণ মর্যাদাসহ প্রকাশিত হতে শুরু করলো। এবং ইসাইয়া নবীর (আঃ) ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক 'হুকুমের পর হুকুম, হুকুমের পর হুকুম, কানুনের পর কানুন, কানুনের পর কানুন (২৮ঃ৩) জারি হতে লাগলো। 'কিছু এখানে, কিছু ওখানে' এবং এক 'অন্য ভাষায়' যার সঙ্গে ইতোপূর্বে আরবের পরিচয় ছিল না- আল্লাহ্‌তা'লা মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামের সহিত কথা বলা শুরু করে দিলেন। নও জোয়ানদের প্রাণ স্পন্দিত হতে লাগল, সত্যের পরশে তাদের শরীর শিহরিত হতে লাগলো। লোকদের হাসি-ঠাট্টা এবং উপেক্ষার জায়গায় আকর্ষণ, সমর্থন ও প্রশংসা স্থান করে নিতে লাগলো। প্রশংসাসূচক কথা আস্তে আস্তে উচ্চ থেকে উচ্চতর হতে লাগলো। গোলাম, নওজোয়ান, মজলুম নারীরা আঁ হযরত (সাঃ)-এর কাছে ভীড় জমাতে লাগল। তাঁর কথার মধ্যে নারীরা তাদের অধিকার রক্ষার আওয়াজ ও আশা দেখতে পেলো। গোলামরা তাদের মুক্তির বাণী শুনতে পেলো এবং নওজোয়ানরা তাদের বড় বড় আকাংখা পূরণ হওয়ার ও উন্নতির সোপান উন্মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখতে পেলো।

মক্কার নেতাদের বিরোধিতা

হাসি-ঠাট্টার আওয়াজের মধ্য থেকে যখন সমর্থন ও প্রশংসার আওয়াজও উচ্চতর হতে লাগলো তখন মক্কার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা আতংকিত হলো।

শাসকদের মনে ভীতির সঞ্চার হলো। তারা একত্র হলো। পরামর্শ করলো। জোট বাঁধলো। তারা হাসি-বিদ্রূপের জায়গায় জুলুম ও নির্যাতন করবার, দেশ থেকে বিতাড়িত করবার এবং এক ঘরে করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজও শুরু হয়ে গেল। মক্কা এখন সরাসরি ঐক্যবদ্ধভাবে ইসলামের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ারই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। এখন আর সেই দাবীকারককে পাগল মনে করা হয় না। তার মধ্যে এখন উন্নতি ও প্রভাব বিস্তারকারী শক্তি লক্ষ্য করা হচ্ছে। ফলে, সকল রাজনীতি ও শাসননীতির জন্য বিপদ, মক্কার ধর্মের জন্য বিপদ, মক্কার সংস্কৃতির জন্য বিপদ, এবং তাহ্জীব বা আচার-প্রথার জন্য বিপদ; সমূহ বিপদ দেখা দিল। ইসলাম এক নয়া জমিন ও নয়া আসমান সৃষ্টি করতে আরম্ভ করলো, যে নতুন পৃথিবী ও নতুন আকাশ সৃষ্টি হলে আরবের পুরাতন জমিন ও পুরাতন আসমান টিকে থাকতে পারবে না। মক্কাবাসীদের কাছে এটা আর কোন হাসি-তামাসার প্রশ্ন নয়, এটা এখন এক জীবন-মরণ সমস্যা। তারা ইসলামের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলো, এবং ঠিক তেমনি দৃঢ় সংকল্পের সাথে গ্রহণ করলো যেরূপ সংকল্পের সাথে নবীদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা হয়েছে চিরটাকাল। এবং তারা যুক্তি-প্রমাণের জওযাব যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা না দিয়ে তীর ও তলোয়ার দ্বারা দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগলো। ইসলামের কল্যাণময়তার জবাব তারা কোন উন্নত চারিত্র্যের দ্বারা না দিয়ে গালি-গালাজ ও কুকথার মাধ্যমে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। পুনরায় একবার পৃথিবীতে কুফরী ও ইসলামের মধ্যে লড়াই শুরু হয়ে গেল। পুনরায় শয়তানের সৈন্যরা ফেরেশ্তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো। কী-ই বা এমন শক্তি ছিল ঐ মাটির মানুষগুলোর যাতে মক্কাবাসীদের সামনে তারা টিকে থাকতে পারে! নির্লজ্জভাবে, জঘন্য উপায়ে নারীদের প্রতি অত্যাচার শুরু হলো। তাদের চিরে ফেড়ে হত্যা করা শুরু হলো। গোলামদেরকে উত্তপ্ত বালুকারাশির উপরে শোয়ায়ে বুকে পাথর চাপা দিয়ে জব্দ করা শুরু হলো। তাদের পিঠের নীচে জলন্ত অঙ্গার রেখে চাপা দেওয়া হতো, ফলে তাদের দেহের চামড়া আর মানুষের চামড়ার মত ছিল না, পশুর চামড়ার মত হয়ে গিয়েছিল। ইত্যাকার বিবিধ অবর্ণনীয় বর্বর জুলুম ও অত্যাচারের পর ইসলামের বিজয়ের যামানায় যখন ইসলামের পতাকা পত পত করে উড়ল প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে তখন একদিন হযরত খাব্বাব (রাঃ)-এর পিঠের কাপড় কোনক্রমে হঠাৎ করে সরে গেলে তাঁর সঙ্গীরা দেখতে পেল যে, ওঁর পিঠের চামড়া মানুষের চামড়ার মত নয়, পশুর চামড়ার মত। সঙ্গীরা ভয় পেয়ে গেল এবং তাঁর কাছে জানতে চাইলো, 'এটা আপনার কি অসুখ ?' ইসলামের প্রথম যামানার মুসলিম ক্রীতদাস খাব্বাব (রাঃ) সঙ্গীদের কথা শুনে হাসলেন, এবং বললেন, 'এটা কোন অসুখ নয়। এটা স্মৃতিচিহ্ন সেই সময়ের যখন আরবের

লোকেরা নওমুসলিম গোলামদেরকে দড়ি দিয়ে বেঁধে মক্কার পাথর ও কংকরময় গলিতে গলিতে ছ্যাঁচড়াতো এবং এই অত্যাচার চলতো তাদের উপর দিনের পর দিন। তারই ফলে আমার পিঠের চামড়ার এই অবস্থা'।

মুমিন ক্রীতদাসদের উপরে মক্কার কাফেরদের অত্যাচার

এই যে ক্রীতদাসরা (খাব্বার-রাঃ ও অন্যান্যরা), যাঁরা রসূলে পাক (সাঃ)-এর উপরে ঈমান এনেছিলেন, তাঁরা ছিলেন অপর জাতির লোক।এঁদের মধ্যে হাবশী ছিলেন যেমন হযরত বেলাল (রাঃ); রোমান ছিলেন যেমন সোহায়েব (রাঃ); এছাড়া খৃষ্টানও ছিলেন যেমন জোবায়ের ও সোহায়েব (রাঃ) এবং এঁরা মুশ্‌রেকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যেমন বেলাল ও আম্মার (রাঃ)। হযরত বেলাল (রাঃ)-এর মালিক উত্তপ্ত বালুকার উপরে শোয়ায়ে তঁর উপরে পাথর চাপা দিয়ে রাখতো। তাঁর বুকের উপরে কিশোর ছেলেদেরকে উঠায়ে দিতো, যারা তাঁর বুকের উপরে লাফাতে থাকতো। হাবশী বেলাল ছিলেন মক্কার উম্মিয়া বিন্ খাল্‌ফ নামক এক ধনীর গোলাম। উম্মিয়া তাঁকে ভর দুপুরে মক্কার বাইরে নিয়ে গিয়ে উত্তপ্ত বালুকারাশির উপরে উলঙ্গ করে শোয়ায়ে দিতো এবং বড় বড় পাথর খন্ড তাঁর বুকের উপরে চাপা দিয়ে বলতো, 'লাত ও উজ্জার ঈশ্বরত্ব স্বীকার করো এবং মুহাম্মদের আনুগত্য অস্বীকার করো'। বেলাল (রাঃ) জবাবে বলতেন, 'আহাদুন, আহাদুন' (আল্লাহ্ এক, আল্লাহ্ এক)। বারংবার তাঁর এই জবাব শুনে উম্মিয়ার ক্রোধ আরো বেড়ে যেত এবং সে তখন তাঁর গলায় রশি দিয়ে বেঁধে বদমাস ছেলে-ছোকড়াদের হতে তুলে দিত এবং বলতো, 'একে তোমরা মক্কার গলিতে গলিতে কংকর পাথরের উপর দিয়ে ছ্যাঁচড়ে হ্যাঁচ্‌ড়ে টানতে থাক' যার ফলে, তাঁর দেহ রক্তে রক্তে লাল হয়ে উঠতো। কিন্তু, তথাপি তিনি আহাদুন আহাদুন বলতেই থাকতেন। বলতেই থাকতেন আল্লাহ্ এক, আল্লাহ্ এক।

কিছুকাল পরে খোদাতা'লা যখন মুসলমানদেরকে মদীনাতে স্বস্তি দিলেন, তখন তিনি স্বাধীনভাবে এবাদত করার সুযোগ পেলেন। রসূলে করীম (সাঃ) তখন বেলাল (রাঃ)-কে আযান দেওয়ার জন্য নিযুক্ত করলেন। এই হাবশী গোলাম যখন আযান-এর মধ্যে আশ্‌হাদু আন্ লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্' উচ্চারণ করতে গিয়ে 'আছহাদু আন্ লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলতেন, তখন মদীনাবাসীরা যাঁরা তাঁর অবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানতো না, তারা হাসাহাসি করতো। একবার রসূলে করীম (সাঃ) কিছু লোককে বেলালের (রাঃ) আযান দেওয়া নিয়ে এভাবে হাসতে দেখে সেই লোকদের দিকে ফিরে দাঁড়ালেন এবং বললেন, 'তোমরা তো বেলালের আযান শুনে হাসো, কিন্তু খোদাতায়ালা আরশের উপর থেকে তার

আযান শুনে খুশী হন।' আঁ-হযরত (সাঃ)-এর ইংগিত এদিকেই ছিল যে, তোমরা তো দেখছো যে, সে 'শীন' উচ্চারণ করতে পারে না। কিন্তু 'শীন' ও ছীন' এর মধ্যে কি আছে ? খোদাতা'লা তো জানেন যে, যখন উত্তপ্ত বালুকারাশির উপর উলঙ্গ পিঠে তাকে শোয়ায়ে দেওয়া হতো এবং তার বুকের উপর জালেমরা জুতোসহ লাফাতো এবং জিজ্ঞেস করতো যে, কি, এখন শিক্ষা হয়েছে ? না কি হয়নি ? তখনও সে তার টুটা ফাটা শুষ্ক জিহ্বা দিয়ে 'আহাদুন' 'আহাদুন' উচ্চারণ করে করে খোদাতা'লার তওহীদের ঘোষণা দিতো। এবং নিজের বিশ্বস্ততা, তওহীদের প্রতি নিজের বিশ্বাসের কথা এবং নিজের হৃদয়ের অবিচলতার প্রমাণ তুলে ধরতো। অতএব, তার 'আছহাদু' বহুলোকের 'আশহাদু' থেকে অনেক বেশী মূল্যবান, উত্তম। হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন দেখলেন যে, বেলালের (রাঃ) উপর এ প্রকারের নিষ্ঠুর অত্যাচার হচ্ছে তখন তিনি তাঁর মালিককে তাঁর মূল্য পরিশোধ করে দিয়ে তাঁকে মুক্ত করে দিলেন। এইভাবে আরও অনেক ক্রীতদাসকে আবুবকর (রাঃ) নিজের মালসম্পদের বিনিময়ে মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

এই সকল ক্রীতদাসের মধ্যে একজন ছিলেন সোহায়েব (রাঃ)। তিনি সম্পদশালী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি ব্যবসায় করতেন। এবং মক্কার সম্মানিত ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য ছিলেন। কিন্তু তিনি ধনী ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও এবং মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও কোরেশরা তাকে মারতে মারতে বেহুঁশ করে ফেলতো। যখন রসূলুলাহ সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম হিজরত করে মদীনায় গেলেন, তখন সোহায়েব (রাঃ) চাইলেন যে, তিনিও হিজরত করে মদীনায় যাবেন। কিন্তু মক্কার লোকেরা তাঁকে বাধা দিলো এবং বললো, 'যে ধনসম্পদ তুমি মক্কায় থেকে অর্জন করেছ তা তুমি মক্কার বাইরে নিয়ে যেতে পারবে না। আমরা তোমাকে মক্কা ছেড়ে চলে যেতে দেব না।' সোহায়েব (রাঃ) বললেন, 'আমি যদি এই ধনসম্পদ সমস্তই ছেড়ে যাই, তাহলে কি তোমরা আমাকে যেতে দিবে ?' এতে তারা রাজি হয়ে গেল। এবং তিনি তাঁর সমস্ত ধন-সম্পদ মক্কাবাসীদের কাছে ফেলে রেখে খালি হাতে মদীনায় চলে গেলেন। এবং রসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হলেন। আঁ হযরত (সাঃ) তাঁকে বললেন, "সোহায়েব তোমার এই বর্তমান সওদা তোমার পূর্বেকার সমস্ত সওদার চাইতে বেশী লাভজনক।" অর্থাৎ তুমি পূর্বের আসবাবপত্রের বদলাতে লাভ করতে টাকা-পয়সা, কিন্তু এখন তুমি টাকা-পয়সার বদলাতে লাভ করলে ঈমান।

এই সকল ক্রীতদাসদের প্রায় সবাই ছিলেন ঈমানের ব্যাপারে ভিতরে ও বাইরে অবিচল। তবে, কারও কারও ক্ষেত্রে বাহ্যিকভাবে কখনও কখনও দুর্বলতাও প্রকাশ পেতো। যেমন, একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আম্মার নামক এক

ক্রীতদাসের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখতে পেলেন যে, তিনি ব্যথার চোটে গোংগাচ্ছেন, এবং চোখের পানি মুছছেন। আঁ-হযরত (সাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "আম্মার কি হয়েছে তোমার ?" আম্মার বললেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার অবস্থা খুবই খারাপ। ওরা আমাকে মারতো, কষ্ট দিতো এবং ততক্ষণ পর্যন্ত থামতো না, যতক্ষণ না তারা আমার মুখ থেকে আপনার বিরুদ্ধে এবং দেবতাগুলোর সমর্থনে কথা বের করতো'। রসূলে করীম (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, 'কিন্তু, তোমার হৃদয়ে কি থাকতো ?' আম্মার (রাঃ) বললেন, 'হৃদয়ে তো অবিচল ঈমানই থাকতো।' আঁ-হযরত (সাঃ) বললেন, 'হৃদয়ে যদি ঈমান অটল থকে, তাহলে খোদাতা'লা তো দুর্বলতা ক্ষমা করে দিবেন।' তাঁর (রাঃ) পিতা উয়াসের (রাঃ) ও মাতা সামিয়া (রাঃ)-কে কাফেররা অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট দিয়েছিল। একবার, যখন তাঁদের উভয়ের উপরে নির্যাতন চালানো হচ্ছিল, তখন রসূলে করীম (সাঃ) তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাঁদের উভয়ের কষ্ট দেখলেন, তাঁর হৃদয় ব্যথা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। তিনি তাঁদেরকে সম্বোধন করে বললেন, صَبْرًا آلَ يَاسِرٍ مَوْعِدُكُمُ الْجَنَّةُ

'হে ইয়াসেরের বংশধর, ধৈর্য ধারণ কর! খোদা তোমাদের জন্য বেহেশ্‌ত তৈরী করে রেখেছেন।* এই ভবিষ্যদ্বাণী অল্পদিনের মধ্যেই পূর্ণ হলো। ইয়াসের মার খেতে খেতে মারা গেলেন। কিন্তু, এতেও কাফেরদের ক্রোধ মিটলো না। তারা তাঁর (রাঃ) বৃদ্ধা স্ত্রী সামিয়ার (রাঃ) উপর নির্যাতন চালিয়ে যেতে থাকলো। এমনকি, আবু জাহল একদিন ক্রোধ উন্মত্ত প্রায় হয়ে তাঁর (রাঃ) উরুর উপরে নেজা দিয়ে প্রচণ্ড জোরে আঘাত হানলো, ফলে নেজা উরু ভেদ করে তাহার পেটের মধ্যে ঢুকে গেলো এবং তিনি (রাঃ) তড়পাতে তড়পাতে মারা গেলেন।

জিন্নীরা (রাঃ) ছিলেন একজন ক্রীতদাসী। তাঁকে আবুজাহল এতো মার মেরেছিল যে, তাঁর (রাঃ) দু'টো চোখই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আবু ফুকাইহা (রাঃ) ছিলেন সাফওয়ান বিন উমাইয়ার ক্রীতদাস। তাঁকে তাঁর মালিক ও তার বংশের লোকেরা উত্তপ্ত জমিনের উপরে শোয়ায়ে রাখতো এবং বড় বড় গরম পাথর খণ্ড তাঁর বুকের উপরে চাপা দিয়ে রাখতো। এতে তাঁর জিহ্বা বেরিয়ে পড়তো। এবং এই একই অবস্থা ছিল অন্য সব ক্রীতদাসেরও।

নিঃসন্দেহে এই সব অত্যাচার ছিল মানুষের সহ্যের সীমার বাইরের। কিন্তু যে লোকদের উপরে এই অত্যাচার করা হতো, তাহারা বাইরে তো মানুষই ছিলেন বটে, কিন্তু অন্তরে ছিলেন ফেরেশ্‌তা।

---

* *ইবনে হিশাম। প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা-১১৭।*

কোরআন শুধু মুহাম্মাদুর রসূলুলাহ্ (সাঃ) এর হৃদয় এবং কানের উপরেই অবতীর্ণ হতো না; খোদা ঐ সকল লোকের হৃদয়েও কথা বলতেন। এবং কখনই কোন ধর্ম কায়েম হতে পারতো না, যদি তার প্রথম যুগের অনুসারীদের হৃদয়ে খোদার আওয়াজ ধ্বনিত না হতো। মানুষ যখন তাদেরকে পরিত্যাগ করতো, আত্মীয় স্বজনেরা যখন তাদের থেকে মুখ ফেরায়ে নিতো, তখন খোদাতায়ালা তাদের হৃদয়ে বলতেন, 'আমি তোমাদের সাথে আছি।' অতএব, ঐ সমস্ত অত্যাচার তাদের জন্য শান্তি হয়ে উঠতো, গালিগালাজ আশীর্বাদ হয়ে বর্ষিত হতো। পাথর মখমল হতো।

মক্কায় বিরোধিতা বেড়েই চলছিল। কিন্তু, সেই সঙ্গে ঈমানও উন্নতি করছিল। অত্যাচার সীমা লংঘন করছিল। কিন্তু সাধুতাও অতীতের সকল সীমা অতিক্রম করে উন্নত হয়ে উঠছিল।

স্বাধীন মুসলমানদের উপরে অত্যাচার

স্বাধীন মুসলমানদের উপরে কিছু কম অত্যাচার করা হতো না। তাদের অভিভাবকরা এবং বংশের মুরব্বীরা তাদের উপরে নানা প্রকার জুলুম চালাতো। হযরত ওসমান (রাঃ)-এর বয়স ছিল প্রায় চল্লিশ বৎসর এবং তিনি ধনীও ছিলেন। তা সত্ত্বেও কোরেশরা তাঁর উপরে অত্যাচার চালাবার সিদ্ধান্ত নিলো। তাঁর চাচা হাকাম তাঁকে রশি দিয়ে বেঁধে পিটাতো। জুবায়ের (রাঃ) বিন আওয়াম ছিলেন একজন তেজস্বী যুবক (ইসলামের বিজয়ের যুগে তিনি একজন জবরদস্ত জেনারেল হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন)। তাঁর চাচাও তাঁর প্রতি নিষ্ঠুর অত্যাচার চালাতো। তাঁকে চাটাই দিয়ে জড়ায়ে বেঁধে তার মধ্যে ধোঁয়া দিত। ফলে তাঁর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যেত। তখন তাঁকে তারা বলতো, 'এখন বল, তুমি ইসলাম ছাড়বে কি না?' কিন্তু তিনি সেই দুঃসহ কষ্ট সহ্য করতেন, এবং বলতেন, 'আমি সত্যকে চেনার পর তা কখনই ছাড়তে পারবো না।'

হযরত আবুজর (রাঃ) ছিলেন গোফ্ফার গোত্রের লোক। সেখান থেকে তিনি শুনতে পেলেন যে, মক্কার এক ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রেরিত হওয়ার দাবী করেছেন। তিনি সত্যাসত্য যাচাইয়ের জন্য মক্কায় এলেন। মক্কার লোকেরা তাঁকে নিরস্ত করার চেষ্টা করলো এবং বললো যে, মুহাম্মদ তো আমাদের নিজেদের লোক, আমরা জানি সে কিসের দোকান খুলেছে। কিন্তু আবুজর নিজ সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন। এবং নানাভাবে চেষ্টা করতে করতে শেষে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর নিকটে পৌঁছলেন। রসূলুল্লাহ্ তাঁকে ইসলামের শিক্ষা সম্বন্ধে বললেন। ফলশ্রুতিতে, তিনি

ইসলাম কবুল করলেন। এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলেন যে, যদি তিনি কিছুদিন তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা তাঁর গোত্রের লোকজনের কাছে প্রকাশ না করেন তাতে তো কোন দোষ হবে না ? 'কিছুদিন চুপ থাকলে দোষের কিছু নেই'-এই অনুমতিসহ তিনি তাঁর গোত্রের পথে রওয়ানা হলেন এবং মন মনে ঠিক করলেন যে, কিছুদিন ধরে অবস্থা আগে ঠিক ঠাক করে নিব, পরে নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করবো। কিন্তু যখন তিনি মক্কার রাস্তা দিয়ে বের হয়ে আসছিলেন, তখন দেখতে পেলেন যে, মক্কার নেতারা এক মজলিসে বসে ইসলামের বিরুদ্ধে গালি-গালাজ করছে। তিনি কিছুদিন নিজের বিশ্বাসের কথা গোপন রাখবেন বলে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা ভুলে গেলেন এবং অসংকোচে ঐ মজলিসের সামনে ঘোষণা করলেন ঃ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

'আমি সাক্ষ্য দান করছি যে, আল্লাহ্ এক, তাঁর কোনও শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দান করছি যে, মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রসূল।' শত্রুদের মজলিসের মধ্যে যেই না তিনি এই ঘোষণা দিয়ে বসলেন, অমনি শত্রুরাও তাঁকে আক্রমণ করে বসলো। এবং তাঁকে এতো মার মারলো যে, তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। জালেমরা তাদের হাত গুটালো না, মারতেই থাকলো। এ সময় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চাচা আব্বাস - যিনি তখনও মুসলমান হননি, হঠাৎ সেখানে এসে পড়লেন। এবং তিনি ঐ লোকদেরকে বুঝালেন যে, আবুজরের গোত্রের এলাকার পথ দিয়েই তো তোমাদের খাদ্যের কাফেলা আসে। তারা যদি বিগড়ে যায়, তাহলে মক্কা ভূখা মারা যাবে। এতে ঐ লোকগুলো আবুজরকে (রাঃ) ছেড়ে দিল। আবুজর একদিন বিশ্রাম নিলেন এবং দ্বিতীয় দিনে আবার ঐ মজলিসে গেলেন। সেখানে রসূলে করীম (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে যা-তা কথাবার্তা বলা একটা নিয়মে দাঁড়িয়েছিল। তিনি (রাঃ) কাবা ঘরে গেলেন এবং দেখলেন যে সেখানেও ঐ একই অবস্থা। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং নিজের তওহীদের প্রতি বিশ্বাসের কথা ঘোষণা করলেন। লোকেরা আবার তাঁকে মারপিট শুরু করে দিল। এইভাবে তিন দিন কেটে গেল। পরে তিনি নিজ গোত্রের পথে রওয়ানা হয়ে গেলেন।

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লাম-এর উপরে অত্যাচার

স্বয়ং রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামের পবিত্র সত্তাও নিরাপদ ছিল না। তাঁকে থেকে থেকেই নানা প্রকারের দুঃখ-কষ্ট দেওয়া হতো। একদিন তিনি যখন নামায পড়ছিলেন তখন কিছু লোক তাঁর গলায় কাপড় পেঁচিয়ে সেই কাপড়টাতে পাক দিতে লাগলো। এমন কি, ক্রমাগত সেই চাপে তাঁর চক্ষু ঠিক্‌রে বের হয়ে পড়ার উপক্রম হলো। এমন সময়, সেখানে আবু বকর (রাঃ) এসে পড়লেন এবং লোকগুলোকে এই কথা বলতে বলতে তাঁকে ছাড়িয়ে নেন, "আহা! তোমরা কি একটা মানুষকে শুধু এজন্যই মেরে ফেলবে যে, সে বলে, 'আল্লাহ্ আমার প্রভু'-* আর একদিন তিনি (সাঃ) যখন নামায পড়ছিলেন তখন সিজদার অবস্থায় তাঁর পিঠের উপরে উটের বিরাট নাড়িভুঁড়ি দিয়ে তাঁকে চাপা দিয়ে রাখা হয় এবং অন্য লোকেরা সেই সব নাড়িভুঁড়ি না সরানো পর্যন্ত তিনি সেই ভারি ময়লার বোঝার চাপের তলেই পড়ে থাকেন। একদিন তিনি (সাঃ) বাজার থেকে আসছিলেন, মক্কার বদমাশ ছোকরাদের একটি দল তাঁকে ঘিরে ফেলে এবং সারাটা রাস্তায় তাঁর ঘাড়ের উপরে পাথর কংকর মারতে থাকে এবং চীৎকার করে বলতে থাকে, 'শোনো, সবাই শোনো, এই হচ্ছে সেই লোক যে দাবী করে যে, সে নবী।'

তাঁর (সাঃ) বাড়ীর ভিতরে আশেপাশের বাড়ীগুলি থেকে আবর্জনা ফেলা হতো। বাবুর্চীখানার ময়লা নিক্ষেপ করা হতো। ভেড়া, বকরী, উট হত্যাদির নাড়িভুঁড়ি নিক্ষেপ করা হতো। যখন তিনি নামায পড়তেন তখন তাঁর উপরে ধূলোমাটি নিক্ষেপ করা হতে। শেষ পর্যন্ত তিনি বাধ্য হয়ে খোলা জায়গা বাদ দিয়ে একটা পাথরের আড়ালে নামায পড়ার ব্যবস্থা করলেন। তবে, এই সকল অত্যাচার বিফলে যায়নি। কেননা, এসব দেখে দেখে ভদ্র ও সৎ স্বভাবের লোকেরা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ছিলেন।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একদিন একাকী কাবার নিকটবর্তী সাফা পাহাড়ের উপরে বসা ছিলেন। হঠাৎ করেই তাঁর সব চাইতে বড় দুশমন মক্কার নেতা আবু জাহল

---

* *বুখারীঃ প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৫৪৪, মুজতাবায়ী ছাপাখানা, বাবু বুনিয়ানুল কাবা, বুখারী ঃ কিতাবুস্ সালাত*

সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলো। এবং তাঁকে গালিগালাজ করা শুরু করে দিল। তিনি তার গালিগালাজ শুনেও কোন প্রকার উত্তর দেওয়া থেকে বিরত থাকেন। পরে নীরবে সেখান থেকে উঠে বাড়ীর দিকে রওয়ানা দেন। তাঁর বাড়ীর এক দাসী সেখানে এই ঘটনা দেখেছিল। সন্ধ্যার সময়, তাঁর (সাঃ) চাচা হামযা (রাঃ), যিনি একজন শক্তিশালী ও তেজস্বী পুরুষ ছিলেন এবং যার শক্তিমত্তার দরুন লোকেরা তাঁকে ভয় করে চলতো, তিনি শিকার থেকে বাড়ী ফিরলেন এবং তাঁর স্কন্ধে তখনও তীর ও ধনুক ঝুলছিল, এবং খুব বাহাদুরীর সঙ্গেই তিনি বাড়ীতে প্রবেশ করছিলেন। তখন সেই দাসী হামযাকে (রাঃ) এই অবস্থায় দেখে সহ্য করতে পারলো না কেননা, সকালের ঐ ঘটনা দেখার পর থেকে তার মনটা খারাপ হয়েছিল। সে তাঁকে (রাঃ) খোঁটা দিয়ে বললো, খুব তো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বাহাদুরী দেখিয়ে বেড়ান, কিন্তু আপনি কি জানেন আজ সকালে আবু জাহল আপনার ভাতিজার সাথে কী ব্যবহার করেছে ? হযরত হামযা জিজ্ঞেস করলেন- 'কি করেছে সে ?' সে তখন গোটা ঘটনাটি হামযার কাছে বর্ণনা করলো। হামযা (রাঃ) তখনও মুসলমান হননি, কিন্তু তিনি ছিলেন ভদ্র চরিত্রের মানুষ। ইসলামের বাণীও তিনি শুনেছিলেন। এবং সে বাণীর প্রভাব সুনিশ্চিতভাবেই পড়েছিল তাঁর উপরে। কিন্তু নিজের স্বাধীনচেতা মনোভঙ্গীর দরুন তিনি এ বিষয়ে বড় একটা মনোনিবেশ করেন নি। কিন্তু ঐ ঘটনার বর্ণনা যখন তিনি শুনলেন, তখন আর নিজেকে সম্বরণ করতে পারলেন না। তাঁর চোখের উপর থেকে গাফলতির পর্দা ছিন্ন হয়ে গেল, এবং তাঁর মনে হলো যেন এক মহামূল্যবান বস্তু তাঁর হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লেন এবং সোজা কাবা ঘরের পাশে সেই জায়গায় গিয়ে উপস্থিত হলেন যেখানে নেতৃবৃন্দ একত্রে বসে পরামর্শ-সভা করতো। তিনি তাঁর স্কন্ধ থেকে ধনুক নমিয়ে নিয়ে খুব জোরে আবু জাহলকে আঘাত করলেন এবং বললেন, 'শুনে নাও, আমিও মুহাম্মদের ধর্ম গ্রহণ করেছি। তুমি আজ সকালে বিনা কারণে তাকে গালাগালি করেছ এবং তা করেছ এই সাহসে যে, সে কিছু বলবে না। যদি বাহাদুর হয়ে থাক, তাহলে আমার এই আঘাতের পাল্টা আঘাত করে দেখ।' ঘটনাটা এতটা সহসাই ঘটেছিল যে, আবুজাহল ঘাবড়ে গিয়েছিল। তার সঙ্গীরা হামযার (রাঃ) সঙ্গে লড়াই করবার জন্য উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু হামযার শক্তি সাহস এবং তাঁর গোত্রীয় ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির কথা খেয়াল করে আবু জাহল মনে করলো যে, লড়াই যদি লেগেই যায় তবে তার পরিণাম খুব খারাপ হবে। তাই সে তার সঙ্গীদেরকে এই বলে থামলো, 'আরে ছেড়ে দাও, আসলে আমি ঠিকই ওর ভাতিজাকে আজ বিশ্রীভাবে বকাবকি করেছিলাম।' *

---

* *ইবনে হিশাম, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৯৯ ও তাবারী ঃ ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ১১৮৭*

ইসলামের বাণীর প্রচার

বিরোধিতা বেড়েই চললো। একই সঙ্গে রসূলে করীম (সাঃ) এবং সাহাবীগণও (রাঃ) মক্কাবাসীদের কাছে পৌঁছাতে থাকলেন এই বাণী ঃ

'বিশ্বজগতের সৃষ্টি কর্তা খোদা এক, তিনি ছাড়া কোন মাবূদ (উপাস্য) নেই। যত নবী ইতোপূর্বে গত হয়ে গেছেন তাঁরা সকলেই তাঁর তওহীদ বা একত্বেরই প্রচার করে গেছেন। এবং তাঁরা এই শিক্ষাই দিতেন তাঁদের স্ব স্ব জাতিকে। তোমরাও এক খোদার প্রতি ঈমান আনো। এই পাথরের প্রতিমাগুলোকে পরিত্যাগ করো। এগুলো সব নিষ্প্রাণ এবং এগুলোর কোন শক্তি নেই'।

'হে মক্কাবাসীরা! তোমরা কি দেখতে পাওনা যে, ওগুলোর সামনে যে নযর-নেয়াজ বা নৈবেদ্য রাখা হয়, সেগুলির উপরে যদি মাছিও বসে, তবে সেই মাছি তাড়াবার শক্তিও ওদের নেই ? কিংবা যদি কেউ ওদের উপরে হামলা করে, তাহলে ওরা নিজেদেরকে রক্ষা করতেও পারে না ? কেউ যদি ওদেরকে কিছু জিজ্ঞেস করে, তাহলে তার উত্তর দিতেও পারে না ? কেউ যদি ওদের কাছে কিছু সাহায্য চায়, তবে ওরা তাকে সাহায্য করতেও পারে না' ?

'পক্ষান্তরে, এক আল্লাহ্ তো প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা পূর্ণ করেন, প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তর দেন। সাহায্যপ্রার্থীকে সাহায্য করেন। এবং নিজের উপাসনাকারী বান্দাদেরকে বড় বড় সাফল্য দান করেন। তাঁর থেকেই আলো আসে, যে আলো তাঁর এবাদতকারীদের হৃদয় আলোকিত করে। এরপরও কেন তোমরা এমন খোদাকে ছেড়ে নিষ্প্রাণ মূর্তিগুলোর সামনে মাথা নত কর ? এবং কেন নিজেদের সারাটা জীবনকে নষ্ট করে ফেলো ? তোমরা কি দেখতে পাওনা যে, খোদাতা'লার তওহীদ ছেড়ে দেওয়াতে তোমাদের ধ্যান-ধারণা কলুষিত হয়ে গেছে ? হৃদয় অন্ধকার হয়ে গেছে ? তোমরা নানা প্রকার বিকৃত শিক্ষা ও সংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে গেছ ? তোমরা হালাল-হারামের মধ্যে কোন বাছ-বিচার করতে পার না ? ভাল ও মন্দের মধ্যেও পার্থক্য করতে পার না ? নিজেদের মাদেরকে পর্যন্ত লাঞ্ছিত কর ? নিজেদের বোন-বেটীদের উপরেও অত্যাচার কর? তাদের হক তাদেরকে দাও না ? তাদেরকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখ ? নিজেদের স্ত্রীদের সঙ্গেও তোমরা ভাল আচরণ কর না ? তোমরা এতীমদেরও হক মেরে খাও? বিধবাদের সঙ্গেও খারাপ ব্যবহার কর ? অপরের হক মেরে নিজেদের বড়াই বজায় রাখতে চাও ? মিথ্যা ও প্রতারণার প্রতি তোমাদের ঘৃণা নেই ? চুরি ও ডাকাতির প্রতি তোমাদের ঘৃণা নেই ? জুয়া ও শারাব হচ্ছে

তোমাদের নেশা ? বিদ্যা অর্জন ও জাতির সেবার প্রতি তোমাদের কোন খেয়াল নেই ? এক আল্লাহ্ থেকে আর কতদিন তোমরা গাফেল থাকবে' ?

'আস! এবং নিজেদের সংশোধন কর। বর্বরতা ছেড়ে দাও। প্রত্যেক হকদারকে তার হক দাও। খোদা যদি তোমাদের ধনসম্পদ দিয়ে থাকেন, তাহলে তা দেশ ও জাতির খেদমতে এবং দুর্বল ও দরিদ্রের উন্নতির জন্যে খরচ কর। নারীদেরকে সম্মান কর। এবং তাদের হক আদায় কর। এতীমদেরকে আল্লাহ্র আমানত মনে কর। তাদের দেখাশোনা করাকে মহাপুণ্যের কাজ বলে স্বীকার কর। বিধবাদের সাহায্য-সহায়তা কর। পুণ্য কাজ ও খোদা-ভীতি কায়েম কর। শুধু ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা নয় বরং সেই সঙ্গে দয়া ও উপকারকে নিজেদের অভ্যাসে পরিণত কর। এই দুনিয়াতে তোমাদের আগমন যেন বৃথা না যায়। উৎকৃষ্ট আদর্শ রেখে যাও, যেন চিরস্থায়ী পুণ্যকাজের বীজ বপন করা হয়। অধিকার আদায় করাতে নয়, বরং কোরবানী ও স্বার্থত্যাগ করাতেই আসল মর্যাদা নিহিত। অতএব, তোমরা কোরবানী কর। খোদার নৈকট্যে উপনীত হও। খোদার বান্দাদের মোকাবেলায় স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন কর, যাতে খোদাতা'লার দরবারে তোমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়'।

'সন্দেহ নেই যে, আমরা দুর্বল। কিন্তু আমাদের দুর্বলতা দেখিও না। আসমানের উপরে সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে সত্যের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার। এখন মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে ন্যায়ের তুলাদন্ড তুলে ধরা হবে। এবং ইনসাফ ও রহমতের শাসন কায়েম করা হবে। ফলে, কারো উপরে আর জুলুম হবে না। ধর্মের ব্যাপারে কারো হস্তক্ষেপ থাকবে না, জবরদস্তি থাকবে না। নারী ও ক্রীতদাসের প্রতি যে জুলুম করা হচ্ছে, তা শেষ করা হবে। এবং শয়তানের হুকুমতের স্থলে এক আল্লাহ্র হুকুমত প্রতিষ্ঠিত করা হবে।'

আবু তালিবের কাছে কাফেরদের অভিযোগ এবং আঁ-হযরত (সাঃ)-এর অবিচলতা

ইসলামের এই সমস্ত শিক্ষা যখন বারবার মক্কাবাসীদেরকে শোনানো হচ্ছিল এবং ইসলামের প্রতি ভদ্র স্বভাবের লোকদের আকর্ষণ বৃদ্ধি পাচ্ছিল, তখন একদিন মক্কার নেতৃবৃন্দ জোটবদ্ধ হয়ে আঁ হযরত (সাঃ)-এর চাচার কাছে এলো এবং তাঁকে বললো,

'আপনি আমাদের নেতা। তাই, আপনার খাতিরে আমরা এতদিন আপনার ভাতিজা মুহাম্মদকে কিছু বলিনি। কিন্তু, আর তো চুপ করে থাকা যায় না। এখন

আপনার সাথে আমাদের একটা বুঝা-পড়া হওয়া উচিৎ। আপনি তাকে বুঝান, আপনি তাকে জিজ্ঞেস করুন, আসলে সে কি চায় আমাদের কাছে। যদি তার ইচ্ছা এটাই হয় যে, সে সম্মান চায়, তাহলে আমরা তাকে আমাদের নেতা বানাতে রাজি আছি। যদি সে ধন-সম্পদ চায়, তাহলে, আমরা প্রত্যেকেই আমাদের ধনসম্পদের একটা হিস্যা তাকে দিয়ে দিতে রাজি আছি। যদি সে বিয়ে করতে চায়, তাহলে মক্কার যে কোন যুবতী, তার নাম সে বলুক, তার সাথে আমরা ওর বিয়ে করায়ে দিচ্ছি। এ সবকিছুর পরিবর্তে আমরা ওর কাছে কিছুই চাই না, এবং ওকে আর কোন ব্যাপারে বাধাও দিতে চাই না, আমরা শুধু এতটুকুই চাই যে, সে যেন আমাদের দেবতাদের বিরুদ্ধে কোন কথা না বলে। সে যত খুশী বলুক না যে, খোদা এক, খোদা এক; কিন্তু সে যেন একথা না বলে যে, আমাদের এই দেবতারা কিছু নয়। সে যদি শুধু এতটুকুই মেনে নেয়, তাহলে ওর সাথে আমাদের কোন বিরোধ থাকবে না, সব মীমাংসা হয়ে যাবে। আপনি ওকে বুঝান, এবং আমাদের প্রস্তাব আপনি মেনে নিন। তা না হলে, দু'টোর একটা করতেই হবে,- হয় আপনি আপনার ভাতিজাকে ছাড়বেন, নয়তো আপনার জাতি আপনার নেতৃত্ব অস্বীকার করে আপনাকেই ছাড়বে।'

কথাগুলো আবু তালিবের জন্য ছিল অত্যন্ত কঠোর ও মর্মান্তিক। আরবদের কাছে তো টাকা-কড়ি তেমন একটা ছিল না। তাদের আসল খুশীর বিষয় ছিল তাদের নেতৃত্ব। নেতারা জাতির জন্য বাঁচতো, জাতিও নেতাদের জন্য বাঁচতো। কাজেই এই সব কথা শোনার পর আবু তালিব দারুণভাবে ব্যথিত হলেন। তিনি মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে ডেকে আনলেন এবং তাকে বললেন,

'হে আমার ভাতিজা! আমার জাতি আমার কাছে এসেছে এবং আমাকে এই প্রস্তাব দিয়েছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে এই কথাও বলেছে যে, যদি আপনার ভাতিজা এই সব কথার একটাতেও রাজি না হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে, আমাদের পক্ষ থেকে সব রকম চেষ্টা শেষ হয়ে গেছে। এরপরও সে যদি তার পথ থেকে ফিরে না আসে, তাহলে আপনার কাজ হবে যে, আপনি তাকে ছাড়বেন। আর যদি আপনি তাকে ছাড়তে রাজি না হন, তাহলে আমরা আপনার নেতৃত্ব অস্বীকার করে আপনাকেই ছাড়বো।'

আবু তালিব যখন এই সব কথা বলছিলেন, তখন তাঁর দু'চোখ ভরে অশ্রু ঝরছিল। তাঁর চোখে পানি দেখে রসূলে করীম (সাঃ)-এর চোখেও পানি এলো। এবং তিনি বললেন,

'চাচাজান! আমি একথা বলছি না যে, আপনি আপনার জাতিকে ছেড়ে দিন এবং আমার সাথেই থাকুন। আপনি নির্দ্বিধায় আমাকে ছাড়তে পারেন। কিন্তু

আমি এক আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলছি যে, যদি সূর্যকে আমার ডানে এবং চন্দ্রকে আমার বামে এনে খাড়া করে দেওয়া হয়, তাহলেও আমি আমার আল্লাহ্‌র একত্বের বাণী প্রচার করা থেকে বিরত থাকতে পারবো না। আমি আমার কাজ করে যেতেই থাকবো, যতক্ষণ না আমার মৃত্যু হয়। আপনি, আপনার অবস্থান নিজেই ঠিক করে নিন'।

এই ঈমান ও সাধুতায় ভরা কথাগুলি আবু তালিবের চোখ খুলে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। তিনি মনে মনে উপলব্ধি করলেন, আমি ঈমান আনার সৌভাগ্য পাইনি ঠিকই, কিন্তু ঈমানের এই দৃশ্য দেখবার যে সৌভাগ্য আমার হয়েছে, সেতো সকল সম্পদের চাইতে শ্রেষ্ঠ সম্পদ। অতএব তিনি বললেন,

'হে আমার ভাতিজা! যাও, নিজের কর্তব্য করে যাও। জাতি যদি আমাকে ছাড়তে চায় তো ছাড়ুক। আমি তোমাকে ছাড়বো না।'*

আবিসিনিয়ায় হিজরত

মক্কাবাসীদের অত্যাচার যখন সীমা ছাড়িয়ে গেল তখন মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর সাহাবীগণকে (রাঃ) ডাকলেন এবং বললেন, পশ্চিমে সমুদ্রের ওপারে এমন একটি দেশ আছে যেদেশে খোদার এবাদতের কারণে কারো প্রতি অত্যাচার করা হয় না। ধর্ম পরিবর্তনের কারণে কাউকে হত্যা করা হয় না। সেদেশে এক ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ্‌ রাজত্ব করেন। তোমরা হিজরত করে সে দেশেই চলে যাও। হয়তো এতে করে তোমাদের নিরাপত্তার পথ খুলে যাবে। অতএব, কিছু সংখ্যক মুসলিম পুরুষ ও নারী এবং ছোট ছেলেমেয়ে তাঁর (সাঃ) নির্দেশ অনুযায়ী আবিসিনিয়ার দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। এদের পক্ষে মক্কা থেকে বের হওয়াটা কোন সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। মক্কার লোকেরা নিজেদেরকে কাবাঘরের মোতয়াল্লী বা হেফাযতকারী মনে করতো, এবং মক্কা ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়াটাকে তারা সইতে পারতো না। তারা মনে করতো, অমন কাজ কেবল সেই ব্যক্তিই করতে পারে, যার জন্য দুনিয়ার বুকে আর কোন ঠিকানা নেই। কাজেই সাহাবীদের (রাঃ) জন্য মক্কা ছেড়ে বের হয়ে যাওয়াটা ছিল বড়ই মর্মান্তিক ব্যাপার। তাছাড়া, এভাবে বের হয়ে যাওয়াটা ছিল চুরি করারই নামান্তর। কেননা, তাঁরা জানতেন যে, বিষয়টা মক্কাবাসীরা জানতে পারলে তাঁদেরকে যেতে দেবে না। কাজেই, রওয়ানা হওয়ার আগে তাঁরা তাদের অনেক আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গেও শেষ সাক্ষাৎ করতে পারলেন না।

---

*(ইবনে হিশাম ঃ প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৮ ও তাবারী।)

দুঃখভারাক্রান্ত ছিল তাঁদের হৃদয়ের অবস্থা। তাঁদের প্রতি যারা তাকিয়ে দেখছিলেন, তাঁরাও তাঁদের দুঃখে দুঃখিত না হয়ে পারছিলেন না। এমতাবস্থায়, তাঁদের সেই কাফেলা যখন যাত্রা শুরু করলো, তখন হযরত উমর (তখনও পর্যন্ত তিনি অবিশ্বাসী ছিলেন, এবং ইসলামের কট্টর দুশমন ছিলেন এবং মুসলমানদেরকে কষ্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকাই পালন করতেন) আকস্মিকভাবে ঐ কাফেলার কয়েকজনের সাক্ষাৎ পেয়ে যান। এঁদের মধ্যে একজন মহিলার নাম ছিল উম্মে আব্দুল্লাহ্। গাঁটরী বাধা মাল-সামান এবং প্রস্তুত সওয়ারী পশুগুলোকে উমর যখন দেখলেন, তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, এরা মক্কা ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তিনি বললেন, 'উম্মে আব্দুল্লাহ্, এতো দেখছি হিজরতের মাল-সামান।' উম্মে আব্দুল্লাহ্ বলেছেন, 'আমি উত্তরে বলেছিলাম, আল্লহ্র কসম আমরা অন্য দেশে চলে যাচ্ছি। কেননা, তোমরা আমাদেরকে বড়ই কষ্ট দিচ্ছ। আমাদের উপরে নিদারুণ অত্যাচার করা হচ্ছে। আমরা ততদিন নিজেদের জন্মভূমিতে ফিরে আসব না, যতদিন না খোদা সেই পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন।' উম্মে আব্দুল্লাহ্ আরও বলেছেন, জবাবে উমর বলেছিল, 'ঠিক আছে! খোদা তোমাদের সাথী হউন।' এবং আমি তার কথার ভাবাবেগ লক্ষ্য করেছিলাম, যা ইতোপূর্বে আমি কখনই তার মধ্যে লক্ষ্য করিনি। এবং সে তাড়াতাড়ি মুখ ফেরায়ে নিয়ে চলে গেল। আমি তখন অনুভব করলাম যে, এই ঘটনা তাকে খুবই দুঃখ-ভারাক্রান্ত করে তুলেছে।'

তাঁদের এই হিজরতের খবর যখন মক্কবাসীরা জানতে পারলো, তখন তারা তাঁদের পিছনে বেরিয়ে পড়লো এবং সমুদ্রের তীর পর্যন্ত পৌছে গেল। কিন্তু, ততক্ষণে, ঐ কাফেলার লোকেরা জাহাজে চড়ে আবিসিনিয়া অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেছেন। মক্কাবাসীরা তাঁদের গন্তব্যের কথা জানতে পেরে সিদ্ধান্ত নিল যে, আবিসিনিয়ার রাজার কাছে একটা প্রতিনিধি দল পাঠাতে হবে, যারা রাজাকে উত্তেজিত করবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে এবং তাঁকে বলবে যেন তিনি মুসলমানদেরকে মক্কাবাসীদের হাতে সোপর্দ করে দেন। যাতে তাদেরকে এই প্রতারণার শাস্তি দেওয়া যায় যে, তারা কেন শহরের নেতৃবৃন্দের শাস্তি এড়ানোর মতলবে মক্কা থেকে পালিয়ে এসেছে। প্রতিনিধিদল আবিসিনিয়ায় গেল। ঐ দলে আমর ইবনে আল্ আসও ছিলেন, (যিনি পরে মুসলমান হয়েছিলেন এবং তাঁরই হাতে মিশর বিজয় হয়েছিল)। তারা রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলো। তারা আমীর ওমরাহদেরকে খুব খাতির-তোয়াজ করলো, উপঢৌকন দিল। কিন্তু, আল্লাহ্তায়ালা আবিসিনিয়ার বাদশাহ্র হৃদয়কে অবিচল রাখলেন। তিনি তাদের অনুরোধ-উপরোধ সত্ত্বেও, এমনকি তাঁর নিজের আমীর-ওমরাহ্দের অনুরোধ ও সুপারিশ সত্ত্বেও, মুসলমানদেরকে কাফেরদের হাতে সোপর্দ করতে অস্বীকার

করলেন। প্রতিনিধিদল যখন বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে এলো তখন মক্কাবাসীরা ঐ মুসলমানদেরকে ফেরৎ আনার জন্য নতুন ফন্দী খুঁজতে লাগলে। এবং তারা এক পর্যায়ে আবিসিনিয়ায় যাত্রাকারী অনেক কাফেলার মধ্যে এই মিথ্যা খবর ছাড়িয়ে দিল যে, মক্কার সব লোক মুসলমান হয়ে গেছে। এই খবর যখন আবিসিনিয়ায় পৌছল, তখন সেখানকার অধিকাংশ মুসলমানই মক্কায় ফিরে এলেন। কিন্তু মক্কায় পৌছে তারা বুঝতে পারলেন যে, এই খবর স্রেফ শয়তানী করে ছড়ানো হয়েছে। এর মধ্যে কোনও সত্যতা নেই। এতে কিছু লোক তো পুনরায় আবিসিনিয়ায় ফিরে গেলেন, কিন্তু কিছু লোক মক্কাতেই রয়ে গেলেন। মক্কায় থেকে যাওয়া এক ব্যক্তির নাম ছিল ওসমান বিন মাযউন, যিনি মক্কার একজন প্রভাবশালী নেতা ছিলেন। তাঁকে তার পিতার এক বন্ধু ওলীদ বিন মুগীরা নিরাপত্তা দিবেন বলে ঘোষণা দিলেন। ফলে তিনি শান্তির সঙ্গে মক্কায় বসবাস করতে থাকলেন। কিন্তু তিনি এই অবস্থায় দেখতে পেলেন যে, অন্যান্য মুসলমানদের উপরে অত্যাচার করা হচ্ছে। এবং তাদেরকে কঠিন থেকে কঠিনতর শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। যেহেতু তিনি একজন হৃদয়বান ও তেজস্বী যুবক ছিলেন, সেহেতু তিনি ওলীদের নিকটে গেলেন এবং তাকে বললেন, 'আমি আপনার দেওয়া নিরাপত্তা বর্জন করছি। কেননা, আমি এটা সহ্য করতে পারছি না যে, অন্যসব মুসলমান কষ্ট পাবে, অত্যাচারিত হবে, আর আমি আরামে দিন কাটাব। অতএব, ওলীদ ঘোষণা করে দিল যে, ওসমান এখন আর তার নিরাপত্তার মধ্যে নেই। এই ঘটনার পর একদিন আরবের বিখ্যাত কবি লবীদ নেতৃবৃন্দের মধ্যে বসে নিজের কবিতা শোনাচ্ছিল। সে তার কবিতার একটি পংক্তি পড়ছিলঃ

وَكُلُّ نَعِيْمٍ لَامَحَالَةَ زَائِلٌ

অর্থাৎ- 'প্রত্যেক নেয়ামতই পরিণামে শেষ হয়ে যাবে।'

ওসমান (রাঃ) বললেন, 'এটা ঠিক নয়, জান্নাতের নেয়ামত সর্বদাই কায়েম থাকবে।' লবীদ ছিল একজন মাননীয় ব্যক্তি। সে এই কথা শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠলো এবং বললো, 'হে কোরেশগণ! তোমাদের মেহমানকে তোমরা তো ইতোপূর্বে এভাবে অপদস্থ করতে না। এখন এই নতুন নিয়ম কবে থেকে শুরু হয়েছে?' এতে এক ব্যক্তি বললো, 'ও একটা নির্বোধ লোক, ওর কথার কোন গুরুত্ব দিবেন না।' ওসমান নিজের কথায় উপরে জোর দেওয়ার জন্য বললেন, 'নির্বুদ্ধিতার কথা কি হলো, আমি যা বলেছি তা-ই তো সঠিক।' ফলে, ঐ ব্যক্তি রেগে উঠে তাঁকে এমন জেরে ঘুষি মারলো যে, তাঁর (রাঃ) চোখ ঠিকরে বেরিয়ে পড়লো। ওলীদও তখন ঐ মজলিসে বসা ছিল। ওসমান (রাঃ)-এর পিতার সঙ্গে

তার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। যে তার প্রয়াত বন্ধুর ছেলের এই দুরবস্থা সইতে পারছিল না। কিন্তু প্রথা অনুসারে সে কিছু করতেও পারছিল ন। কেননা, ইতোপূর্বে ওসমান তার নিরাপত্তা থেকে স্বেচ্ছায় বের হয়ে গেছে। কাজেই, সে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে ওসমানকে (রাঃ) বললো, 'হে আমার ভাতিজা! খোদার কসম! তোমার এই চোখ এই কষ্ট থেকে বাঁচতে পারতো যখন তুমি এক শক্তিশালী নিরাপত্তার মধ্যে ছিলে। কিন্তু তুমি নিজেই সেই নিরাপত্তা পরিত্যাগ করেছ এবং এখন এই অবস্থায় পড়েছ।' জওয়াবে ওসমান (রাঃ) বললেন, 'যা কিছু আমার সঙ্গে করা হলো, তার প্রত্যাশাই আমি করছিলাম। আপনি আমার একটি চোখ বের হয়ে পড়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করছেন। কিন্তু, আমার ভাল চোখটি তো এই দুঃখে তড়পাচ্ছে যে, হায়! যা আমার বোনের ভাগ্যে ঘটলো, তা কেন আমার ভাগ্যেও ঘটলো না। মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আদর্শই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি যদি কষ্ট সইতে পারেন, তাহলে আমি কেন পারব না ? আমার জন্যে তো খোদার সাহায্যই যথেষ্ট।'

হযরত উমরের (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ

এই সময়ে মক্কায় এমন একটা ঘটনার কথা ছড়িয়ে পড়লো, যার দরুন মক্কায় উত্তেজনার আগুন জ্বলে উঠলো। ঘটনাটা ঘটেছিল এইভাবেঃ

উমর (রাঃ)-যিনি ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হয়েছিলেন, কিন্তু ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে ইসলামের ঘোরশত্রুদের মধ্যে একজন ছিলেন, তিনি একদিন বসে বসে চিন্তা করছিলেন যে, আজ পর্যন্ত তো ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য বহু চেষ্টাই করা হলো, কিন্তু কোন কাজ হলো না। কাজেই, এখন ইসলামের খোদ প্রতিষ্ঠাতাকেই হত্যা করা উচিত, যাতে এই ফেৎনা চিরদিনের জন্য শেষ হয়ে যায়। এই চিন্তা তাঁর মনে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তলোয়ার হাতে খাড়া হয়ে গেলেন এবং ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। এবং আঁ হযরত (সাঃ)-এর খোঁজ করতে লাগলেন। রাস্তায় এক বন্ধুর সঙ্গে তাঁর দেখা হলো। বন্ধু তাঁকে এই অবস্থায় দেখে, তাজ্জব হয়ে গেল এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, 'উমর! তুমি এভাবে কোথায় যাচ্ছ ?' উমর বললেন, 'মুহাম্মদকে কতল করতে যাচ্ছি।' বন্ধুটি বললো, 'তুমি মুহাম্মদকে হত্যা করে কি মুহাম্মদের গোত্রের হাত থেকে বাঁচতে পারবে ? তার চেয়ে বরং নিজের ঘরের খবরাখবর আগে নাও। তোমার বোন ও বোনাই তো মুসলমান হয়ে গেছে।' এই কথা উমরের মাথায় বজ্রাঘাত করল। তিনি ভাবলেন, 'আমি তো ইসলামের একজন ঘোর শত্রু এবং আমি এখন বের হয়েছি মুহাম্মদকে হত্যা করার জন্য, অথচ আমারই বোন-বোনাই কিনা ইসলাম

গ্রহণ করেছে ? যদি এটাই হয়ে থাকে তো আগে আমার বোন-বোনাইকে দুরস্ত করাই দরকার।' এই কথা চিন্তা করে তিনি তাঁর বোনের বাড়ীর দিকে রওয়ানা দিলেন, তিনি যখন তাঁর বোনের ঘরের দরজার কাছে পৌঁছলেন, তখন শুনতে পেলেন যে, কে যেন ঘরের ভিতরে মধুর কণ্ঠে কিছু কালাম পাঠ করছে। এই পাঠক ছিলেন হযরত খাব্বাব (রাঃ), যিনি উমরের বোন ও বোনাইকে কোরআন শরীফ শিখাচ্ছিলেন। উমর রাগান্বিত অবস্থায় ঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁর পায়ের শব্দ শুনেই খাব্বাব (রাঃ) ঘরের এক কোণায় লুকিয়ে পড়লেন। উমরের বোন, যার নাম ছিল ফাতেমা, তিনিও সাত তাড়াতাড়ি কোরআন শরীফের সেই পৃষ্ঠাগুলি, যা তখন পাঠ করা হচ্ছিল, লুকিয়ে ফেললেন। উমর কামরায় ঢুকেই ক্রোধের সঙ্গে বললেন, 'আমি শুনলাম, তোমরা নাকি তোমাদের ধর্ম ছেড়ে দিয়েছ ?' এবং এই কথা বলেই তিনি তাঁর ভগ্নিপতি, যিনি তাঁর চাচাতো ভাইও ছিলেন, তাঁকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলেন। ফাতেমা যখন দেখলেন যে, তাঁর ভাই তাঁর স্বামীকে আক্রমণ করছে, তখন তিনি ছুটে গিয়ে তাঁর স্বামীর সামনে খাড়া হলেন। উমর ততক্ষণে তাঁর হাত উঠিয়ে জোরে আঘাত করে বসেছিলেন, সেই হাত তখন আর তাঁর পক্ষে থামানো সম্ভব ছিল না। কাজেই উমরের হাত প্রচণ্ড বেগে পড়লো গিয়ে ফাতেমার মুখের উপরেই এবং ফাতেমার নাক ফেটে দরদর করে রক্ত ঝরতে লাগলো। ফাতেমা মার তো খেলেনই, কিন্তু সাহসের সঙ্গে বললেন, 'হ্যাঁ, উমর একথা সত্য যে, আমরা মুসলমান হয়ে গেছি। এবং মনে রেখ যে, আমরা আমাদের এই ধর্ম কখনই পরিত্যাগ করবো না। তোমার যা খুশী করতে পারো।' উমর একজন তেজস্বী লোক ছিলেন। জুলুম তাঁর বাহাদুরীকে নষ্ট করতে পারেনি। একজন নারী, এবং যে কিনা তার নিজেরই বোন, তাঁকে তিনি নিজ হাতে জখম করেছেন। এটা দেখে তিনি লজ্জিত হলেন, তাঁর মন অনুশোচনায় ভরে গেল। বোনের চেহারা থেকে রক্ত ঝরতে দেখে উমরের মন থেকে ক্রোধ দূরীভূত হলো। বোনের কাছে ক্ষমা চাইতে ইচ্ছে হলো তাঁর। তিনি বোনকে বললেন, 'আচ্ছা, ঠিক আছে! আমাকে শোনাও তো দেখি সেই কালাম, যা তোমরা তখন তেলাওয়াত করছিলে'। ফাতেমা বললেন, 'না আমি দেখাব না। তুমি ওগুলো নষ্ট করে ফেলবে।' উমর বললেন, 'না বোন, আমি তা করবো না।' ফাতেমা বললেন, 'তুমি তো নোংরা, আগে গোসল করে আস, তবে দেখাব।' অনুশোচনার কারণে তখন উমরের অবস্থা এমনই হয়েছিল যে, তিনি সব কিছু করতেই রাজি ছিলেন। কাজেই, তিনি গোসল করতেও রাজি হয়ে গেলেন এবং গোসল সেরে এলেন। ফতেমা তখন তাঁর হাতে কোরআন শরীফের সেই পাতাগুলি দিলেন। সেই পাতাগুলিতে কোরআন করীমের সূরা ত্বা-হা'এর কিছু সংখ্যক আয়াত লিখা ছিল। সেগুলি পড়তে পড়তে তিনি যখন এই আয়াত পর্যন্ত পড়লেনঃ

إِنَّنِيٓ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدْنِى وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِىٓ ﴿١٤﴾
إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا تَسْعَىٰ ﴿١٥﴾

'নিশ্চয় আমি আল্লাহ্, আমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, সুতরাং তুমি আমারই এবাদত কর এবং আমারই স্মরণার্থে নামায কায়েম কর। নিশ্চয় কেয়ামত অবশ্যম্ভাবী, আমি উহা শীঘ্রই প্রকাশিত করবো, যেন প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তার চেষ্টানুযায়ী কর্মের ফল দেওয়া যেতে পারে। *(সূরা ত্বাহা ঃ আয়াত ১৫-১৬)*

অর্থাৎ, আল্লাহ্ বলছেন, আমিই আল্লাহ্, আমি ছাড়া কোন মাবূদ নেই। অতএব, আমারই এবাদত কর। নামায পড়। এবং একে অন্যদের সঙ্গে একত্রে আমার এবাদত কর। শুধু আনুষ্ঠানিক এবাদত নয়, বরং পৃথিবীতে আমার মহিমা প্রতিষ্ঠার জন্য যে এবাদত সেই এবাদত কর। মনে রেখো, এই বাণী প্রতিষ্ঠিত করার সময় আসন্ন প্রায়। আমি এটা প্রকাশিত করবার জন্য সরঞ্জাম সৃষ্টি করছি। যার পরিণতি এই হবে যে, প্রত্যেকেই তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করবে। হযরত উমর (রাঃ) যখন এই আয়াত পর্যন্ত পড়লেন, তখন সহসাই তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এলো, 'কী আশ্চর্য! কী পবিত্র বাণী!' এই কথা যখন খাব্বাব (রাঃ) শুনলেন, তখন তিনি লুকানো অবস্থা থেকে বেরিয়ে এলেন এবং বললেন, 'এ তো রসূলে করীম (সাঃ)-এর দোয়ারই ফল! খোদার কসম! গতকাল আমি শুনেছি, তিনি এই দোয়া করছেনঃ

'ইলাহী! উমর ইবনে খাত্তাব এবং উমর ইবনে হিশাম এদের মধ্যে যেকোন একজনকে তুমি জরুর ইসলামের দিকে হেদায়াত দাও।'

উমর দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, 'আমাকে বলো, মুহাম্মদ (সাঃ) কোথায় আছেন।' তাঁকে বলা হলো যে, তিনি দারুল আরকামে আছেন। তিনি তখন সেই উলঙ্গ তরবারি হাতেই সেখানে গিয়ে পৌঁছলেন এবং দরজার কড়া নাড়লেন। সাহাবারা (রাঃ) দরজার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলেন যে, উমর নাংগা তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁরা দ্বিধাগ্রস্ত হলেন এই ভেবে যে, দরজা খুলে দিলে উমর না আবার ঘরে ঢুকে কোনো দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসে। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, 'কি হয়েছে ? দরজা খুলে দাও।' উমর তরবারি হাতেই ঘরে ঢুকে পড়লেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন এবং বললেন 'উমর! কি নিয়্যতে এসেছ ?' উমর বললেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমি মুসলমান হতে এসেছি।' এই কথা শুনেই রসূলে করীম (সাঃ) উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলেন, 'আল্লাহো আকবর'- (আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ)। উপস্থিত সকল সাহাবাও একই সঙ্গে তকবীর দিয়ে উঠলেন, 'আল্লাহো আকবর।' তাঁরা এতো জোরে তকবীর ধ্বনি উচ্চারণ

করলেন যে, পার্শ্ববর্তী পাহাড়ে তা প্রতিধ্বনিত হয়ে গেল। এবং এই খবর অল্পক্ষণের মধ্যে সারা মক্কায় দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়লো। পরে, উমরের (রাঃ) প্রতি একই অত্যাচার শুরু হয়ে গেল, যা পূর্বে থেকেই অন্যান্য সাহবাদের প্রতি হয়ে আসছিল। কিন্তু সেই উমর যিনি ইতোপূর্বে মারদাঙ্গা করতে এবং হত্যাকাণ্ড ঘটাতে আনন্দ পেতেন, এখন তিনি নিজেই মার খেতে এবং অত্যাচারিত হতে আনন্দ পেতে লাগলেন। উমর (রাঃ) বলেছেন যে, তিনি ঈমান আনার পরে মক্কার অলিতে গলিতে মার খেয়েছেন।

মুসলমানদেরকে বয়কট করা হলো

জুলুম ও অত্যাচার সীমালংঘন করেই চললো। কিছু লোক তো মক্কা ছেড়ে চলে গেলেন। আর যারা যেতে চাচ্ছিলেন তাদের উপরে পূর্বাপেক্ষা বেশী অত্যাচার হতে লাগলো। কিন্তু জালেমদের প্রাণ এতেও ঠাণ্ডা হচ্ছিল না। তারা যখন দেখতে পেলো যে, এতো অত্যাচার, এতো বেশী নির্যাতন সত্ত্বেও তাদের হৃদয় অবিচল রয়েছে, তাদের ঈমানে কোনও ফাটল ধরেনি, বরং তারা এক আল্লাহ্‌র এবাদতে পূর্বের চাইতে আরো বেশী অগ্রসর হয়ে গেছে এবং অগ্রসর হয়েই চলেছে। পক্ষান্তরে, দেবতাদের প্রতি তাদের ঘৃণা পূর্বের চাইতে আরও বেশী করে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে, তখন তারা একটা মজলিসে শূরা ডাকলো। এবং তারা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে, মুসলমানদের সঙ্গে সকল প্রকারের সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে, তাদেরকে বয়কট করতে হবে। কেউ যেন তাদের কাছে কোনো সওদাপত্র বিক্রয় না করে, কোন প্রকারের কোন লেনদেন না করে। এই পরিস্থিতিতে মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কিছু সংখ্যক অনুসারী এবং তদের বিবি-বাচ্চাদের সহ এবং কিছুসংখ্যক আত্মীয়স্বজন, যারা মুসলমান না হলেও তাঁকে ছাড়তে রাজি ছিলেন না, তাঁদেরকে নিয়ে একটি জনবিহীন স্থানে চলে যেতে বাধ্য হলেন। ঐ স্থানটি ছিল হযরত আবু তালেবের মালিকানাধীন একটি উপত্যকা।* তাঁদের কাছে তখন না ছিল টাকাকড়ি, না কোনও মাল-সামান, না মওজুদ খাদ্য-সামগ্রী। তাঁরা সেই কঠোর অবরুদ্ধ অবস্থায় কী যে নিদারুণ দুঃখকষ্টের মধ্যে কালাতিপাত করেছিলেন, তা কেবল ভুক্ত-ভোগী ছাড়া অন্য কারো পক্ষে কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। এই দুঃসহ অবস্থা চলেছিল প্রায় তিন বৎসর। এই সময়ের মধ্যে মক্কার সেই বয়কটের সিদ্ধান্তের কোন হেরফের হয়নি। প্রায় তিন বৎসর কেটে যওয়ার পর মক্কার জন পাঁচেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির

---

* *ইবনে হিশাম ঃ প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩০, যুরকানী ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭৯*

হৃদয়ে এই জুলুমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সৃষ্টি হলো। তাঁরা শেব-এ-আবু তালিবের (আবু-তালিব-উপত্যকার) প্রবেশ পথে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং অবরুদ্ধ ব্যক্তিদেরকে ডাক দিয়ে বললেন যে, তাঁরা যেন বাইরে বেরিয়ে আসেন। এবং তাঁরা এও জানিয়ে দিলেন যে, তাঁরা বয়কটের সিদ্ধান্তে যে সমর্থন দিয়েছিলেন, তা প্রত্যাহার করতে প্রস্তুত। হয়রত আবু তালিব দীর্ঘদিন যাবৎ ঐ অবরোধের মধ্যে থাকার দরুন ক্ষুধা তৃষ্ণায়, দুঃখকষ্টে দারুণ দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। তিনি কোনমতে বাইরে এলেন এবং তাঁর জাতিকে ভর্ৎসনা করে বললেন যে, তাদের এই দীর্ঘ অব্যাহত জুলুম কেমন করে, কী ভাবে বৈধ হতে পারে? সেই পাঁচজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বিদ্রোহের খবর বিদ্যুতের ন্যায় সারা শহরে ছড়িয়ে পড়লো। মানবিক স্বভাব আবার মাথা তুলতে লাগলো। পুণ্যের প্রেরণা পুনরায় শ্বাস গ্রহণ করতে লাগলো। তাই মক্কাবাসীরা ঐ শয়তানী অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে বাধ্য হলো। অঙ্গীকার তো শেষ হলো বটে, কিন্তু তিন বৎসরের দুঃখকষ্ট ও ক্ষুধা-তৃষ্ণার প্রভাব প্রকাশ পেতে লাগলো অল্পদিনের মধ্যেই। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বিশ্বস্ত সহধর্মীণি হযরত খাদিজা রাযি আল্লাহোতা'লা আনহা সেই অবরোধ বাসের কষ্টের পরিণতিতে মৃত্যুবরণ করলেন। এবং তার এক মাস পরে হয়রত আবু তালেব এই দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন।

আঁ হযরত (সাঃ)-এর তায়েফ সফর

মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীগণ এখন আবু তালিবের স্নেহ-সহায়তার আশ্রয় থেকেও বঞ্চিত হয়ে গেলেন। এবং মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহর (সাঃ) গৃহজীবনের সঙ্গীণী হযরত খাদিজাও (রাঃ) তাঁকে ছেড়ে চলে গেলেন। এই দুইজনের মৃত্যুতে স্বাভাবিকভাবেই সেই সকল লোকেরও সহানুভূতি তাঁর (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবাদের প্রতি কমে গেল, যাঁরা ঐ দু'জনের সম্পর্কের খাতিরে জালেমদের জুলুমে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করতো। আবু তালিবের মৃত্যুজনিত শোকের কারণে এবং আবু তালিবের ওসীয়্যতের কারণে আবু লাহাব (আবু তালেবের ছোট ভাই) তাঁকে (সাঃ) কিছুদিন সহায়তা দান করে কিন্তু যখন মক্কাবাসীরা তার উত্তেজনাকে এই বলে উস্কায়ে দিল যে, মুহাম্মদ তো যাঁরা খোদার একত্বে বিশ্বাসী নয় তাদের সবাইকে পাপী ও শাস্তিযোগ্য বলে মনে করে, তখন আবু লাহাবও নিজের অহমিকার কারণে উত্তেজিত হয়ে তাঁকে (সাঃ) সহায়তা দান বন্ধ করে দিল। এবং প্রতিজ্ঞা করলো যে, সে এখান থেকে পূর্বের চাইতে আরও বেশী বিরোধিতা করবে। অবরুদ্ধ জীবনযাপনের কারণে যেহেতু তিন বৎসর পর্যন্ত লোকেরা আত্মীয়-স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল, সেহেতু

মক্কাবাসীরা মুসলমানদের সঙ্গে কথাবার্তা না বলায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। ফলে, তবলীগের সুযোগও সীমিত হয়ে পড়েছিল। রসূলে করীম (সাঃ) যখন এই পরিস্থিতি লক্ষ্য করলেন, তখন তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তিনি মক্কার পরিবর্তে তায়েফ যাবেন এবং সেখানকার লোকদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছাবেন। বিষয়টা নিয়ে তিনি যখন চিন্তা-ভাবনা করছিলেন তখনই মক্কাবাসীদের প্রবল বিরোধিতা তাঁকে এ ব্যাপারে আরো বেশী করে উদ্বুদ্ধ করে তুললো। প্রথমতঃ মক্কাবাসীরা তো কোন কথাই শুনতে রাজি ছিল না। দ্বিতীয়তঃ তারা আরো একটা পন্থা অবলম্বন করেছিল, তারা মুহাম্মদ (সাঃ)-কে রাস্তায় চলাফেরা করতেও দিচ্ছিল না। যখনই তিনি বাইরে আসতেন তখনই তারা তাঁর (সাঃ) মাথায় ধূলোমাটি নিক্ষেপ করতো যাতে তিনি কারো সাথে কথাবার্তা বলতে বা দেখা সাক্ষাৎ করতে না পারেন। একদিন এই রকম অবস্থায় তিনি ঘরে ফিরে এলে তাঁর এক মেয়ে তাঁর মাথার ধূলোমাটি ঝাড়তে ঝাড়তে কান্না শুরু করে দিলেন। তিনি বললেন, 'মা আমার কেঁদো না। নিশ্চয় জেনো, আল্লাহ্ তোমার বাপের সাথেই আছেন।'* তিনি অবশ্য দুঃখ কষ্টের কারণে ঘাবড়াতেন না। কিন্তু মুশকিল্ হয়েছিল এই যে, লোকজন তাঁর কথাই শুনতে চাচ্ছিল না।

দুঃখ কষ্টকে তো তিনি প্রয়োজনীয় বলেই মনে করতেন। বরং তাঁর জন্য সব চাইতে কঠিন কষ্টের দিন হতো সেই দিন যেদিন কেউ তাঁকে কোন কষ্ট দিত না। লিখিত আছে যে, একদিন মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সাঃ) মক্কার গলিতে গলিতে তবলীগ করার জন্য বের হলেন, কিন্তু সেদিন বিশেষ কোনো প্রথা অনুসারে তাঁর সঙ্গে কথাও বললো না কেউ, কষ্টও দিল না কেউ, না কোন গোলাম, না কোন আযাদ ব্যক্তি। এতে রসূলে করীম (সাঃ) দুঃখ ও চিন্তায় এমন ভারাক্রান্ত হলেন যে, শুয়েই পড়লেন। শেষ পর্যন্ত, খোদাতায়ালাই তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন এবং বললেন, 'যাও, তোমার জাতিকে পুনরায় এবং পুনরায় সতর্ক করে দাও। এবং তাদের কোনও পরওয়া করো না।' অতএব, রসূলে করীম (সাঃ) সম্পর্কে এ কথা খাটে না যে, লোকেরা তাঁকে দুঃখ দিলে তিনি ব্যথিত হয়ে পড়তেন। তবে এটা ঠিক যে, তিনি খোদার নবী, যিনি দুনিয়াকে হেদায়াত দান করার জন্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তিনি এটা সইতে পারতেন না যে, লোকেরা তাঁর সাথে কথাই বলবে না, এবং তাঁর কথা শুনতেই চাইবে না। এই ধরনের নিষ্কর্ম জীবন তাঁকে সর্বাপেক্ষা বেশী পীড়া দিত। কাজেই তিনি এই দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, এখন তিনি তায়েফ যাবেন। এবং তায়েফের লোকদের কাছে খোদাতায়ালার বাণী পৌছাবেন। খোদাতায়ালার নবীদের জন্য এটা নির্ধারিত যে, তাঁরা এদিকে

---

* *ইবনে হিশাম ঃ প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪৫*

সেদিকে যাবেন এবং বিভিন্ন গোত্রের লোকদের কাছে পয়গাম পৌছাবেন। হযরত মূসা (আঃ) এরকমই করতেন; কখনও তিনি ফেরাউনের লোকদের কাছে খোদার বাণী পৌছাতেন এবং কখনও ইসহাকের বংশধরদের কাছে সেই বাণী পৌছাতেন। আবার কখনও বা মাদায়েনের লোকদের কাছে। হযরত ঈসা (আঃ)-ও তবলীগের উদ্দেশ্যে কখনও গ্যালীলির লোকদের কাছে যেতেন; কখনও বা জর্ডান নদীর পারের লোকদের কাছে যেতেন। আবার কখনও জেরুজালেমের এবং কখনও কখনও অন্যান্য লোকদের কাছেও তিনি তাঁর কথা বলতেন।

যখন মক্কার লোকেরা আর কথাই শুনতে চাচ্ছিল না, এবং তারা এই ফায়সালাও করে নিয়েছিল যে, মারো আর পিটাও কিন্তু, কোন কথাই কানে নিও না। তখন তিনি তা'য়েফের দিকে দৃষ্টি দিলেন। তায়েফ মক্কার দক্ষিণ-পূর্বে ষাট মাইল দূরে অবস্থিত একটি শহর। ফল-ফলাদি এবং ক্ষেত-খামারের জন্য বিখ্যাত। এই শহরটিও পৌত্তলিকতায় মক্কার চাইতে কিছু কম ছিল না। কাবাঘরে রক্ষিত মূর্তিগুলির ন্যায় মূর্তি ছাড়াও, লাত নাম্নী এক বিখ্যাত প্রতিমা ছিল তায়েফের মর্যাদার প্রতীক স্বরূপ, যার পূজার জন্য আরব তীর্থযাত্রীরা বহু দূর দূরান্ত থেকে তায়েফে আসতো, তায়েফের লোকদের সঙ্গে আত্মীয়তারও বন্ধন ছিল মক্কাবাসীদের। এবং তায়েফ ও মক্কার মধ্যবর্তী প্রান্তরে মক্কাবাসীদেরও অনেক ক্ষেত-খামার ও বিষয়-সম্পত্তি ছিল। যখন তিনি তায়েফে পৌছলেন, তখন সেখানকার নেতৃবৃন্দ তাঁর সাথে দেখা করার জন্য আসতে লাগলো। কিন্তু, কেউই সত্য গ্রহণ করতে রাজি হলো না। সাধারণ লোকেরাও তাদের নেতাদেরই অনুসরণ করলো। এবং খোদার পয়গামের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করতে লাগলো। দুনিয়াদার লোকদের দৃষ্টিতে সহায় সম্বলহীন নবী ঘৃণারই পাত্র হয়ে থাকেন। তারা শুনতে চায় জনতার আওয়াজ, সেনাবাহিনীর আওয়াজ। তাদের কাছে আঁ হযরত (সাঃ)-এর খবর আগেই পৌছে গিয়েছিল। তিনি যখন তায়েফ পৌছলেন, তখন তারা দেখলো যে, তাঁর সাথে না আছে লোকজন, না আছে সেনাদল, না অস্ত্রশস্ত্র। তিনি স্রেফ এক যায়েদকে সঙ্গে নিয়েই তায়েফের প্রসিদ্ধ এলাকাগুলোতে তাবলীগ করে চলেছেন। সেখানকার, হৃদয়ের দিক থেকে অন্ধ লোকগুলো দেখলো যে, তাদের সামনে খোদার কোন নবী নয়, বরং একটা অতি সাধারণ এবং ধোকা খাওয়া লোক ঘোরাফেরা করছে। এবং তারা এটাও ভাবলো যে, একে দুঃখ দিলে, কষ্টদিলে আমরা গোত্রের নেতাদের কাছে প্রশংসা লাভ করবো। তারা একদিন একত্রে জমায়েত হলো, সঙ্গে নিল সব ভবঘুরের দল, কুকুরের দল। তারা ছেলে ছোকরাদের একত্র করলো। তারা প্রত্যেকেই ঝোলা ভর্তি পাথরের টুকরা নিল। এবং নির্মমভাবে রসূলে করীম (সাঃ)-এর উপরে ঢিল

ছুঁড়তে লাগলো। তারা রসূলে করীম (সাঃ)-কে অবিশ্রান্তভাবে পাথর মারতে মারতে শহর থেকে বাইরে নিয়ে গেল। তাঁর দু'টি পা রক্তাক্ত হয়ে উঠলো। যায়েদ তাকে বাঁচাবার চেষ্টায় দারুণভাবে জখম হয়ে গেলেন। কিন্তু এতেও জালেমদের প্রাণ ঠাণ্ডা হলো না। তারা তাঁর (সাঃ) পিছু ছাড়লোনা। তারা পাথর ছুঁড়তে ছুঁড়তে আসতেই থাকলো। যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে একটা পাহাড়ে এসে পৌছলেন ততক্ষণ তারা তাঁর পিছু ছাড়লো না। এই লোকগুলো যখন তাঁর পিছু পিছু ধাওয়া করছিল তখন তিনি এই ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে ছিলেন যে, খোদার গযব না আবার ওদের উপরে পড়ে। তিনি আকাশের দিকে মুখ তুলে দেখছিলেন এবং কাতর প্রাণে প্রার্থনা করছিলেন,

'ইলাহী! তুমি এদেরকে ক্ষমা করে দাও! কেননা এরা জানে না, এরা কি করছে।' জখমে জখমে এবং লোকদের তাড়া খেয়ে খেয়ে তাঁর শরীরে আর চলার মত শক্তি ছিল না। এই অবস্থায় তিনি একটি আঙ্গুরের বাগানের ছায়ায় আশ্রয় নিলেন। এই আঙ্গুর বাগানটি ছিল মক্কার দু'জন নেতার। সেই নেতারা সে সময়ে সেই বাগানেই ছিল। তারা ছিল ঘোর শত্রু, তারা দশ বছর যাবৎ তাঁর (সাঃ) তীব্র বিরোধিতা করে আসছিল। তবে হতে পারে যে, সে সময় তাদের মনের মধ্যে এমন একটা ভাবের সৃষ্টি হয়েছিল যে, আহা! মক্কার একটি লোককে তায়েফের লোকেরা এমনভাবে জখম করেছে! অথবা এও হতে পারে যে, সে সময় তাদের মনের মধ্যে পুণ্যকাজের প্রেরণা উঁকি মারছিল। তারা এক থালা আঙ্গুর দিয়ে তাদের এক গোলাম আদ্দাসকে বললো, 'যাও এটা ঐ মুসাফেরদেরকে দিয়ে দাও।' আদ্দাস ছিল নিনেভার অধিবাসী এবং খৃষ্টান। যখন সে আঙ্গুরের থালাটি মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে রেখে দিল এবং তিনি যখন সেই আঙ্গুর 'বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রাহীম' বলে গ্রহণ করলেন, তখন খৃষ্টধর্মের স্মৃতি তার মনের মধ্যে পুনরায় উদিত হলো। তার মনে হলো, তার সামনে খোদার এক নবী বসে আছেন, যিনি ইসরাঈলী নবীদের মতই কথা বলছেন। তাকে রসূলে করীম (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার দেশ কোথায় ?' উত্তরে সে যখন বললো, 'নিনেভা'। তখন তিনি বললেন, সেই সাধু ব্যক্তি ইউনুস (আঃ) যিনি মত্তার পুত্র এবং নিনেভার বাসিন্দা ছিলেন, তিনিও আমার মতই খোদাতায়ালার একজন নবী ছিলেন। তিনি তখন আদ্দাসের কাছে তাবলীগ শুরু করে দিলেন। আদ্দাসের চিন্তাপ্লুত মন ক্ষণিকের মধ্যেই বিস্ময়ে ভরে গেল। এবং বিস্ময় তার ঈমানে পরিবর্তন ঘটালো। অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই অপরিচিত ক্রীতদাস অশ্রুভরা চোখে আঁ হযরতের পদতলে লুটিয়ে পড়লো। এবং তাঁর হাতে পায়ে চুমু দিতে লাগলো। আদ্দাসের সঙ্গে কথা বলা শেষ করে তিনি আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি মুখ তুললেন এবং আল্লাহ্‌র কাছে এই প্রার্থনা করলেনঃ

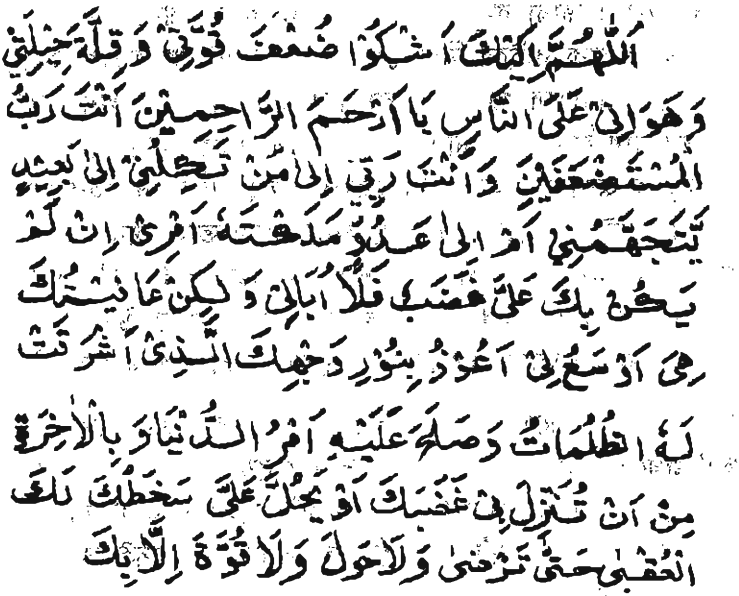
اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ اَشْكُوْا ضُعْفَ قُوَّتِيْ وَقِلَّةَ حِيْلَتِيْ
وَهَوَانِيْ عَلَى النَّاسِ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اَنْتَ رَبُّ
الْمُسْتَضْعَفِيْنَ وَاَنْتَ رَبِّيْ اِلٰى مَنْ تَكِلُنِيْ اِلٰى بَعِيْدٍ
يَتَجَهَّمُنِيْ اَمْ اِلٰى عَدُوٍّ مَلَّكْتَهٗ اَمْرِيْ اِنْ لَّمْ
يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا اُبَالِيْ وَلٰكِنَّ عَافِيَتَكَ
هِيَ اَوْسَعُ لِيْ اَعُوْذُ بِنُوْرِ وَجْهِكَ الَّذِيْ اَشْرَقَتْ
لَهُ الظُّلُمَاتُ وَصَلَحَ عَلَيْهِ اَمْرُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ
مِنْ اَنْ تُنْزِلَ بِيْ غَضَبَكَ اَوْ يَحُلَّ عَلَيَّ سَخَطُكَ لَكَ
الْعُتْبٰى حَتّٰى تَرْضٰى وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِكَ

'হে আমার আল্লাহ্! আমি তোমারই কাছে আমার সব দুর্বলতা এবং আমার মানসম্মানের কমতি এবং লোকের দৃষ্টিতে আমার হেয় প্রতীয়মান হওয়ার অভিযোগ করছি। কিন্তু, তুমি তো দরিদ্র ও দুর্বলদের খোদা। তুমি আমারও খোদা। তুমি আমাকে কার হাতে ছেড়ে দিবে? অপরিচিত যারা তাদের হাতে? যারা আমাকে এদিকে সেদিকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াবে? কিংবা সেই শত্রুদের হতে যারা আমার জন্মভূমিতেও আমার উপরে নির্যাতন চালাবে? যদি আমার প্রতি তোমার কোন ক্রোধ না থাকে, তাহলে আমি ঐ সব শত্রুর কোনও পরওয়া করি না। তোমার দয়া আমার সাথে আছে। তোমার নিরাপত্তা আমার জন্য যথেষ্ট প্রশস্ত। আমি তোমার চেহারার আলোর মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করছি। এটা তোমারই কাজ যে, তুমি দুনিয়া থেকে অন্ধকার দূর করে দাও, এবং সবাইকে এই দুনিয়াতে এবং পরবর্তী দুনিয়াতে শান্তি দান কর। তোমার ক্রোধ এবং তোমার শাস্তি যেন আমার উপরে না পড়ে। তুমি তো অসন্তুষ্ট হও এই জন্য যে, যেন পরক্ষণেই আবার সন্তুষ্ট হতে পার। এবং তোমাকে ছাড়া তো কোন সত্যিকার শক্তি ও সত্যিকার আশ্রয় নেই।' *(ইবনে হিশাম ঃ ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪৭)*

এই প্রার্থনা করার পর তিনি মক্কার দিকে রওয়ানা দিলেন। কিন্তু মাঝ পথে নাখলা নামক স্থানে থামলেন। কয়েকদিন সেখানে কাটাবার পর তিনি পুনরায় মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। কিন্তু আরবের ঐতিহ্য অনুসারে যুদ্ধের কারণে মক্কা ছেড়ে চলে যাওয়ার পর তিনি আর মক্কার নাগরিক ছিলেন না। এখন এটা

মক্কাবাসীদের এখতিয়ার যে, তারা তাঁকে মক্কায় আসতে দিবে কি, দিবে না। এই কারণে তিনি মুতয়েম বিন আদি নামক জনৈক নেতাকে বলে পাঠালেন, 'আমি মক্কায় প্রবেশ করতে চাই, তুমি আরবের প্রথা অনুসারে আমাকে মক্কায় প্রবেশের অনুমতি দিতে রাজি আছ কি না ?' মুতয়েম একজন ঘোর শত্রু ছিল বটে, কিন্তু সে শরীফ লোক ছিল। সে তার ছেলেদেরকে এবং আত্মীয় স্বজনদেরকে সঙ্গে নিল এবং সশস্ত্র অবস্থায় কাবার প্রাঙ্গণে গিয়ে উপস্থিত হলো এবং আঁ হযরত (সাঃ)-এর কাছে এই খবর পাঠিয়ে দিল যে, সে তাঁকে মক্কায় প্রবেশের অনুমতি দিচ্ছে। আঁ হযরত (সাঃ) মক্কায় প্রবেশ করে কাবা তওয়াফ করলেন। এবং মুতয়েম নিজের ছেলেদের ও আত্মীয় স্বজনদেরকে সঙ্গে নিয়ে তরবারি হাতে তাকে তাঁর বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য এলো। কিন্তু, প্রকৃত প্রস্তাবে এটা কোন নিরাপত্তা ছিল না। কেননা, এর পরও বরাবরের মতই মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উপরে জুলুম হতেই থাকলো। এবং এ ব্যাপারে মুতয়েম তাঁর কোন হেফাযতের ব্যবস্থা করতে পারলো না। বরং এটা ছিল স্রেফ মক্কায় প্রবেশের একটা আইনগত অনুমতি মাত্র।

আঁ হযরত (সাঃ)-এর তায়েফ সফর সম্পর্কে শত্রুদেরকে একথা স্বীকার করতে হয়েছে যে, এই সফরে তিনি অতুলনীয় আত্মত্যাগ ও দৃঢ়তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। স্যার উইলিয়াম মুইর তার 'লাইফ অব মুহাম্মদ' নামক পুস্তকে লিখেছেনঃ

There is something lofty and heroic in this journey of Muhammad to At-Taif; a solitary man, despised and rejected by his own people, going boldly forth in the name of god, like Jonah to Nineveh, and summoning an idolatrous city to repent and support his mission. It sheds a strong light on the intensity of his belief in the divine origin of his calling .....

(Life of Muhammad by Sir W. Muir. 1923 edition, pp 112-113).

'মুহম্মদের তায়েফ ভ্রমণের মধ্যে এক উন্নত মহিমা ও সাহসিকতা বিদ্যমান। একজন একা মানুষ, যিনি নিজের জাতির লোকজনের দ্বারা অত্যাচারিত ও প্রত্যাখ্যাত, তিনি আল্লাহ্‌র নামে নির্ভয়ে নিনেভার ইউনুসের মত একটি পৌত্তলিক শহরকে আহ্বান জানাচ্ছেন অনুতপ্ত হওয়ার জন্যে এবং তাঁর মিশনকে সমর্থন করার জন্য। এই ঘটনা তাঁর আহ্বানের ঐশী উৎসের প্রতি তাঁর যে গভীর বিশ্বাস তা উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত করে তুলছে।'

মক্কা আবারও তার ঠাট্টা-বিদ্রূপের এবং শত্রুতার দুয়ার খুলে দিল। আবারও খোদার নবীর জন্য তাঁর জন্মভূমি জাহান্নামে পরিণত হলো। কিন্তু, তা সত্ত্বেও

মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সাহসিকতার সহিত মানুষের কাছে খোদাতায়ালার বাণী পৌঁছাতেই থাকলেন। মক্কার পথে পথে, মক্কার অলিতে গলিতে 'আল্লাহ্ এক,' 'আল্লাহ এক' আওয়াজ উচ্চতর হতে লাগলো। মহব্বতের সঙ্গে, শ্রদ্ধার সঙ্গে, সহমর্মিতার সঙ্গে তিনি মক্কার অধিবাসীদের কাছে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে প্রচার চালাতেই থাকলেন। লোকেরা দূরে সরে যেত, তিনি তাদের পিছনে পিছনে যেতেন। লোকেরা মুখ ফেরায়ে নিত, তিনি তাঁর কথা বলতেই থাকতেন। সত্য ধীরে ধীরে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। সেই যে কিছু সংখ্যক মুসলমান যারা আবিসিনিয়া থেকে ফিরে এসে মক্কাতেই অবস্থান করছিলেন, তারা ভিতরে ভিতরে তাঁদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সঙ্গী-সাথী ও পাড়া-পড়শীদের কাছে তবলীগ করে যাচ্ছিলেন। অনেকেরই হৃদয় ঈমানের আলোকে আলোকিত হচ্ছিল, তাদের মধ্যে অনেকেই প্রকাশ্যে তাদের ঈমানের কথা ঘোষণা করছিল এবং নিজেদের সঙ্গীদের সাথে মার খাচ্ছিল এবং তাদের দুঃখে-কষ্টে অংশীদার হচ্ছিল। তবে এমনও অনেকেই ছিল যারা আলো তো দেখছিল বটে, কিন্তু সে আলো কবুল করার মত সৌভাগ্য তাদের হচ্ছিল না। তারা সেই দিনের প্রতীক্ষায় ছিল যেদিন পৃথিবীর বুকে খোদার রাজত্ব কায়েম হবে এবং তাতে তারা প্রবেশ করবে।

মদীনাবাসীদের ইসলাম গ্রহণ

এই সময়টাতে রসূলে করীম (সাঃ)-কে খোদাতায়ালার তরফ থেকে বারবার এই খবর দেওয়া হচ্ছিল যে, তাঁর হিজরতের সময় এসে গেছে। এবং এটাও দেখানো হলো যে, তাঁর হিজরতের স্থান হবে এমন একটি শহর যেখানে বহু পানির কূয়া আছে, খেজুরের বাগান আছে। * প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন যে, তাঁর হিজরতের এই স্থানটি হবে ইয়ামামা। কিন্তু শীঘ্রই তাঁর মন থেকে এই ধারণা দূর করে দেওয়া হলো। তিনি এই প্রতীক্ষায় থাকলেন যে, খোদাতায়ালার শুভ সংবাদ অনুযায়ী যে শহরই হোক না কেন তাকে তিনি ইসলামের সুতিকাগারে পরিণত করবেন। এই সময়ে হজ্জের মৌসুম এসে গেছে। আরবের চতুর্দিক থেকে লোকেরা হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় সমবেত হতে লাগলো। মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর অভ্যাস অনুযায়ী যেখানেই লোকজনকে একত্রে জমায়েত দেখতে পেলেন সেখানেই গিয়ে তাদের মধ্যে তৌহিদের বাণী প্রচার করতে লাগলেন। এবং খোদাতায়ালার রাজত্বের শুভসংবাদ দান করতে থাকলেন। এবং জুলুম,

* *বুখারী ঃ বাবু হিজরাতুন্নাবী (সাঃ)*

বদকাজ, কলহ ও দুষ্কৃতি ইত্যাদি পরিহার করার জন্য উপদেশ দিতে লাগলেন। অনেকে তাঁর কথা শুনতো এবং বিস্ময় প্রকাশ করে চলে যেত। অনেকে তাঁর কথা আগ্রহ সহকারে শুনতে চাইতো, কিন্তু মক্কাবাসীরা তাদেরকে সেখান থেকে হটিয়ে দিত। অনেকে আবার যারা আগে থেকেই মক্কাবাসীদের কাছ থেকে তাঁর সম্পর্কে জানতে পেড়েছিল, তারা হাসি-ঠাট্টা করে দূরে সরে যেত। এই অবস্থায় এক দিন তিনি যখন মীনা উপত্যাকায় পায়চারী করছিলেন, তখন মদীনার ছয় সাতজন লোকের প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়লো। তিনি তাদেরকে বললেন, 'তোমরা কোন্ কবিলার লোক ?' তারা বললো, 'খাজরাজ কবিলার।' 'সেই কবিলা, যারা ইহুদীদের মিত্র', তারা বললো, 'হাঁ'। তিনি বললেন, 'আপনারা কি কিছুক্ষণ বসে আমার কথা শুনবেন ?' লোকগুলি যেহেতু ইতোপূর্বেই তাঁর (সাঃ) সম্পর্কে জানতে পেরেছিল এবং তাঁর দাবী সম্পর্কে তাদের মনে মনে জানার ইচ্ছাও ছিল সেহেতু তারা রাজি হয়ে গেল। এবং তাঁর সাথে বসে তাঁর কথাবার্তা শুনতে লাগলো। তিনি (সাঃ) তাদেরকে বললেন, 'খোদাতায়ালার রাজত্ব আসন্ন প্রায়। এখন পৌত্তলিকতা পৃথিবী থেকে দূরীভূত হবে। এবং খোদার একত্ব পৃথিবীতে কায়েম হবে। পুণ্যকাজ ও ধর্মপরায়ণতা পুনরায় একবার পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। মদীনার লোকেরা কি সেই অতি মহান কেরামত গ্রহণ করতে রাজি হবে ?' তারা তাঁর কথা শুনলো এবং প্রভাবিত হয়ে পড়লো। এবং বললো, 'আপনার শিক্ষা তো আমরা গ্রহণ করছি'। বাকী থাকলো এই যে, মদীনা ইসলামকে আশ্রয় দিতে রাজি হবে কি না। এ ব্যাপারে আমরা দেশে ফিরে গিয়ে আমাদের গোত্রের লোকজনদের সঙ্গে আপনার বিষয়ে আলোচনা করবো। আগামী বারে আপনাকে আমরা আমাদের সিদ্ধান্তের কথা জানাব।* এই লোকেরা ফিরে গেল। এবং তারা তাদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের কাছে আঁ হযরত (সাঃ)-এর শিক্ষার কথা বলাবলি করতে থাকলো। সে সময়ে মদীনাতে দু'টি আরব গোত্র-'আওস' ও 'খাজরাজ'-বসবাস করতো। এবং ইহুদীদের গোত্র ছিল তিনটি -'বনু কোরায়যা,' 'বনু নাযির' এবং 'বনু কায়নোকাআ'।

আওস ও খাজরাজ গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ চলছিল। আওস গোত্রের পক্ষে ছিল বনু কোরায়জা ও বনু নাযির গোত্র দু'টি। এবং খাজারাজ গোত্রের পক্ষে ছিল বনু কায়নোকাআ। বহুদিন যাবৎ কলহ-লড়াইয়ের পর ওদের মনে এই চিন্তার উদয় হয়েছিল যে, তাদের পরস্পরের মধ্যে মীমাংসা হওয়া উচিৎ। অবশেষে, পরামর্শের পর তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, খাজরাজ নেতা আব্দুল্লাহ

---

*ইবনে হিশাম ঃ প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫৫-১৫৬

বিন আবু বিন সলুলকে সমগ্র মদীনার রাজা হিসেবে মেনে নেওয়া হবে। ইহুদীদের সঙ্গে মেলামেশা থাকার কারণে আওস ও খাজরাজ গোত্রের লোকেরা বাইবেলের বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে ওয়াকেবহাল ছিল। ইহুদীরা যখন তাদের দুঃখ কষ্ট ও বিপদ-আপদের কথা বর্ণনা করতো, তখন শেষে তারা একথাও বলতো যে, একজন নবী যিনি মূসা (আঃ)-এর সদৃশ (মেসাল) হবেন, তাঁর আবির্ভাবের সময় আসন্ন। তাঁর সময় এসে গেছে। তিনি যখন আসবেন, তখন আমরা পুনরায় একবার দুনিয়ার বুকে বিজয়ী হব। ইহুদী জাতির দুশমনদেরকে ধ্বংস করে দিব।

উল্লিখিত হাজীদের কাছে যখন মদীনাবাসীর মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দাবীর কথা শুনলো তখন তাদের মনে তাঁর (সাঃ) সত্যতা প্রভাব বিস্তার করলো। তারা বলতে থাকলো, 'এতো মনে হচ্ছে সেই নবী, যার খবর ইহুদীরা আমাদেরকে দিত।' কাজেই বহুসংখ্যক যুবক মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর শিক্ষার সত্যতায় প্রভাবিত হয়ে পড়লো এবং ইহুদীদের কাছ থেকে শোনা ভবিষ্যদ্বাণীগুলি তাদের ঈমান আনার পক্ষে সাহায্য করলো। পরের বছর হজ্জের মৌসুমে মদীনা থেকে আবার লোকজন মক্কায় এলো। এবারে বারজন লোক মদীনা থেকে এই এরাদা নিয়ে এলো যে, তারা মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ধর্ম গ্রহণ করবে। তাদের মধ্যে দশজন ছিল খাজরাজ কবিলার এবং বাকী দু'জন আওস কবিলার। তাঁরা আঁ হযরত (সাঃ)-এর সঙ্গে দেখা করলো মীনায়। এবং তারা আঁ হযরত (সাঃ)-এর হাতে হাত রেখে এই শপথ নিল যে, তারা এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো উপাসনা করবে না। তারা চুরি করবে না। বদকাজ করবে না। তারা নিজেদের মেয়েদেরকে হত্যা করবে না। এক অপরের উপরে মিথ্যা অপবাদ দিবে না। তারা খোদার নবীর কোন নেক আদেশ অমান্য করবে না। অতঃপর তারা দেশে ফিরে গেল। এবং তারা নিজেদের গোত্রের মধ্যে আরো জোরে শোরে তাবলীগ শুরু করে দিল।*

মদীনার গৃহগুলি থেকে মুর্তিগুলো বাইরে নিক্ষিপ্ত হতে লাগলো। মূর্তির সামনে মাথা নত করা লোকেরা এখন মাথা উঁচু করে চলতে লাগলো। ঐ মাথাগুলো এখন আর খোদা ছাড়া আর কারো সামনে নত হতে প্রস্তুত নয়। ইহুদীরা অবাক হয়ে দেখতে থাকলো যে, শত শত বৎসরের বন্ধুত্বে এবং শত শত বৎসরের তাবলীগে যে পরিবর্তন তারা আনতে পারেনি ইসলাম কয়েক দিনের মধ্যেই সেই পরিবর্তন এনে দিয়েছে। তৌহীদের বাণী মদীনাবাসীর হৃদয়ে হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করে চললো। এক দুই করে লোকেরা আসতো এবং

---

* *(ইবনে হিশাম ঃ ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৫৫-১৫৬)*

মুসলমানদের কাছে তাদের ধর্ম শিখতে চাইতো। কিন্তু মদীনার নও মুসলিমরা তো নিজেরাই ইসলামের শিক্ষা পুরোপুরি জানতো না। তাদের সংখ্যাও এমন বেশী ছিল না যে, তারা শত শত, হাজার হাজার লোকের কাছে ইসলামের বিস্তারিত বিবরণ দেয়। এজন্য তারা মক্কার একজন লোক মারফৎ তাবলীগের জন্য লোক চেয়ে দরখাস্ত পাঠিয়ে দিল। রসূলে করীম (সাঃ) মুসায়েব (রাঃ) নামক একজন সাহাবীকে যিনি আবিসিনিয়ার হিজরত থেকে ফিরে এসেছিলেন, তাঁকে তাবলীগের জন্য মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন। হযরত মুসায়েব (রাঃ) মক্কার বাইরে ইসলামের প্রথম মুবাল্লিগ বা ধর্মপ্রচারক ।

ইস্‌রা (কাশ্‌ফী ভ্রমণ)

এই সময়কালে, খোদাতায়ালা মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে আগামী দিনের জন্য এক শক্তিশালী শুভ সংবাদ দান করেন। তাঁকে এক কাশ্‌ফে (দিব্যদৃষ্টিতে) দেখানো হলো যে, তিনি জেরুজালেম গিয়েছেন এবং সকল নবীরা তাঁর ইমামতীতে নামায পড়ছেন।* এখানে জেরুজালেমের তাবির (অর্থ) হচ্ছে মদীনা, যা আগামীতে এক আল্লাহ্‌র এবাদতের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হবে। তাঁর পিছনে নবীগণের নামায পড়ার তাবির হচ্ছে বিভিন্ন ধর্মের লোকেরা তাঁর ধর্মে প্রবেশ করবে এবং তাঁর ধর্ম বিশ্ব-ধর্মরূপে প্রতিষ্ঠিত হবে। এই সময়টা ছিল মক্কার মুসলমানদের জন্য এক কঠিন সময়। তখন তাঁদের দুঃখ কষ্ট চরমে পৌঁছে গিয়েছিল। কাজেই ঐ কাশ্‌ফের কথা শুনে মক্কাবাসীরা নতুন করে একটা হাসি-বিদ্রূপের বিষয় পেয়ে গেল। এবং তারা তাদের প্রতিটি মজলিসেই ঐ কাশ্‌ফ নিয়ে হাসি-ঠাট্টা শুরু কর দিল। কিন্তু কে জানতো যে, নতুন জেরুজালেমের নির্মাণ তখন শুরু হয়ে গেছে এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের জাতিগুলো কান খাড়া করে খোদাতায়ালার সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর আওয়াজ শোনার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে।

রোমানদের বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী

এই সময় (রোমান সম্রাট) কায়সার এবং (পারস্য সম্রাট) কিসরার মধ্যে এক ভয়ংকর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এতে কিসরা বিজয় লাভ করে। শাম (সিরিয়া) ইরানী সেনাবাহিনীর দখলে আসে। জেরুজালেম ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। এমনকি ইরানী সেনাবাহিনী মিসর ও এশিয়া মাইনর পদানত করে। তারা

---

* *ইবনে হিশাম ঃ ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৩৮ ও ফুরকানী ঃ ১ম, খন্ড পৃষ্ঠা ৩০৬)*

বসফরাসের মোহনায় পৌঁছে যায় এবং ইরানী জেনারেলরা কনস্টান্টিনোপলের দশ মাইলের মধ্যে সেনাশিবির স্থাপন করে। ইরানীদের এই বিজয়ে মক্কাবাসীরা উল্লসিত হয়ে উঠলো। তারা বলতে লাগলো যে, খোদার ডিক্রী কার্যকরী হয়েছে, মূর্তি-পূজক ইরানীরা আহলে কেতাব খৃষ্টানদেরকে পরাজিত করেছে। কিন্তু ইতোমধ্যে খোদাতায়লার পক্ষ থেকে রসুলে করীম (সাঃ)-কে সংবাদ দেওয়া হলোঃ

غُلِبَتِ الرُّوْمُ ۝١ فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ۝٣ فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ ۭ لِلّٰهِ
الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْۢ بَعْدُ ۭ وَيَوْمَىِٕذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝٥ بِنَصْرِ اللّٰهِ ۭ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَهُوَ
الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝٦ وَعْدَ اللّٰهِ ۭ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝٧

(রোমানরা পরাজিত হয়েছে-নিকটবর্তী দেশে, এবং তারা তাদের পরাজয়ের পর অচিরেই বিজয়ী হবে, মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে, সকল আধিপত্য আগে এবং পরে, আল্লাহ্‌রই-এবং সেইদিন মোমেনরা অত্যন্ত আনন্দিত হবে, আল্লাহ্‌র সাহায্যে, তিনি যাকে চান সাহায্য করেন; এবং তিনি মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়াময়। এ হচ্ছে আল্লাহ্‌র ওয়াদা। আল্লাহ্ তাঁর ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। কিন্তু, অধিকাংশ লোকে বুঝে না।) - *(সূরা রূম ঃ আয়াত ৩-৭)।*

অর্থাৎ, রোমান সেনাবাহিনী আরবের নিকটবর্তী রাজ্যগুলোতে পরাজিত হয়েছে বটে, কিন্তু নিজেদের পরাজয়ের পর তারা পুনরায় বৎসর কয়েকের মধ্যেই বিজয় লাভ করবে। খোদাতায়ালার ইচ্ছাই দুনিয়াতে আদিকাল থেকেই কার্যকর থাকবে। যখন সেই বিজয় সংঘটিত হবে, তখন মুমিনরাও খোদার সাহায্যে আনন্দ লাভ করবে। খোদা যাকে মনোনীত করেন, তাকে সাহায্যও করেন। তিনি অতি পরাক্রমশালী এবং পরম দয়াময়। এটা সেই খোদার অঙ্গীকার, যিনি তার অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না। তবে, অধিকাংশ লোকই খোদার কুদরত সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না।

কয়েক বৎসর পরেই খোদাতায়ালা এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করেন। একদিকে রোমানরা ইরানীদেরকে পরাজিত করে নিজেরদের দেশের স্বাধীনতা উদ্ধার করে, অপরদিকে -যেমন বলা হয়েছিল -ঐ সময়ের মধ্যেই মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় সূচিত হয়। যখন মক্কার লোকেরা এটা ধরে নিয়েছিল যে, তারা লোকদেরকে মুসলমানদের কথা শোনা থেকে দূরে রাখতে পেরেছে এবং মুসলমানদের উপরে জুলুম, অত্যাচার বৃদ্ধি করে দিয়ে ইসলামকে শেষ করে দিয়েছে, তখন খোদার বাণী বার বার ইসলামের বিজয়ের সংবাদ দিয়ে যাচ্ছিল। এবং বলে দিল যে, মক্কাওয়ালাদের ধ্বংস নিকট থেকে নিকটতর হচ্ছে। এমনকি

ঐ সময়টাতেই মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সাঃ) খুব জোরেশোরে খোদাতায়ালার এই বাণীও ঘোষণা করে দিলেন ঃ

وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ ۚ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ﴿١٣٣﴾
وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن
قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ ﴿١٣٤﴾ قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ
السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ ﴿١٣٥﴾

(এবং তারা বলে, 'কেন সে তার প্রভুর পক্ষ থেকে আমাদের নিকট কোন নিদর্শন আনে না ?' তাদের নিকট কি ঐরূপ নিদর্শন আসেনি যেরূপ বর্ণিত হয়েছে পূর্ববর্তী কেতাবসমূহে ?

এবং যদি আমরা তার (এই রসূলের আগমনের) পুর্বেই তাদেরকে আযাব দিয়ে ধ্বংস করে দিতাম, তাহলে নিশ্চয় তারা বলতো, 'হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের নিকট কেন রসূল পাঠিয়ে দাও নি, যাতে আমরা অপদস্ত ও অপমানিত হওয়ার পূর্বেই তোমার নিদর্শনসমূহের অনুসরণ করতে পারতাম ?

তুমি বলো, প্রত্যেক ব্যক্তি (তার নিজের পরিণামের) অপেক্ষা করছে, অতএব, তোমরা ও (নিজেদের পরিণামের) অপেক্ষা করতে থাক, এবং অচিরেই তোমরা জানতে পারবে যে, কারা সরল-সুদৃঢ় পথের অনুসরণকারী এবং কারা হেদায়াত প্রাপ্ত। *(সূরা ত্বা হা ঃ আয়াত ১৩৪-১৩৬)।*

অর্থাৎ, মক্কাবাসীরা বলে যে, মুহাম্মদ কেন তাঁর প্রভুর কাছ থেকে আমাদের জন্য কোন নিদর্শন দেখায় না ? কিন্তু, কেন, পূর্বের নবীদের ভবিষ্যদ্বাণীগুলো কি তাদের জন্য নিদর্শন হিসেবে যথেষ্ট নয় ? আমরা যদি তবলীগ পূর্ণ করার পূর্বেই মক্কাবাসীদেরকে ধ্বংস করে দিতাম, তাহলে মক্কাবাসীরা বলতে পারতো, 'হে আমাদের প্রভু! কেন তুমি আমাদের কাছে কোন রসূল পাঠালে না ? যাতে আমরা লাঞ্ছিত ও পর্যুদস্ত হওয়ার আগেই তোমার শিক্ষা অনুসরণ করতে পারতাম ? তুমি বলে দাও যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের সময়ের প্রতীক্ষা করতে হয়। কাজেই তোমরাও সেই সময়ের প্রতীক্ষায় থাকো যখন নিদর্শন পূর্ণরূপে প্রকাশিত হবে। তখন তোমরা নিশ্চয় জানতে পারবে যে, কে খোদার কথা মত সোজা রাস্তায় চলছে ?

প্রত্যেক দিন খোদাতায়ালার নতুন নতুন ওহী অবতীর্ণ হচ্ছিল। এবং এতে প্রত্যেক দিনই ইসলামের উন্নতি ও কাফেরদের ধ্বংসের খবর দেওয়া হচ্ছিল। মক্কাবাসীরা একদিকে দেখছিল তাদের শক্তি ও প্রতিপত্তি, অপরদিকে দেখছিল মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও তাঁর সঙ্গীদের দুর্বলতা। তবে, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রাপ্ত ওহীর মধ্যে খোদাতায়ালার সাহায্য এবং মুসলমানদের সাফল্যের কথা বলা হচ্ছিল। এতে তারা তাজ্জব হয়ে ভাবতো যে, তারা কি নিজেরাই পাগল হয়ে গেছে, নাকি মুহাম্মদ (রসূলুল্লাহ সাঃ) পাগল হয়েছে ? মক্কাবাসীরা এই প্রত্যাশাই করছিল যে, তাদের জুলুম-অত্যাচার ও তাদের জনবলের কারণে মুসলমানরা হতাশ হয়ে পড়বে এবং তাদের শরণাপন্ন হতে বাধ্য হবে। এবং মুহাম্মদ (রসূলুল্লাহ-সাঃ) নিজে এবং তাঁর সঙ্গীরা তাঁর দাবী সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়বে। অথচ, তখন মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এই ঘোষণা করেছিলেন ঃ

فَلَآ أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ﴿٣٨﴾ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ﴿٣٩﴾ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿٤٠﴾
وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾
تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٣﴾ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ﴿٤٤﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ
بِالْيَمِينِ ﴿٤٥﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿٤٦﴾ فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴿٤٧﴾
وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٨﴾ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٥٠﴾
وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ﴿٥١﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٥٢﴾

(আমি অবশ্যই তার কসম খাচ্ছি যা তোমার দেখছো, এবং তারও যা তোমরা দেখছো না। নিশ্চয় ইহা (কোরআন) এক সম্মানিত রসূলের (দ্বারা আনিত) কালাম, এবং এ কোনো কবির কাব্য নয়। কিন্তু (পরিতাপ যে) তোমরা অল্পই ঈমান আন। এবং এ কোন গণকেরও কথা নয়, কিন্তু তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর। ইহা জগতসমূহের প্রভু প্রতিপালকের নিকট থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে। এবং সে যদি কোন কথা মিথ্যা রচনা করে আমাদের প্রতি আরোপ করতো, তাহলে নিশ্চয় আমরা তাকে ডান হাতে ধৃত করতাম, অতঃপর তার জীবন-শিরা কেটে দিতাম, তখন তোমাদের মধ্য থেকে কেউই তা (আমার আযাব) থেকে তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারতো না। এবং নিশ্চয় ইহা (কোরআন) মুত্তাকীদের জন্য সম্মানসূচক উপদেশবাণী। আমরা অবশ্যই জানি যে, তোমাদের মধ্যে অনেক (আমাদের নিদর্শনাবলীকে) প্রত্যাখ্যানকারী আছে। এবং নিশ্চয়

কাফেরদের জন্য ইহা আক্ষেপের কারণ এবং নিশ্চয় ইহা বাস্তব-ভিত্তিক বিশ্বাস। সুতরাং তুমি তোমার মহিমান্বিত প্রতিপালকের নামের তসবীহ্ কর)।

(সূরা আল্ হাক্কা আয়াত ৩৯-৫৩)।

অর্থাৎ, হে মক্কাবাসীরা! তোমরা যে ধারণার মধ্যে পড়ে আছে তা ঠিক নয়। আমি কসম খেয়ে বলছি সেই সমস্ত জিনিষের যা তোমাদের দৃষ্টির সামনে আছে এবং সেই সমস্ত জিনিসেরও যা তোমাদের দৃষ্টির অগোচরে আছে-এই কোরআন যা এক সম্মানিত রসূলের জবানে তোমাদেরকে শোনানো হচ্ছে, তা কোন কবির কথা নয়, কিন্তু তোমাদের প্রাণে ঈমানের প্রতি আকর্ষণ সামান্যই। এ কোন কাহিনীর কথা নয়, কিন্তু আফসোস! তোমরা উপদেশ মানতে চাও না। এতো সকল সৃষ্টির স্রষ্টার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে। এবং আমি সকল সৃষ্টির প্রভু ও পালনকর্তা তোমাদেরকে বলছি যে, সে যদি একটি আয়াতও মিথ্যা বানিয়ে আমাদের প্রতি আরোপ করতো, তাহলে আমরা তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং তার জীবন শিরা কেটে দিতাম। এবং যদি তোমরা সকলে মিলে তাকে বাঁচাতে চাইতে, তাহলেও তাকে বাঁচাতে পারতে না। কিন্তু এই কোরআন তো খোদাভীরু ব্যক্তিদের জন্য এক উপদেশ। এবং আমরা জানি যে, এই কোরআনকে মিথ্যা বলার লোকও তোমাদের মধ্যে মওজুদ আছে। কিন্তু আমরা এও জানি যে, এর শিক্ষা এর অস্বীকারকারীদের হৃদয়ে জ্বালা সৃষ্টি করছে। এবং তারা বলছে যে, আহা! এই শিক্ষা যদি আমাদের কাছে থাকতো। আমরা এও জানি যে, যে সকল কথা এই কোরআনে বলা হয়েছে, তা অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হতে থাকবে। অতএব, হে মুহাম্মদ (সাঃ)! ঐ সকল লোকের বিরোধিতার পরওয়া করিও না। এবং তুমি তোমার মহান প্রভুর নামের মহিমা কীর্তন কর।

দেখতে দেখতে তৃতীয় হজ্জ এসে গেলো। এবং মদীনার হাজীদের কাফেলা বেশ কিছু সংখ্যক মুসলমানসহ মদীনায় এসে পৌছল। মক্কাবাসীদের বিরোধিতার কারণে মদীনার লোকেরা মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে আলাদাভাবে সাক্ষাৎ করার জন্য মনস্থির করলো। এদিকে মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মনে এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে, হিজরত হয়তো মদীনাতেই করতে হবে। তিনি তাঁর এই চিন্তার কথা তাঁর ঘনিষ্ট আত্মীয়-স্বজনের কাছে প্রকাশও করছিলেন। তাঁরা তাঁকে (সাঃ) বুঝাতে থাকলেন যে, আপনি এটা করবেন না। মক্কাবাসী দুশমনরাও ভাল। কেননা, আর যাই হোক, তাদের মধ্যে অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তি আপনার আত্মীয়-স্বজন। কে জানে, মদীনায় গেলে কি হবে! সেখানে গেলে কি আপনার আত্মীয়-স্বজনরা আপনাকে সাহায্য করতে পারবে ? কিন্তু যেহেতু তিনি ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন যে, খোদায়ী ফায়সালা এটাই, সেহেতু তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের কথা মানলেন না, এবং মদীনাতে যাওয়াই স্থির করলেন।

আকাবার প্রথম বা'য়াত

মধ্যরাতের পর পুনরায় একবার আকাবা উপত্যকায় মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং মদীনার মুসলমানরা একত্রিত হলো। এ সময় তাঁর সাথে ছিলেন তাঁর চাচা আব্বাস (রাঃ)। এবারে মদীনার মুসলমানদের সংখ্যা ছিল তিয়াত্তর।* এঁদের মধ্যে বাষট্টি জন ছিলেন খাজরাজ গোত্রের এবং এগারো জন আওস গোত্রের। এঁদের মধ্যে দুজন মহিলাও ছিলেন। যাঁদের একজন ছিলেন বনু নাজ্জার কবিলার উম্মে আম্মারা (রাঃ)। যেহেতু মুসায়েব (রাঃ) কর্তৃক তাঁরা ইসলামের শিক্ষা প্রশিক্ষণ লাভ করেছিলেন, সেহেতু তাঁরা প্রত্যেকে ছিলেন ঈমান ও একীনে, বিশ্বাসে ও দৃঢ়তায় ভরপুর। পরবর্তী ঘটনাবলী দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে যে, এই সমস্ত মানুষ আগামীতে ইসলামের স্তম্ভরূপে পরিগণিত হবেন। উম্মে আম্মারা যিনি ঐ সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তিনি তাঁর সন্তানদের হৃদয়ে ইসলামের ভালবাসা এমনভাবে গেঁথে দিয়েছিলেন যে, যখন তাঁর ছেলে হাবীব (রাঃ) হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মৃত্যুর পরে মুসায়লামা কায্যাবের সৈন্যদের হাতে ধরা পড়লেন, তখন মুসায়লামা তাঁকে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করলো, -'তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রসূল ?' উত্তরে হাবীব্ বললেন, 'হাঁ'। মুসায়লামা তাঁকে আবার জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কি এই সাক্ষ্যও দাও যে, আমি আল্লাহ্‌র রসূল ?' হাবীব্ জওয়াব দিলেন, 'না'। মুসায়লামা হুকুম দিল, 'ওর একটা অঙ্গ কেটে দাও'। এবং অঙ্গ কাটা হলো। মুসায়লামা আবার জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রসুল ?' হাবীব আবারও উত্তর দিলেন, 'হাঁ'। মুসায়লামা জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কি এই সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহ্‌র রসূল ?' হাবীব্ উত্তর দিলেন, 'না'। তখন সে তাঁর (রাঃ) আর একটি অঙ্গ কেটে ফেলার হুকুম দিলো। মুসায়লামা তাঁর (রাঃ) একটা করে অঙ্গ কাটতো এবং জিজ্ঞেস করতো, 'আমি কি আল্লাহ্‌র রসূল ?' হাবীব্ উত্তর দিতেন, 'না'। এইভাবে তাঁর সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একটার পর একটা কেটে ফেলা হলো, এবং এইভাবে টুকরো টুকরো হয়ে তিনি নিজের ঈমানের ঘোষণা দিতে দিতে অবশেষে তাঁর খোদার সাথে গিয়ে মিলিত হলেন। স্বয়ং উম্মে আম্মারা (রাঃ) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সঙ্গে বহু যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

মোদ্দা কথা, ঐ কাফেলা ছিল একটি নিষ্ঠাবান খাঁটি ঈমানদারের কাফেলা। ঐ কাফেলার লোকেরা মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিকটে ধনসম্পদ চাইতে

---

* *ইবনে হিশাম ঃ প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৫৪*

আসেননি, এসেছিলেন স্রেফ ঈমান চাইতে। আব্বাস (রাঃ) তাঁদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

'হে খাজরাজ কবিলার লোকেরা! আমার এই প্রিয়জন তাঁর নিজের বংশের কাছে একজন সম্মানিত ব্যক্তি। তাঁর বংশের লোকেরা, তারা মুসলমান হোক বা না হোক, তাঁর হেফাযত করে থাকে। কিন্তু এখন তিনি স্থির করেছেন যে, তিনি তোমাদের কাছে চলে যাবেন। হে খাজরাজের লোকেরা! তিনি যদি তোমাদের কাছেই যান, তাহলে সমগ্র আরব তোমাদের বিরুদ্ধে চলে যাবে। যদি তোমরা তোমাদের দায়িত্ব বা জিম্মাদারী বুঝে থাক এবং এই বিপদ উপলব্ধি করে থাক যে, তোমরা তাঁর ধর্মের হেফাযতের দায়িত্ব গ্রহণ করেই তাঁকে নিয়ে যাচ্ছ, তাহলে আনন্দের সঙ্গে নিয়ে যাও, অন্যথায় এই এরাদা ছেড়ে দাও।'

এই কাফেলার সর্দার ছিলেন আলবারাআ। তিনি বললেন, 'আমরা আপনার কথা শুনেছি। আমরা আমাদের এরাদায় অটল। আমাদের জীবন খোদার নবীর পদতলে উৎসর্গীত। এখন ফায়সালা করার এখতিয়ার তাঁরই। আমরা তাঁর প্রত্যেকটি ফায়সালা মানতে প্রস্তুত।'

অতঃপর রসূলে করীম (সাঃ) তাঁদেরকে ইসলামের শিক্ষা বুঝায়ে দিতে লাগলেন। এবং খোদাতায়ালার তওহীদ প্রতিষ্ঠার উপরে বক্তৃতা করলেন। এবং তাঁদেরকে বললেন যে, যদি তাঁরা ইসলামের হেফাযত সেইভাবে করার অঙ্গীকার করেন যেভাবে তাঁরা তাঁদের বিবি বাচ্চাদের হেফাযত করে থাকেন, তাহলে তাঁরা তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন।

তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই মদীনার সেই তিয়াত্তর জন জীবন উৎসর্গকারী একইসঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলেন, 'নিশ্চয়ই' 'নিশ্চয়ই'। ঐ সময় উত্তেজনার বশে মক্কাবাসীদের দুষ্কৃতির কথা তাঁদের খেয়াল ছিল না যে, তারা তাঁদের আওয়াজ শুনতে পারে। ফলে তাদের ঐ উচ্চকণ্ঠের ধ্বনি দূরের প্রান্তরে প্রতিধ্বনিত হয়ে গেল। আব্বাস (রাঃ) তাঁদেরকে সাবধান করে দিলেন এবং বললেন,

'খামোশ! খামোশ! নইলে মক্কার লোকেরা সব জেনে ফেলবে। কিন্তু, এখন যে তারা ঈমান লাভ করেছে, এখন তো মৃত্যু তাদের কাছে কিছুই নয়। আব্বাসের ঐ কথা শুনেও তাঁদের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বললেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমরা ভয় পাইনা। আপনি হুকুম করুন, আমরা এখনই মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, যে জুলুম তারা আপনার উপরে করেছে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করি।'

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ

'খোদাতায়ালা এখনও আমাকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার হুকুম দেন নি।'

এরপর মদীনায় লোকেরা তাঁর (সাঃ) হাতে বা'য়াত করলেন। এবং সভার কাজ শেষ হলো।

মক্কাবাসীরা এই ঘটনার কথা কিছুটা জানতে পারলো। কাজেই তারা সেখানে মদীনার লোকদের কাছে তাদের অভিযোগ নিয়ে উপস্থিত হলো। কিন্তু যেহেতু, আব্দুল্লাহ্ বিন্ উবায় বিন সলুল, মদীনার ঐ গোটা কাফেলার নেতা, ঐ ঘটনা সম্বন্ধে কিছুই জানতো না, সেহেতু সে তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, 'তারা কোন মিথ্যা গুজব শুনে থাকবে, এ ধরনের কোন ঘটনা এখানে ঘটেনি। কেননা, মদীনার লোকেরা আমার পরামর্শ ছাড়া কোন কাজ করতে পারে না'। কিন্তু, সে কি তখন জানতো যে, মদীনার লোকদের হৃদয়ে এখন শয়তানের জায়গায় খোদাতায়ালার রাজত্ব কায়েম হয়ে গেছে! অতঃপর মদীনার সেই কাফেলা ফিরতি পথে রওয়ানা হয়ে গেল।

মদীনায় হিজরত

এবারে হযরত রসূলে করীম (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীরা (রাঃ) হিজরতের জন্য তৈরী হতে লাগলেন। মক্কার পরিবারগুলো একের পর এক গায়েব হতে থাকলো। এই সমস্ত লোকেরা যারা খোদাতায়ালার রাজত্বের প্রতীক্ষা করছিল তারাও তেজোদ্দীপ্ত হয়ে উঠছিল। কখনও কখনও একই রাতে মক্কার এক একটি গলির সবগুলো বাড়ীর দরজায় তালা লেগে যেত। এবং সকাল বেলা যখন শহরের লোকেরা সেই গলিকে নিস্তব্ধ পেতো, তখন খোঁজ নিয়ে দেখতো যে, সেই গলির সমস্ত লোক হিজরত করে মদীনায় চলে গেছে। এবং ইসলামের এই গভীর প্রভাব যা ভিতরে ভিতরে মক্কার লোকদের উপরে বিস্তার লাভ করেছিল তা দেখে তারা আশ্চর্য হয়ে যেতো। অবশেষে, মক্কায় আর কোন মুসলমান থাকলো না, মাত্র জনাকয়েক ক্রীতদাস, স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ), হযরত আবুবকর (রাঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ) ছাড়া।

যখন মক্কার লোকেরা দেখলো যে, শিকার সব হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে তখন নেতারা একত্রিত হয়ে আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে, এখন মুহাম্মদকে হত্যা করাই কর্তব্য। এবং যেন খোদাতায়ালার এক বিশেষ পরিকল্পনার অধীনেই দুশমনরা তাঁর হিজরতের দিনকেই নির্ধারিত করলো তাঁর

হত্যার তারিখ। যখন মক্কার লোকেরা তাঁকে হত্যা করবার উদ্দেশ্যে তাঁর ঘরের সামনে জমা হচ্ছিল ঠিক তখনই তিনি রাতের অন্ধকারে হিজরতের উদ্দেশ্যে তাঁর ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। মক্কার ঐ লোকেরা আশঙ্কা করছিল যে, পাছে না মুহাম্মদ (সাঃ) আবার তাদের উদ্দেশ্য জানতে পারেন। তাই যখন তিনি তাদের সামনে দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছিলেন তখন তাঁরা মনে করলো যে, এ বুঝি অন্য কোন লোক হবে। কাজেই তারা তাঁকে আক্রমণ করার বদলে নিজেরা জড়োসড়ো হয়ে লুকিয়ে পড়লো, যাতে ঐ লোকটি তাদেরকে দেখতে না পায়। দেখতে পেলে তো আবার 'মুহাম্মদ' ব্যাপারটা টের পেয়ে যাবে!

ঐ রাতের আগের দিন তাঁর (সাঃ) সাথে হিজরত করে যাওয়ার জন্য হযরত আবুবকরকে (রাঃ) বলে রাখা হয়েছিল। কাজেই, তিনিও মিলিত হলেন তাঁর (সাঃ) সাথে। এবং দু'জন এক সাথে একটু পরেই মক্কা থেকে বের হয়ে পড়লেন। এবং মক্কা থেকে তিনি/চার মাইল দূরে সওর নামক এক পাহাড়ের শীর্ষে এক গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিলেন।* যখন মক্কার লোকেরা জানতে পারলো যে, মুহাম্মদ (সাঃ) মক্কা থেকে চলে গেছেন, তখন তারা একটা সশস্ত্র দল গঠন করলো এবং তাঁর অনুসন্ধানের জন্য পায়ের ছাপ অনুসরণকারী গোয়েন্দাও সঙ্গে নিল। গোয়েন্দা তাঁর খোঁজ করতে করতে সওর পাহাড়ে গিয়ে উঠলো। এবং সেই গুহার মুখে গিয়ে বললো যে, এখানেই আছে মুহাম্মদ (সাঃ)। সেই গুহার ভেতরে মানুষ থাকা সম্ভব নয় ভেবে কেউ তাদের কথা বিশ্বাস করতে চাইলো না। তখন গোয়েন্দারা খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বললো, 'হয় মুহাম্মদ এই গুহার ভেতরে আছে, নয়তো সে আসমানে উঠে গেছে।' গোয়েন্দাদের এই কথা শুনে আবুবকর (রাঃ) ভয় পেয়ে গেলেন এবং চুপে চুপে বললেনঃ

'দুশমনরা মাথার উপরে এসে পড়েছে। এখন তারা যে কোন মুহূর্তে গুহার ভেতরে ঢুকে পড়তে পারে।'

আঁ হযরত (সাঃ) বললেনঃ

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا

'ভয় পেয়োনা, নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন।' উত্তরে আবুবকর বললেনঃ

'ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমি আমার প্রাণের জন্য ভয় করি না। কেননা, আমি একজন সাধারণ মানুষ। আমি মারা গেলে একজন মানুষই মরবে। ইয়া

---

* *বুখারী ঃ বাবু হিজরাতুন্নাবী (সাঃ)*

রসূলাল্লাহ্! আমার ভয় শুধু এজন্যই যে, যদি আপনার প্রাণের কোন ক্ষতি হয়ে যায়, তাহলে পৃথিবীর বুক থেকে আধ্যাত্মিকতা এবং ধর্মের নাম মুছে যাবে।'

আঁ হযরত (সাঃ) বললেনঃ

'কোনও পরওয়া নেই, এখানে আমরা মাত্র দু'জনই নই, তৃতীয় জন, খোদাও আছেন আমাদের সাথে'। *(বুখারী ঃ বাবু মানকিবুল মুহাজেরীন)*

এখন সময় এসে গেছে যে, খোদাতায়ালা ইসলামকে বাঁচাবেন এবং উন্নতি দান করবেন এবং মক্কাবাসীদের জন্য যে অবকাশ দেওয়া হয়েছিল তা শেষ হয়ে গেছে। খোদাতায়ালা মক্কাবাসীদের চোখের উপর পর্দা ফেলে দিলেন এবং ওরা গোয়েন্দার সাথে খ্যাচ খ্যাচ করা শুরু করে দিল এবং বললো, 'ওরা কি এই খোলা জায়গাটায় আশ্রয় নিয়েছে? এটা তো আশ্রয় নেওয়ার মত কোন জায়গাই নয়। তাছাড়া এটা তো সাপ, বিচ্ছু, পোকা-মাকড় ইত্যাদির আড্ডা খানা। এখানে কোন বুদ্ধিমান লোক আশ্রয় নেবে ?' এমন কি, তারা গুহার মধ্যে উঁকি মেরেও দেখলো না। এবং না দেখেই গোয়েন্দার প্রতি হাসি-বিদ্রূপ করে অন্যদিকে চলে গেল।

দু'দিন ঐ গুহায় থাকার পর, পূর্বের বন্দোবস্ত অনুযায়ী রাত্রিবেলায় গুহার কাছে সওয়ারী (বাহন) পশু পাঠানো হলো এবং তেজীয়ান উটনীর উপরে আরোহণ করে মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং তাঁর সঙ্গী (রাঃ) রওয়ানা হয়ে গেলেন। একটা উটনীর উপরে আরোহণ করলেন মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এবং গাইড বা পথ-প্রদর্শক, এবং অপরটিতে হযরত আবুবকর (রাঃ) এবং তাঁর খাদেম আমের বিন ফোহায়রা।

মদীনার পথে রওয়ানা হওয়ার আগে রসূলে করীম (সাঃ) তাঁর মুখ ফেরালেন মক্কার দিকে- মক্কা সেই পবিত্র শহর যেখানে তিনি জন্ম গ্রহণ করেছেন, যেখানে তিনি নবুওয়ত লাভ করেছেন, এবং যেখানে হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর যামানা থেকে শুরু করে তাঁর (সাঃ) পূর্বপুরুষরা বসবাস করে আসছেন। তিনি শেষবারের মত মক্কার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন এবং ব্যথাতুর হৃদয়ে সেই শহরকে সম্বোধন করে বললেন, 'হে মক্কা! তুমি আমার কাছে সমস্ত জায়গা থেকে অধিক প্রিয়, কিন্তু তোমার লোকেরা আমাকে এখানে থাকতে দিল না।'

এই সময় হযরত আবুবকর (রাঃ) খুব আফসোসের সঙ্গে বললেন, 'এই লোকগুলো নিজেদের নবীকে তাড়িয়ে দিল, এখন এরা ধ্বংস হয়ে যাবে।' *

---

* *(যুরকানী ঃ ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩২৮, মুসনাদ আহমদ ও তিরমীযির সূত্রে।)*

সোরাকার পশ্চাদ্ধাবন এবং তার সম্পর্কে আঁ হযরত (সাঃ)-এর এক ভবিষ্যদ্বাণী

রসূলে পাক (সাঃ)-এর অনুসন্ধানে মক্কাবাসীরা যখন ব্যর্থ হলো, তখন তারা ঘোষণা করে দিল যে, যে কেউ মুহাম্মদকে (সাঃ) এবং আবুবকরকে (রাঃ) জীবিত কিংবা মৃত ধরে আনতে পারবে তাকে একশত উটনী পুরস্কার দেওয়া হবে। এই ঘোষণার খবর মক্কার আশে পাশের কবিলাগুলোর মধ্যেও ছড়িয়ে দেওয়া হলো। সোরাকা বিন মালেক নামক এক বেদুঈন নেতা এই পুরস্কারের লোভে আঁ হযরত (সাঃ)-এর অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়লো। অনুসন্ধান করতে করতে সে মদীনামুখী রাস্তার উপরে আঁ হযরত (সাঃ)-এর প্রায় নাগালের মধ্যে এসে পড়লো। যখন সে দু'টি উটনী ও তাদের আরোহীদের দেখতে পেলো, এবং বুঝতে পারলো যে, এরাই মুহাম্মদ (সাঃ) এবং সাথীরা, তখন সে তার ঘোড়াকে সোজা তাঁদের পিছনে ছুটায়ে দিল। কিন্তু ঘোড়াটি রাস্তার উপরে খুব জোরে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল, এবং সোরাকা ঘোড়া থেকে ছিটকে পড়ে গেল। সোরাকা পরবর্তীকালে মুসলমান হয়েছিল। সে তার সেই ঘটনার বিবরণ নিজেই দিয়েছিল এভাবেঃ

"যখন আমি ঘোড়া থেকে পড়ে গেলাম, তখন আমি আরবদের প্রথা অনুসারে 'ফাল' (গণাপড়া-প্রভৃতি) করলাম। কিন্তু 'ফাল' এর ফল বেরুলো খারাপ। তবু, পুরস্কারের লালসার কারণে আমি আবার ঘোড়ায় চড়ে বসলাম এবং আবার ছুটালাম। রসূলে করীম (সাঃ) নির্লিপ্তভাবে তাঁর উটনীর পিঠে বসে অগ্রসর হচ্ছিলেন। তিনি মাথা ঘুরায়ে আমাকে একবার দেখেনও নি। কিন্তু আবুবকর (রাঃ) ভয় পেয়েছিলেন পাছে না রসূলে করীম (সাঃ)-এর উপরে কোন আঘাত এসে পড়ে। তাই তিনি বার বার মুখ ফেরায়ে দেখছিলেন। যখন দ্বিতীয় বারে আমি তাঁদের কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম, তখন পুনরায় আমার ঘোড়া দারুণ জোরে হোঁচট খেলো এবং আমি আবার পড়ে গেলাম। আমি আবার তীর দিয়ে 'ফাল' করলাম। এবারেও ফালের ফলাফল খারাপ বের হলো। আমি দেখলাম যে, বালুর মধ্যে ঘোড়ার পা এতটা দেবে গেছে যে, তা বের করাই মুশকিল হলো। তখন আমার মনে এই ধারণার সৃষ্টি হলো যে, এঁরা নিশ্চয় খোদার হেফাযতের মধ্যে আছেন। আমি তাঁদেরকে ডাক দিয়ে বললাম, 'থামুন এবং আমার কথা শুনুন'। তখন, তাঁরা আমার কাছে এলেন। আমি তাঁদেরকে বললাম, 'আমি যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলাম তা পরিত্যাগ করেছি। আমি এখন ফিরে যাচ্ছি। কেননা, আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, খোদাতায়ালা আপনাদের সাথে আছেন।'

রসুলে করীম (সাঃ) তখন বললেন, 'আচ্ছা যাও। কিন্তু কাউকে আমাদের সম্পর্কে কোন খবর দিও না।'

তখন আমার মনে এই ধারণার সৃষ্টি হলো যে, যেহেতু মনে হচ্ছে এই ব্যক্তি সত্য, সেহেতু সে একদিন নিশ্চয় বিজয় লাভ করবে। এবং এই ধারণা থেকেই আমি আবেদন করলাম যে, যখন আপনি বিজয় লাভ করবেন, তখনকার জন্য আমাকে একটা নিরাপত্তার ফরমান লিখে দিন। তিনি (সাঃ) আবুবকর (রাঃ) এর খাদেম আমর বিন ফোহায়রাকে নির্দেশ দিলেন আমাকে একটা ফরমান লিখে দিতে। তদনুযায়ী সে আমাকে একটা নিরাপত্তার ফরমান লিখে দিলো"।

(বুখারী ঃ বাবু হিজরাতুন্নাবী - সাঃ)

ফরমান পেয়ে সোরাকা যখন ফিরে আসছিল, তখন আল্লাহ্তায়ালা আঁ হযরত (সাঃ)-এর নিকটে সোরকার ভবিষ্যৎ অবস্থা প্রকাশিত করে দিলেন। তদনুযায়ী তিনি (সাঃ) তাকে বললেনঃ

'সোরাকা ঐদিন তোমার অবস্থা কেমন হবে যেদিন তোমার দুহাতে কিস্রার কংকন শোভা পাবে!'

বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে সোরাকা প্রশ্ন করেছিল কিসরা বিন হরমুয, শাহানশাহে ইরান ?

আঁ হযরত (সাঃ) বলেছিলেন, 'হাঁ'।

(আস্ সিরাতুল হালবিয়া ঃ ২য় খণ্ড, ৫০ পৃষ্ঠা)

রসূলে পাক (সাঃ)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণী ষোল/সতেরো বছর পরে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছিলোঃ সোরাকা মুসলমান হয়ে মদীনায় এলেন। রসুলে করীম (সাঃ)-এর ওফাতের পর প্রথম খলীফা হন হযরত আবুবকর (রাঃ) এবং তাঁর পরে হযরত উমর (রাঃ)। ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তি ও প্রতিপত্তি দেখে ইরানীরা মুসলমানদের উপরে আক্রমণ করা শুরু করে দিলো। কিন্তু ইসলামকে পর্যুদস্ত করার পরিবর্তে নিজেরাই পর্যুদস্ত ও পরাজিত হলো। কিস্রার রাজপ্রাসাদ ইসলামী সেনাবাহিনীর ঘোড়ার খুরের তলায় পিষ্ট হয়ে গেল। ইরানের ধন সম্পদ মুসলমানদের করতলগত হলো। ইরানের শাহান শাহের যে সমস্ত মালামাল ইসলামী সেনাবাহিনীর হাতে এলো। তার মধ্যে সেই কংকনও ছিল, যে কংকন ইরানী প্রথা অনুসারে সিংহাসনে বসার সময় কিসরা পরতো।

সোরাকা মুসলমান হওয়ার পর তাঁর সেই ঘটনার কথা যা রসূলে করীম (সাঃ)-এর হিজরতের সময় মদীনার পথে ঘটেছিল, তা মুসলমানদের কাছে খুব গর্বের সাথে বলে বেড়াতেন। তাই মুসলমানরা সবাই জানতেন যে, রসূলে করীম

(সাঃ) তাকে বলেছিলেন, 'সোরাকা! ঐ দিন তোমার অবস্থা কেমন হবে, যেদিন তোমার দু'হাতে কিসরার কংকন শোভা পাবে!'

হযরত উমরের আমলে যখন ঐ সব গনীমতের মালামাল এনে রাখা হলো এবং তিনি (রাঃ) সেগুলোর মধ্যে কিসরার কংকন দেখতে পেলেন, তখন তাঁর চোখের সামনে সেদিনের সেই দৃশ্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। সেই দুর্বল, সেই অসহায়, অবস্থার দৃশ্য যখন আল্লাহ্‌র রসূলকে নিজের মাতৃভূমি ছেড়ে মদীনায় চলে আসতে হয়েছিল এবং যখন সোরাকা এবং অন্যান্য লোকেরা আঁ হযরত (সাঃ)-এর পিছনে পিছনে এই উদ্দেশ্যে ঘোড়া ছুটিয়েছিল হয় তাঁকে জিন্দা, নয়তো মুর্দা ধরে এনে মক্কাবাসীদের হাতে সোপর্দ করে দিবে। এবং তার বদলা তারা একশ' উটনীর মালিক হয়ে যাবে। এবং সেই সময়ে সোরাকাকে বলা হয়েছিল, 'সোরাকা! সেদিন তোমার অবস্থা কেমন হবে, যেদিন তোমার দু'হাতে কিস্‌রার কংকন শোভা পাবে ?'-

কত বড় ছিল, এই ভবিষ্যদ্বাণী ! কত উজ্জ্বল নিদর্শন!

হযরত উমর (রাঃ) যখন তাঁর চোখের সামনে কিসরার কংকন দেখতে পেলেন তখন তাঁর চোখের সামনে খোদাতায়ালার কুদরত উদ্‌ঘাটিত হলো। তিনি বললেন, 'সোরাকাকে ডাক।' সোরাকাকে ডাকা হলো। হযরত উমর তাকে বললেন, 'তুমি এই কংকন নিজের হাতে পর।' সোরাকা বললেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসূলের খলীফা 'সোনা পরা তো মুসলমানদের জন্য নিষেধ।' হযরত উমর (রাঃ) বললেন, 'হাঁ' নিষেধ, কিন্তু এই ঘটনার জন্য নয়। আল্লাহ্‌তায়ালা মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্‌কে (সাঃ) দেখিয়েছিলেন, তোমার হাতে সোনার কংকন পরা অবস্থায় এখন হয় তুমি এই কংকন পরবে, নয়তো আমি তোমাকে শাস্তি দেব। সোরাকার আপত্তি তো ছিল স্রেফ শরীয়তের মসলার কারণে, নয়তো তাঁরও এই ইচ্ছা ছিল যে, তিনি যেন নিজেও রসূলে করীম (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হতে দেখেন। সোরাকা সেই কংকন নিজ হাতে পরলেন এবং মুসলমানরা এই শক্তিশালী ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা নিজেদের চোখে দেখলেন। মক্কা থেকে বিতাড়িত রসূল আজ দুনিয়ার বাদশাহ্‌। তিনি নিজে দুনিয়াতে ছিলেন না বটে, কিন্তু ইসলামের গোলামরা তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের পূর্ণতা দেখতে পাচ্ছিল।

আঁ হযরত (সাঃ) মদীনা গেলেন

সোরাকা বিদায় হয়ে যাওয়ার পর বাকী কয়েক মঞ্জিল পথ (এক মঞ্জিল = এক দিনের পথ) অতিক্রম করে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া

সাল্লাম মদীনায় পৌঁছে গেলেন। মদীনার লোকেরা অধীর আগ্রহে তাঁর প্রতীক্ষা করছিলেন। এর চাইতে বড় সৌভাগ্য তাদের আর কী হতে পারে! যে সূর্য মক্কায় উঠেছিল এখন তা মদীনাবাসীর উপরে গিয়ে উদিত হলো।

যখন তাদের কাছে এই খবর পৌঁছল যে, রসুলে করীম (সাঃ) মক্কা থেকে গায়েব হয়ে গেছেন তখন থেকেই তারা তাঁর প্রতীক্ষায় দিন গুণছিল। তাদের প্রতিনিধিদল প্রত্যেক দিন মদীনা থেকে কয়েক মাইল দূরে এসে দিনভর খোঁজ করতো এবং সন্ধ্যার সময় নিরাশ হয়ে ফিরে যেত। আঁ হযরত (সাঃ) যখন মদীনার কাছাকাছি পৌঁছে গেলেন, তখন তিনি স্থির করলেন যে, তিনি প্রথমে কোবাতে (মদীনার নিকটবর্তী একটি গ্রাম) অবস্থান করবেন। একজন ইহুদী তাঁর (সাঃ) উটনীগুলিকে আসতে দেখে বুঝতে পারলো যে, এই কাফেলাই মুহাম্মদ (সাঃ)-এর। সে একটা টিলার উপরে উঠলো এবং খুব জোরে ডাক দিয়ে বললোঃ

'হে কায়লার সন্তানেরা। (কায়লা মদীনার একটি উপত্যকা) তোমরা যাঁর প্রতীক্ষায় ছিলে তিনি এসে গেছেন।'

এই ডাক শুনেই মদীনার প্রত্যেকটি লোক কোবার দিকে দৌড়াতে লাগলো। কোবার বাসিন্দারা ধারণা করলো যে, আল্লাহ্‌র নবী তাঁদের মধ্যেই থাকবার জন্য এসেছেন। কাজেই তারা আনন্দে গান গাইতে আরম্ভ করলো।

এই সময়ে একটা ঘটনা ঘটে গেল যা রসূলে করীম (সাঃ)-এর সরলতার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মদীনার অধিকাংশ লোক তাঁকে (সাঃ) কোনদিন দেখেনি। তিনি কোবার বাইরে একটা গাছের ছায়ায় বসা ছিলেন। লোকেরা মদীনা থেকে ছুটে আসছিল তাঁর দিকে। যেহেতু রসূলে করীম (সাঃ) নিতান্ত সাধাসিধা ভাবেই সেখানে বসা ছিলেন, সেহেতু যারা চিনতো না তারা হযরত আবুবকরের (রাঃ) পাকধরা দাড়ি দেখে (যদিও তিনি বয়সে কিছু ছোট ছিলেন) এবং তাঁর পরনে অপেক্ষাকৃত ভাল পোষাক দেখে মনে করলো যে, ইনিই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এবং তাঁর দিকেই মুখ করে খুব আদবের সঙ্গে বসে যেতে লাগলো। ব্যাপার দেখে হযরত আবুবকর (রাঃ) আঁচ করলেন যে, লোকেরা তো ভুল করছে। তখন তিনি ঝটপট একটা চাদর রসূলে করীম (সাঃ)-এর মাথার উপরে মেলে ধরে বললেন,

'ইয়া রসূলাল্লাহ্! আপনার গায়ে রোদ লাগছে। আমি আপনার উপরে ছায়া ধরছি।'× এবং এইভাবে সুন্দর একটা উপায় করে নিয়ে তিনি (রাঃ) লোকদেরকে তাদের ভুল ধরিয়ে দিলেন।

---

* *বুখারী ঃ বাবু হিজরাতুন্নাবী (সাঃ)*

কোবাতে দশদিন থাকার পর মদীনাবাসীরা রসূলে করীম (সাঃ)-কে মদীনায় নিয়ে এলো। তিনি যখন মদীনাতে প্রবেশ করছিলেন তখন মদীনার সমস্ত লোক নারী-পুরুষ, বুড়া-বুড়ী, জওয়ান-বাচ্চা সব্বাই রাস্তায় বেরিয়ে এলো এবং আঁ হযরত (সাঃ)-কে স্বাগত অভিনন্দন জানাতে লাগলো। বালক-বালিকারা এবং তাদের সঙ্গে মহিলারাও গাইতে শুরু করে দিলো ঃ

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع
وجب الشكر علينا ما دعا لله داع
ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع

অর্থাৎ, পূর্ণিমার চাঁদ আমাদের উপরে উদিত হয়েছে পাহাড়ের ওপার হতে যতক্ষণ আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারী পৃথিবীতে অবস্থান করেন, ততক্ষণ আমাদের উচিত তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা। হে, সেই তুমি! যাকে আল্লাহ্ আমাদের মাঝে আবির্ভূত করেছেন আমরা তোমার হুকুম মান্য করে চলবো।'

(হালবিয়া) (যুরকানী ঃ ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৫)

রসূলে করীম (সাঃ) পূর্বদিক দিয়ে মদীনায় প্রবেশ করেন নি। কিন্তু পূর্ণিমার চাঁদ তো উদিত হয় পূর্বে দিক থেকেই। সুতরাং মদীনার লোকদের ঐ কবিতার ইংগিত এদিকে ছিল যে, আসল চাঁদ তো আধ্যাত্মিক চাঁদ। আমরা এতদিন অন্ধকারে ছিলাম, এখন আমাদের উপরে চন্দ্র উদিত হয়েছে। এবং এই চাঁদ উদিত হয়েছে সেই দিক থেকেই যেদিক থেকে সাধারণ চাঁদ উদিত হয় না। যেদিন রসূলে করীম (সাঃ) মদীনায় প্রবেশ করেন সেদিন ছিল সোমবার, এবং সোমবারেই তিনি বের হয়ে আসেন সওর গিরিগুহা থেকে, এবং আশ্চর্য যে, তাঁর মক্কা বিজয়ের দিনটিও ছিল সোমবার।

যেদিন তিনি মদীনায় প্রবেশ করেন সেদিন প্রত্যেকেই এই আশা করেছিল যে, তিনি যেন তার বাড়ীতেই উঠেন। যে যে গলি দিয়ে তাঁর উটনী যাচ্ছিল সেই সেই গলির বিভিন্ন পরিবারের লোকেরা তাদের নিজ নিজ ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে রসূলে করীম (সাঃ)-কে স্বাগত সম্ভাষণ জানাচ্ছিল এই বলেঃ

'ইয়া রসূলাল্লাহ্! এ বাড়ী আমার, এই সব মাল-সম্পদ আমার, এবং এরা সবাই আমার লোকজন যা সবই আপনার খেদমতের জন্য হাযির।' ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমরা আপনার হেফাযত করতে সক্ষম। আপনি আমাদের এখানেই থাকুন।'

অনেকেই উৎসাহের বশে অগ্রসর হয়ে তাঁর উটনীর লাগাম ধরে টানাটানি করতে লাগলো যেন তিনি তাদের বাড়ীতেই উঠেন। কিন্তু তিনি প্রত্যেককেই বললেনঃ

'আমার উটনীকে ছেড়ে দাও। এ আজ খোদাতায়ালার পক্ষ থেকে আদিষ্ট। এ সেখানেই খাড়া হবে, যেখানে খোদা ইচ্ছা করবেন।'

অবশেষে, মদীনার এক প্রান্তে বনু নযীর গোত্রের এতীমদের একটা জমিনের পার্শ্বে গিয়ে উটনী খাড়া হয়ে গেল। তিনি (সাঃ) বললেনঃ

'মনে হচ্ছে খোদাতায়ালার এটাই ইচ্ছা যে, আমি এখানেই থেকে যাই।'

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'এই জমি কার?'

জমিটা ছিল কয়েক জন এতীমের। তাদের অভিভাবক অগ্রসর হয়ে এসে বললোঃ

'ইয়া রসূলাল্লাহ্! এ জমিন অমুক অমুক এতীমের। এবং তারা আপনার খেদমতের জন্য উপস্থিত।'

তিনি বললেন, 'আমি তো কারো সম্পত্তি বিনামূল্যে নিতে পারি না।'

শেষে, জমিনের মূল্য নির্ধারণ করা হলো, এবং তিনি সেই স্থানেই মসজিদ ও নিজের বাড়ী তৈরী করবেন বলে স্থির করলেন।

হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর আবু আইয়ূব আনসারী (রাঃ)-এর বাড়ীতে অবস্থান

হযরত মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞাস করলেন, সবচেয়ে নিকটে কার বাড়ী? আবু আইয়ূব আনসারী (রাঃ) এগিয়ে এসে বললেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমার বাড়ীই সবচেয়ে কাছে। এবং তা আপনার খেদমতে প্রস্তুত।' আঁ হযরত (সাঃ) বললেন, 'বাড়ী যাও, এবং আমার জন্য একটা কামরা ঠিক করে দাও।' আবু আইয়ূব আনসারীর (রাঃ) বাড়ীটি ছিল দোতলা। তিনি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)- কে উপরের তলায় থাকবার জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্তু, তাতে লোকজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে অসুবিধা হতে পারে ভেবে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নীচের তলাতেই থাকবেন বলে বললেন।

রসূলে করীম (সাঃ)-এর প্রতি গভীর ভালবাসা সৃষ্টি হয়েছিল আবু আইয়ূব আনসারীর। তার প্রকাশ দেখা গেল একটি ঘটনায়। তিনি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কথামত রাজি হয়ে গেলেন, এবং ঠিক করলেন যে, আঁ হযরত (সাঃ) থাকবেন

নীচের তলাতেই। কিন্তু, সারারাত তাঁরা এই চিন্তাতে জেগেই কাটালেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আছেন নীচের তলায়, আর তাঁরা আছেন তারই উপরের ছাদে। এতো বড় বেয়াদবী করা তো ঠিক হচ্ছে না। তদুপরি, রাত্রে ঘটনাক্রমে এক কলসী পানি পড়ে গেল। তাঁরা দেখলেন যে, এখন তো পানি চুয়ে চুয়ে নীচে পড়তে থাকবে। কাজেই আবু আইয়ূব আনসারী (রাঃ) তাড়াতাড়ি করে তাঁর একটা লেপ পানির উপরে বিছায়ে দিয়ে পানি চুষে নিয়ে মুছে ফেললেন। সকালে তিনি আবারও আঁ হযরত (সাঃ)-এর কাছে গিয়ে ঘটনা বললেন এবং তাঁকে দোতলায় থাকবার জন্য আবারও অনুরোধ করলেন। এতে রসূলে করীম (সাঃ) রাজি হয়ে গেলেন। হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রাঃ) প্রত্যহ খাবার তৈরী করে আঁ হযরত (সাঃ)-এর কাছে নিয়ে আসতেন। এবং তাঁর (সাঃ) খাওয়ার পর যা বেঁচে যেত তাই তারা পরিবারের সবাই মিলে খেতেন। দিন কয়েক পর অন্যান্য আনসাররা এই মেহমানদারীতে অংশ গ্রহণ করার জন্য দাবী জানালো। এবং যতদিন না রসূলে করীম (সাঃ)-এর জন্য বাড়ী তৈরী হলো, ততদিন পর্যন্ত মদীনার মুসলমানরা পালা করে তাঁর জন্যে খাবার পৌঁছাতে থাকলেন।

হযরত আনাস (রাঃ)-এর সাক্ষ্য

মদীনার একজন বিধবার একটি ছেলে ছিল। নাম ছিল তার আনাস এবং বয়স আট/নয় বছর। বিধবা তাঁর ছেলেটিকে আঁ হযরত (সাঃ)-এর সেবার জন্য নিয়ে এলেন এবং বললেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমার এই ছেলেটিকে আপনি আপনার খেদমতের জন্য গ্রহণ করুন।' বিধবা তো তাঁর শ্রদ্ধা ও ভক্তির কারণে তাঁর ছেলেকে সাময়িকভাবে উৎসর্গ করলেন, কিন্তু তিনি কি জানতেন যে, তাঁর ছেলেকে সাময়িকভাবে নয়, বরং চিরকালের জন্যই গ্রহণ করা হলো।

আনাস (রাঃ) রসূলে করীম (সাঃ)-এর সঙ্গে থেকে থেকে একজন মস্ত বড় আলেম হয়ে উঠলেন। এবং ধীরে ধীরে সম্পদশালীও হয়ে উঠলেন। তিনি একশ' বছরেরও বেশী বয়স পর্যন্ত বেঁচেছিলেন এবং ইসলামী রাজত্বে তাঁর প্রতি অতি উচ্চ শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা হতো। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেনঃ

'আমি খুব অল্প বয়সেই রসূলে করীম (সাঃ)-এর সেবা করবার সুযোগ পেয়েছিলাম, এবং সারা জীবনই আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। তিনি (সাঃ) কখনই আমাকে কোন শক্ত কথা বলেন নি, কখনও ধমক দেননি, কখনও এমন কোন কাজের জন্য বলেন নি যা আমার ক্ষমতার বাইরে ছিল।'*

---

* *বুখারী ঃ বাবু হিজরাতুন্নবী (সাঃ) ও যুরকানী ঃ ১ম খন্ড (হিজরতের ঘটনা) মুসলিম ঃ ২য় খণ্ড, কিতাবুল ফাযায়েল।*

মদীনায় থাকাকালীন সব সময়েই রসূলে করীম (সাঃ) একমাত্র আনাস (রাঃ)-এর কাছ থেকেই খেদমত গ্রহণ করেছিলেন। এবং আনাস (রাঃ)-এর উক্ত সাক্ষ্য আঁ হযরত (সাঃ)-এর মদনী জীবনের চারিত্রিক উন্নত বৈশিষ্ট্যের উপরে অতি উজ্জ্বলরূপে আলোকপাত করছে।

মক্কা থেকে পরিবারের লোকজনকে আনয়ন

এবং

মস্‌জিদুন্ নববীর ভিত্তি স্থাপন

কিছুদিন পরে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁর মুক্ত করে দেওয়া ক্রীতদাস যায়েদকে (রাঃ) মক্কায় পাঠিয়ে দিলেন তাঁর পরিবারের লোকজনকে নিয়ে আসার জন্য। মক্কাবাসীরা যেহেতু এই আকস্মিকভাবে হিজরত করে যাওয়াতে হতভম্ব ও ভীত হয়ে পড়েছিল, সেহেতু কিছুদিন তাদের অত্যাচার বন্ধ ছিল। তাদের ঐ ভীতির কারণেই তারা রসূলে করীম (সাঃ) এবং হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর খান্দানের লোকজনকে মক্কা ছেড়ে যাওয়ার সময় কোন বাধাদান করতে পারেনি। কাজেই তাঁরা সবাই নিরাপদে মদীনায় পৌঁছে গেলেন। যে জমিন রসূলে করীম (সাঃ) কিনে নিয়েছিলেন সেখানেই তিনি সর্বপ্রথম মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করলেন। তারপর নিজের জন্য এবং তাঁর সঙ্গীদের জন্য বাড়ী নির্মাণ করলেন। এতে সময় লেগেছিল প্রায় সাত মাস।*

মদীনার পৌত্তলিক গোত্রগুলির ইসলাম গ্রহণ

আঁ হযরত (সাঃ)-এর মদীনায় যাওয়ার দিন কয়েকের মধ্যেই মদীনার পৌত্তলিক কবিলাগুলোর প্রায় সবাই মুসলমান হয়ে গেল। যারা মুসলমান হতে পারছিল না, তারাও বাহ্যিকভাবে মুসলমান হয়ে গেল। কাজেই এ ভাবেই প্রথম পর্যায়ে মুসলমানদের মধ্যে মুনাফেকদেরও একটা জামাত ঠাঁই করে নিল। এদের মধ্য থেকে কিছু কিছু লোক তো পরবর্তীকালে সত্যিকার অর্থে ঈমান এনেছিল, কিন্তু কিছু লোক বরাবরের জন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও দুষ্কৃতি চালিয়ে যেতে থাকলো। কিছু লোক এমনও ছিল যারা বাহ্যিকভাবেও ইসলাম গ্রহণ

---

* *বুখারী ঃ বাবু হিজরাতুন্নবী (সাঃ) ও যুরকানী ঃ প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৬৯*

করেনি। এরা কোনমতেই মদীনাতে ইসলামের প্রভাব প্রতিপত্তি বরদাশ্‌ত করতে পারছিল না। তাই, এরা মদীনা থেকে হিজরত করে মক্কায় চলে গেল। অতঃপর, পৃথিবীর বুকে মদীনাই প্রথম সেই শহর হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করলো, যেখানে খাসভাবে এক খোদার এবাদত কায়েম করা হলো।

বলা বাহুল্য, ঐ যামানায় পৃথিবীর বুকে এই শহরটি ছাড়া এমন কোন শহর বা গ্রাম আর ছিল না যেখানে খাসভাবে এক খোদার এবাদত করা হতো। মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জন্য এটা যে কত বড় খুশীর ব্যাপার ছিল এবং তাঁর সঙ্গীদের কাছে এ যে কত বড় সাফল্য ছিল তা ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন। মক্কা থেকে হিজরত করার পর মাত্র কিছুদিনের মধ্যেই খোদাতায়ালা তাঁদের দ্বারা একটা শহরকে পূরোপূরিভাবে তাঁর নিজের (অর্থাৎ সর্বশক্তিমান-এর) উপাসনাকারীতে পরিণত করে দিলেন। যেখানে কোনদিন আর কোন মূর্তিপূজা হয়নি, না প্রকাশ্য কোন মূর্তির না গোপন কোন মূর্তির। তবে এই পরিবর্তন থেকে এটা মনে করার কোন কারণ নেই যে, মুসলমানের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। মদীনাতেও আরবদের একটা মুনাফেক জামাত ছিল যারা আঁ হযরত (সাঃ)-এর জানের দুশমন ছিল। তাছাড়া, ইহুদীও সেখানে ছিল যারা নিরবচ্ছিন্নভাবে চক্রান্ত করে চলছিল। এই সকল বিপদের কথা চিন্তা করে তিনি (সাঃ) সব সময় সতর্ক অবস্থায় থাকতেন। এবং নিজের সঙ্গীদেরকেও সদা সতর্ক থাকার জন্য তাগিদ দিতেন। প্রথমদিকে তো কোন কোন দিন এমন অবস্থাও হয়েছে যে, তাঁকে রাতভর জেগে কাটাতে হয়েছে। এই রকম অবস্থায় থাকতে থাকতে তিনি একদিন খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ে স্বগতোক্তি করলেন, 'এখন যদি কোন ভাল লোক এখানে পাহারা দিত, তাহলে হয়ত আমি একটু শুইতে পারতাম।' পরক্ষণেই অস্ত্রের ঝংকার শোনা গেল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কে ওখানে?' উত্তর এলো, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমি সাঈদ বিন আক্কাস, আপনার পাহারার জন্য এসেছি।' এতে তিনি আরাম করতে গেলেন। আনসারদের নিজেদেরও এই চিন্তা হতো যে, মদীনাতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিরাপত্তার ব্যাপারে তাদের জিম্মাদারীও কিছু কম নয়। কেননা, মদীনাতেও আঁ হযরত (সাঃ) শত্রুদের আক্রমণ থেকে নিরাপদ নন। কাজেই তাঁরা সমবেতভাবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, প্রতিটি কবিলা থেকে কিছু কিছু করে লোক পর্যায়ক্রমে তাঁর বাড়ী পাহাড়া দিয়ে যাবে। বস্তুতঃ মক্কী জীবন ও মদনী জীবনে যদি কিছু তফাৎ থেকে থাকে, তবে তা স্রেফ এতটুকুই যে, মুসলমানরা এখন অপর কোন লোকের উপদ্রব ছাড়াই খোদার নামে প্রতিষ্ঠিত মসজিদে নামায পড়তে পারে।

মুসলমানদেরকে কষ্ট দেওয়ার লক্ষ্যে

মক্কাবাসীদের পুনরায় প্রচেষ্টা

দু'তিন মাস কেটে গেলে পর মক্কাবাসীদের ভীতি ও পেরেশানী দূর হলো। অতঃপর তারা নতুন করে চিন্তা-ভাবনা শুরু করে দিল যে, কী করে মুসলমানদেরকে ঘায়েল করা যায়। সলা-পরামর্শ করার পর তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, শুধু মক্কানগরী এবং আশেপাশে মুসলমানদের উপরে অত্যাচার চালালেই তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে না। তারা ইসলামকে কেবল তখনই শেষ করতে পারবে যখন তারা মুহাম্মদকে (সাঃ) মদীনা থেকেও বিতাড়িত করতে পারবে। সুতরাং তারা আব্দুল্লাহ্ বিন্ উবায় বিন সলুল-যার উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে এবং যাকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আগমনের পূর্বে মদীনাবাসীরা তাদের বাদশাহ্ বানাতে চেয়েছিল- তাকে বলে পাঠাল যে, মুহাম্মদ (সাঃ) মদীনা যাওয়াতে মক্কাবাসীরা মনে খুব আঘাত পেয়েছে। মদীনাবাসীদের উচিত ছিল না তাঁকে ও তাঁর সঙ্গীদেরকে আশ্রয় দেওয়া। শেষে তারা আরো বলেছিল ঃ

إِنَّكُمْ آوَيْتُمْ صَاحِبَنَا وَإِنَّا نُقْسِمُ بِاللّٰهِ
لَتُقَاتِلُنَّهُ أَوْ تُخْرِجُنَّهُ أَوْ لَنَسِيرَنَّ إِلَيْكُمْ
بِأَجْمَعِنَا حَتّٰى نَقْتُلَ مُقَاتِلَتَكُمْ وَنَسْتَبِيحَ
نِسَاءَكُمْ.

অর্থাৎ- 'এখন যেহেতু তোমরা আমাদের লোককে (মুহাম্মদ-সাঃ)-কে তোমাদের ঘরে আশ্রয় দিয়ে রেখেছ, সেহেতু আমরা আল্লাহ্র কসম খেয়ে এই ঘোষণা দিচ্ছি যে, হয় তোমরা -মদীনাবাসীরা- তার সাথে যুদ্ধ কর এবং তাকে তোমাদের শহর থেকে তাড়িয়ে দাও; নয়তো আমরা সকলে সমবেতভাবে মদীনা আক্রমণ করবো এবং মদীনার সকল সমর্থ ব্যক্তিকে হত্যা করবো এবং স্ত্রীলোকদেরকে ক্রীতদাসী করে আনবো।'

এই পত্র পেয়ে আব্দুল্লাহ্ বিন উবায় বিন সলুলের নিয়্যত খারাপ হয়ে গেল। সে অন্যান্য মুনাফেকদের সঙ্গে সলা-পরামর্শ করলোঃ আমরা যদি মুহাম্মদকে (সাঃ) এখানে থাকতে দেই, তাহলে আমাদের জন্য বিপদের রাস্তা খুলে যাবে। কাজেই, আমাদের উচিত হবে, তার সাথে যুদ্ধ করা যাতে মক্কাবাসীরা সন্তুষ্ট হয়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বিষয়টা জানতে পারলেন। তিনি আব্দুল্লাহ্ বিন উবায় বিন

সলুলের কাছে গেলেন এবং তাকে বুঝাবার চেষ্টা করলেন যে, তোমার এই কাজ স্বয়ং তোমার জন্যই ক্ষতিকর হবে। কেননা, তুমি তো জান যে, মদীনার বহুসংখ্যক লোক মুসলমান হয়ে গেছে এবং তারা সবাই ইসলামের জন্য জান দিতে প্রস্তুত। তুমি যদি তোমার মনমতই কাজ করো, তাহালে তারা মুহাজেরদের সঙ্গে থাকেব। ফলে, তোমরাই ধ্বংস হয়ে যাবে এই যুদ্ধে। বিষয়টা আব্দুল্লাহ বিন উবায় বিন সলুল উপলব্ধি করতে পারলো এবং সে তার উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করলো।

আনসার ও মুহাজেরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন*

এই সময়টাতে রসূলে করীমে (সাঃ) ইসলামের শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে আরও একটি পরিকল্পনা কার্যকরী করলেন। এবং তা হলোঃ তিনি সকল মুসলমানদেরকে একত্রে সমবেত করলেন এবং একজন মুহাজেরকে এক জন আনসারের সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বেঁধে দিয়ে পরস্পর ভাই ভাই বানিয়ে দিলেন। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনকে আনসাররা এত বেশী খুশীর সঙ্গে গ্রহণ করলো যে, প্রত্যেক আনসার তার ভাইকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন এবং নিজের মাল সম্পত্তি তার সামনে এনে সমান দু'ভাগে-বাঁটোয়ারা করে এক ভাগ তাকে দিয়ে দিলেন। এক জন আনসার তো এতদূর করলেন যে, তিনি তাঁর মুহাজের ভাইকে বলে ফেলেছিলেন, 'আমি আমার দুই স্ত্রীর একজনকে তালাক দিয়ে দিই। তুমি তাকে নেকাহ্ করে নাও।' কিন্তু মুহাজেররা তাদের এই ভালবাসার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁদের মাল সম্পত্তির অংশ গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করলেন। কিন্তু, আনসাররাও সহজে, ছাড়তে রাজি হলেন না। শেষে, ব্যাপারটা রসূলে করীম (সাঃ)-এর গোচরে আনা হলো, আনসাররা তাঁর কাছে আরজ করলেনঃ

'ইয়া রসূলাল্লাহ্! এই মুহাজেররা যখন আমাদের ভাই হয়ে গেছে, তখন এটা কী করে হতে পারে যে, তারা আমাদের মাল সম্পদের অংশীদার হবে না? তবে, তারা যেহেতু কৃষি কার্য জানে না, তারা ব্যবসা বাণিজ্য করা লোক, সেহেতু তারা আমাদের জমিনের হিস্যা না নিতে পারে, কিন্তু ফসলের অংশীদার তাদেরকে অবশ্যই হতে হবে।'

মুহাজেররা তাঁদের ফসলেরও অংশীদার হতে রাজি হলেন না। এবং তাঁরা তাদের বাপদাদার যে পেশা সেই পেশায় নিয়োজিত হলেন। এবং অল্পদিনের মধ্যে তাঁদের অনেকেই সম্পদশালী হয়ে উঠলেন। কিন্তু নিজেদের সম্পত্তির

---

* *ইবনে হিশাম : প্রথম খণ্ড, ১৭৯ পৃষ্ঠা।*

বাঁটোয়ারার ব্যাপারে আনসাররা এতটা নাছোড়বান্দা ছিলেন যে, অনেকে মারা যাওয়ার পর তাঁদের ছেলেমেয়েরা, আরব-রীতি মোতাবেক মুহাজের ভাইদেরকে মৃত ব্যক্তিদের সম্পত্তির হিস্যা দিয়ে দিত। এবং এই রীতি কয়েক বৎসর ধরে প্রচলিত ছিল। পরে কোরআন করীমের মাধ্যমে প্রদত্ত নির্দেশ অনুসারে এই রীতিকে বাতিল করা হলো।

মুহাজের, আনসার ও ইহুদীদের মধ্যে চুক্তি

মুসলমানদেরকে পরস্পর ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করার পর হযরত রসূলে করীম (সাঃ) মদীনাবাসী সকলের মধ্যেই একটি চুক্তি সম্পাদন করলেন। তিনি ইহুদী ও আরব নেতাদেরকে একত্রে সমবেত করলেন এবং তাদেরকে বললেনঃ

'এখানে তো এর আগে মাত্র দু'টি জনগোষ্ঠী বা গ্রুপ ছিল, কিন্তু এখন হয়েছে তিনটি। অর্থাৎ, এখানে ইতোপূর্বে ইহুদী ও মদীনার আরবরা বাস করতো কিন্তু এখন ইহুদী, মদীনার আরব এবং মক্কা থেকে আগত মুহাজের এই তিনটি জনগোষ্ঠী বাস করছে এজন্য প্রয়োজন হয়ে পড়েছে যে, সকলের মধ্যে একটা শান্তি চুক্তি থাকা দরকার।'

কাজেই সেই লক্ষ্যে পরস্পর সমঝোতার মাধ্যমে একটি চুক্তিপত্র তৈরী করা হলো। এই চুক্তি পত্রে বলা হলো ঃ

এক পক্ষঃ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এবং মুমেনগণ;

অপর পক্ষঃ অপরাপর সকলেই যারা এই চুক্তিতে স্বেচ্ছায় আবদ্ধ হতে রাজি।

মুহাজেরের মধ্যে যদি কাউকে হত্যা করা হয়, তাহলে তারা নিজে নিহত ব্যক্তির জিম্মাদারী নিবে। এবং তারা নিজেদের কয়েদী নিজেরাই মুক্ত করে নিবে। মদীনার অন্যান্য মুসলিম কবিলাগুলিও এরূপ ক্ষেত্রে একইভাবে নিজেদের কবিলার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। যদি কোন ব্যক্তি বিদ্রোহ সৃষ্টি করে কিংবা শত্রুতা সৃষ্টি করে এবং সংগঠনের প্রশাসনের মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি করে, তাহলে চুক্তিবদ্ধ সকলেই তার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হবে, এমন কি সে যদি তার ছেলেও হয়।

যদি কোন অবিশ্বাসী কোন মুসলমানের হাতে নিহত হয় তাহলে তার মুসলিম আত্মীয়েরা কোন প্রকার বদলা নিবে না এবং কোন মুসলমান কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে কোন অবিশ্বাসীকে সাহায্য করবে না।

যে ইহুদী আমাদের সাথে জোটবদ্ধ হবে তাকে আমরা সাহায্য করবো।

ইহুদীদেরকে কোন কষ্ট দেওয়া হবে না। তাদের বিরুদ্ধে তাদের কোন শত্রুকে সাহায্য করা যাবে না।

কোন অমুসলিম মক্কার কোন লোককে নিজের ঘরে আশ্রয় দিবে না, তার কোন মালসম্পদও আমানত রাখবে না। সে কাফের ও মুমিনের মধ্যে যুদ্ধে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করবে না।

যদি কোন ব্যক্তি কোন মুসলমানকে অবৈধভাবে হত্যা করে তাহলে তার বিরুদ্ধে সকল মুসলমান সমবেতভাবে দণ্ডায়মান হবে।

যদি কোন মুশরেক মদীনা আক্রমণ করে, তাহলে ইহুদীরা মুসলমানদের সঙ্গেই থাকবে এবং যুদ্ধের খরচে অংশ গ্রহণ করবে। যে সকল ইহুদী কবিলা মদীনার বিভিন্ন কবিলার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ আছে, তারা মুসলমানদের ন্যায় অধিকার সম্পন্ন হবে।

ইহুদীরা তাদের নিজ ধর্ম পালন করবে।

মুসলমানরাও তাদের নিজ ধর্ম পালন করবে।

যে সকল অধিকার ইহুদীরা ভোগ করবে, তা তাদের অনুসারীরাও ভোগ করবে।

মদীনাবাসী কোন ব্যক্তি মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বিনা অনুমতিতে কোন যুদ্ধ শুরু করতে পারবে না। ইহুদীরা তাদের সংগঠনের ব্যয়ভার নিজেরা বহন করবে। মুসলমানরা তাদের ব্যয়ভার নিজেরা বহন করবে। তবে, যুদ্ধের সময় উভয় পক্ষ একত্রে কাজ করবে। মদীনা শহর ঐ সকল লোকদের কাছে, যারা এই চুক্তিতে আবদ্ধ হচ্ছে, এক পবিত্র ও সম্মানিত স্থান বলে বিবেচিত হবে। কোন অপরিচিত ব্যক্তি যদি শহরের লোকদের নিরাপত্তার ভিতরে আসে, তবে তার সাথে সেই আচরণই করা হবে, যা করা হয় শহরের প্রকৃত বাসিন্দা বা নাগরিকদের সাথে।

কলহ বিবাদ মীমাংসার জন্যে তা পেশ করা হবে খোদা এবং তাঁর রসূল (সাঃ)-এর কাছে।

এই চুক্তিতে আবদ্ধ কোন পক্ষই মক্কাবাসী এবং তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ কোন কবিলার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে পারবে না। কেননা, এই চুক্তিতে আবদ্ধ সকলেই মদীনার দুশমনদের বিরুদ্ধে এই চুক্তি বলে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে।

যুদ্ধ যেমন পৃথকভাবে করা যাবে না, সমঝোতাও তেমনি পৃথকভাবে করা যাবে না। কিন্তু কাউকে বাধ্য করা যাবে না যে, সে যুদ্ধে শামিল হোক। তবে, যদি কোন ব্যক্তি জোট বিরোধী কোন কাজ করে বসে, তবে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎ ও ধর্মপরায়ণদের রক্ষাকারী এবং মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র রসূল।'*

এই হচ্ছে সেই চুক্তির সার সংক্ষেপ। এই চুক্তিপত্রে বার বার যে বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে তা হচ্ছে, বিশ্বস্ততা ও সততাকে কিছুতেই হস্তচ্যুত হতে দেওয়া যাবে না। এবং জালেম তার নিজের জুলুমের দায়িত্ব নিজেই বহন করবে। এই চুক্তি থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে, রসূলে করীম (সাঃ)-এর পক্ষ থেকে এই ফয়সালা হয়েছে যে, ইহুদীদের এবং মদীনার অমুসলিম অধিবাসীদের সাথে সম্প্রীতি ও সহমর্মিতা সৃষ্টি করা হবে। এবং তাদেরকে ভাইয়ের মতই রাখা হবে। কাজেই পরবর্তীকালে ইহুদীদের সাথে যেসব কলহ বিবাদ হয়েছিল, তার দায়-দায়িত্ব এককভাবে ইহুদীদেরই ছিল।

মক্কাবাসীদের নতুন দুষ্কৃতি

ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দুই তিন মাস পর মক্কাবাসীদের ভীতি ও পেরেশানী কেটে গেল। কাজেই, তারা আবার নতুন করে দুষ্টামীর প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলো। ঐ সময়ে, মদীনার আওস গোত্রের একজন নেতা সাঈদ বিন মোয়ায (রাঃ) বায়তুল্লাহ তাওয়াফ্ করার জন্য মক্কায় গেলে আবু জাহল তাকে দেখে অত্যন্ত ক্রোধের সঙ্গে বলল, 'তোমরা ভেবেছ কি ? তোমরা কি ঐ মুরতাদটাকে [মুহাম্মদ (সাঃ)] আশ্রয় দেওয়ার পরও শান্তির সঙ্গে কাবা তওয়াফ্ করতে পারবে ? তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা তাকে সাহায্য করতে পারবে? খোদার কসম! এখন যদি তোমার সাথে সুফিয়ান না থাকতো, তাহলে নিজের পরিবারের লোকদের কাছে ফিরে যেতে পারতে না।" সাঈদ বিন মোয়ায (রাঃ) বললেন, 'আল্লাহ্‌র কসম! তুমি যদি আমাকে কাবা তওয়াফ করতে বাধা দাও, তাহলে মনে রেখো, সিরিয়ার রাস্তায় তোমাদের কোন নিরাপত্তা নেই।'

ঐদিনগুলোতে মক্কার একজন বড় নেতা, ওলীদ বিন মুগীরা অসুস্থ ছিলেন। সে উপলব্ধি করেছিল, তার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে। একদিন যখন মক্কার বড় বড় নেতারা তার শয্যার পাশে বসা ছিল, তখন সে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলো,

---

* *ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা - ১৭৮*

মক্কার নেতারা আশ্চর্য হয়ে গেল এবং তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'কেন, আপনি কাঁদছেন কেন ?' সে বললো, 'তোমরা কি মনে করছো যে, আমি মৃত্যুর ভয়ে কাঁদছি। আল্লাহ্‌র কসম, তা নয়। আমার চিন্তা তো একটাই যে, এমন না হয়ে যায় যে, মুহাম্মদের (সাঃ) লোকেরা বিজয় লাভ করে এবং মক্কা তার কবলে চলে যায়'। আবু সুফিয়ান উত্তরে বললেন, 'এসব চিন্তা ছেড়ে দাও। যতক্ষণ আমরা বেঁচে আছি, ততক্ষণ এটা হতে পারবে না। এজন্য আমরা জামীন থাকলাম।'

এই সকল ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, মক্কাবাসীদের জুলুম ও অত্যাচারে যে ছেদ পড়েছিল তা ছিল সাময়িক। তারা আবার তাদের জাতিকে একত্রিত করা শুরু করলো। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে মৃত্যুপথযাত্রী নেতারাও মুহাম্মাদুর রসূলুলাহ্ (সাঃ)-এর বিরোধিতার শপথ গ্রহণ করছিল। তারা মদীনার লোকদেরকে মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উস্কানী দিচ্ছিল। এবং মদীনাবাসীদের অস্বীকৃতির কারণে তাদেরকে ধমকানি দেওয়া হচ্ছিল এই বলে যে, মক্কাবাসীরা এবং তাদের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ গোত্রগুলো সম্মিলিতভাবে মদীনা আক্রমণ করতে যাচ্ছে। তারা মদীনার পুরুষদেরকে হত্যা করবে এবং তাদের স্ত্রীলোকদেরকে ক্রীতদাসী বানাবে।

আঁ-হযরত (সাঃ)-এর প্রতিরক্ষামূলক পরিকল্পনা

সুতরাং, এই পরিস্থিতিতে, যদি মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সাঃ) মদীনাতে চুপচাপ বসে থাকতেন এবং মদীনার রক্ষার কোন ব্যবস্থা না নিতেন, তাহলে নিশ্চয় তার উপরে জিম্মাদারী পালন না করার অভিযোগ উঠতো। কাজেই, তিনি সাহাবীদেরকে ছোট ছোট দলে সংগঠিত করে খবরাখবর সংগ্রহের জন্য মক্কার চারিপাশে প্রেরণ করতে থাকলেন। যাতে মক্কাবাসীদের যুদ্ধ প্রস্তুতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। কখনও কখনও এ দলগুলোর কোন কোনটার সঙ্গে মক্কার কোন কোন কাফেলা বা অন্য কোন দলের মুখোমুখী হয়ে পড়তো। এবং কখনও কখনও পরস্পর সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটে যেত।

খৃষ্টান লেখকরা লিখেছেন যে, এই ব্যবস্থা ছিল মুহাম্মদের (সাঃ) পক্ষ থেকে উস্কানীমূলক। কিন্তু কেন ? মক্কাতে তের বৎসর ধরে মুসলমানদের উপরে যে অবর্ণনীয় জুলুম করা হয়েছিল, মদীনাবাসীদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য যে উস্কানী দেওয়া হচ্ছিল, এবং মদীনা আক্রমণের যে হুমকী দেওয়া হচ্ছিল, সে সব কিছুর মোকাবেলায় আঁ হযরত (সাঃ)-এর পক্ষ থেকে খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য গোয়েন্দা পাঠানোটা কি আদৌ কোন উস্কানী ছিল ? পৃথিবীতে কি

কোন আইন আছে, যে আইনে মক্কাতে তেরটি বছর যাবৎ নির্মমভাবে অত্যাচারিত হওয়ার পরেও মুসলমানদের পক্ষে শত্রুদের যুদ্ধপ্রস্তুতির বিরুদ্ধে কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না ? আজ পাশ্চাত্যের দেশগুলো নিজেদেরকে খুব সভ্য মনে করে। মক্কাতে যা ঘটেছিল, তার অর্ধেক ঘটনার জন্য যদি তাদের কোন জাতি আজ যুদ্ধ করে, তাহলে কি তাকে কেউ অন্যায় বলে গণ্য করবে ? যদি কোন রাষ্ট্র অপর কোন রাষ্ট্রের লোক কিংবা সেখানকার একটা জামায়াত বা জনগোষ্ঠীকে হত্যার প্রস্তুতি নেয়, তাহলে সেই জনগোষ্ঠী বা জামায়াতের কি অধিকার জন্মাবে না যে, তারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে? সুতরাং মদীনাতে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বা নতুন করে আর কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। মক্কাজীবনের ঘটনাবলীই মুসলমানদেরকে পূর্ণ অধিকার দিয়েছিল যে, তারা মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারতো। কিন্তু, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তা করেননি। তিনি ধৈর্য অবলম্বন করেছিলেন। শুধু দুশমনদের চক্রান্তের তথ্যাদি সংগ্রহ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন সকল তৎপরতা। কিন্তু, যখন মক্কাবাসীরা নিজেরাই মদীনার আরব অধিবাসীদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলতে লাগলো, মুসলমানদেরকে হজ্জ করতে বাধা দিতে লাগলো, তাদের সিরিয়ায় যাতায়াতকারী বাণিজ্য কাফেলাগুলো অন্য রাস্তার পরিবর্তে মদীনার আশে পাশের কবিলাগুলোর মধ্য দিয়ে যাতায়াত করতে লাগলো এবং সেই কবিলাগুলোর লোকেদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলতে লাগলো, তখন মদীনার প্রতিরক্ষার জন্য মুসলমানদের ফরয হয়ে পড়লো যে, তারা সেই যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে, যা মক্কাবাসীরা বরাবর চৌদ্দ বৎসর যাবৎ দিয়ে আসছিল। এতে কি দুনিয়ার কোন ব্যক্তির এই অধিকার জন্মাতে পারে যে, সে ঐ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে ?

মদীনায় ইসলামী শাসনের ভিত্তি স্থাপন

হযরত রসূলে করীম (সাঃ) যেভাবে বাইরের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখছিলেন, তেমনিভাবে তিনি মদীনার ভিতরের অবস্থা সম্বন্ধেও সচেতন ছিলেন। আমরা বলে এসেছি যে, মদীনার মুশরেকদের অধিকাংশই একান্ত আন্তরিকতার সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এজন্য রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদের মধ্যে ইসলামী পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা শুরু করে দিলেন। ইতোপূর্বে, লোকেরা আরবের প্রথা মাফিক লড়াই করে গায়ের জোরে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতো। এখন রীতিমত কাযী বা বিচারক নিয়োগ করা হলো। ফয়সালা বা

ডিক্রী ছাড়া কেউ কারও অধিকার কারও কাছ থেকে আদায় করতে পারবে না। ইতোপূর্বে মদীনার লোকদের শিক্ষার প্রতি কোনও অনুরাগ ছিল না। এখন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো শিক্ষিত ব্যক্তিরা অশিক্ষিত লোকদের লেখাপড়া শেখাবে। এছাড়াও নির্যাতন বন্ধ করা হলো, অমানবিকতা বন্ধ করা হলো। ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হলো। শরীয়ত অনুসারে ধনী ব্যক্তিদের উপরে কর ধার্য করা হলো। আদায়কৃত কর খরচ করা হতে থাকলো গরীবদের কল্যাণার্থে এবং শহরের সাধারণ অবস্থার উন্নতিকল্পে। শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা গৃহীত হলো। এতীমদের শিক্ষাদানের জন্য নিয়মিত বন্দোবস্ত করা হলো। লেনদেনের ক্ষেত্রে দলীল লেখার, সাক্ষী রাখার নিয়ম চালু করা হলো। ক্রীতদাসের উপরে বাড়াবাড়ি বন্ধ করা হলো। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যরক্ষার লক্ষ্যে ব্যবস্থাদি গৃহীত হতে লাগলো। আদম শুমারী করা হলো। গলি ও বড় রাস্তাগুলি চওড়া ও পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করা হলো। এক কথায়, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গৃহীত হলো এবং সেই সব ব্যবস্থা কার্যকর রাখার জন্য আইন কানুন প্রবর্তিত হলো। বর্বর আরবদেরকে এইবারই প্রথম বর্বরতা থেকে আইন-কানুন ও সভ্যতার আলোকের পথে উত্তীর্ণ করা হলো।

এদিকে যখন রসূলে করীম (সাঃ) আরবদের জন্য কানুন তৈরী করছিলেন এবং তার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিচ্ছিলেন-যা শুধু সেই যামানার জন্যই নয়, সকল যামানার জন্যই আবশ্যক, এবং যা কেবল তাদের জন্যই নয় বরং পৃথিবীর সকল জাতির সম্মান, শান্তি ও উন্নতির জন্য উপযোগী ও অপরিহার্য ছিল, তখন, ওদিকে মক্কাবাসীরা ইসলামের বিরুদ্ধে রীতিমত যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল। যার ফলে, সংঘটিত হয় বদর যুদ্ধ।

কোরেশদের বাণিজ্য কাফেলার আগমন এবং বদর যুদ্ধ *

হিজরতের পর ত্রয়োদশ মাসে সিরিয়া থেকে মক্কার একটি বাণিজ্য কাফেলা আসছিল। আবু সুফিয়ান ছিলেন এই কাফেলার নেতা। এই কাফেলা পাহাড়া দেওয়ার বাহানায় মক্কাবাসীরা একটি বৃহৎ সৈন্যদল নিয়ে মদীনার পাশ দিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাপারটা রসূলে করীম (সাঃ) জানতে পারেন। এবং এ

---

* *ইবনে হিশাম ঃ ২য় খণ্ড; পৃষ্ঠা-৯*

ব্যাপারে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেও তাঁর উপরে ওহী করে বলা হয় যে, এখন সময় এসে গেছে, দুশমনকে তাদের জুলুমের জওয়াব অস্ত্রের মাধ্যমেই দিতে হবে। সুতরাং তিনি কয়েকজন সঙ্গীসহ মদীনা থেকে বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু যখন তিনি মদীনা থেকে বের হচ্ছিলেন তখনও পর্যন্ত এটা পরিষ্কার ছিল না যে, সংঘর্ষ কাদের সঙ্গে হবে, কাফেলার সঙ্গে, না কি মক্কার সেনাবাহিনীর সঙ্গে ? এজন্য মাত্র তিন শ' লোক তাঁর সঙ্গে মদীনা থেকে রওয়ানা হলেন।

এটা মনে করলে ভুল করা হবে যে, কাফেলার অর্থ শুধু মাল-বোঝাই উটের পাল। বরং মক্কাবাসীরা এই কাফেলাগুলোর সঙ্গে সঙ্গে এক একটা করে শক্তিশালী সেনাদলও পাঠাতো। কেননা, তারা মনে করতো যে, এই সব কাফেলার দ্বারাই মুসলমানদেরকে তারা পরাভূত করে ফেলবে। তাই, এই কাফেলাটির আগের এমন আরও দু'টো কাফেলার উল্লেখ আছে ইতিহাসে যার একটি রক্ষার জন্যই নিয়োজিত করা হয়েছিল দু'শ সৈন্য এবং দ্বিতীয়টির জন্য তিন শ' সৈন্য। কাজেই, এই পরিস্থিতিতে খৃষ্টান লেখকদের এই কথা লেখা যে, তিন শ' সৈন্য নিয়ে তিনি (সাঃ) মক্কার একটি অরক্ষিত কাফেলা লুট করার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন, স্রেফ মিথ্যা এবং ধোকা ছাড়া আর কি? এই কাফেলাটি যেহেতু অনেক বড় ছিল, সেহেতু আগের কাফেলা দু'টো রক্ষার ব্যবস্থা দেখে সহজেই অনুমান করা যায় যে, এটার সাথে অন্ততঃ চার/পাঁচ শ' সশস্ত্র আরোহী সৈন্য অবশ্যই ছিল। যে কাফেলার সঙ্গে এত বিরাট একটা নিরাপত্তা বাহিনী ছিল, সেটাকে মাত্র তিনশ' লোকের একটা মুসলিম সেনাদল (যাদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় অস্ত্র-শস্ত্র পর্যন্ত ছিল না) লুট করার উদ্দেশ্যে এসেছিল, এমন কথা বলাটা নিঃসন্দেহে চরম বেইনসাফী এবং চরম বিদ্বেষপ্রসূত। যদি শুধু এই কাফেলাটার কথাই ধরা হয়, তাহলেও সেটার সঙ্গে সংঘর্ষকেও যুদ্ধই বলতে হবে। এবং বলতে হবে যে, সেই যুদ্ধ ছিল মুসলমানদের আত্মরক্ষামূলক। কেননা মদীনার সেনাদল ছিল অনেক দুর্বল। এবং এই সেনাদল কেবল সেই ফেৎনাকেই দূর করার জন্য এসেছিল, যে ফেৎনার মধ্যে আশেপাশের কবিলাগুলোকে শামিল করা হচ্ছিল। এবং তাদেরকে দুষ্কৃতির জন্য একত্র করেই মক্কার কাফেলাগুলো ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করছিল। কোরআন করীম থেকে জানা যায় যে, ঐশী ইচ্ছাও এটাই ছিল যে, কাফেলা নয় বরং মক্কার আসল সেনাবাহিনীর সাথেই মোকাবেলা হোক। এবং স্রেফ মুসলমানদের আন্তরিক সততা ও তাদের ঈমানকে প্রকাশ্যে তুলে ধরার উদ্দেশ্যেই প্রথমে বিষয়টাকে প্রকাশ করা হয়নি। যখন মুসলমানরা পূর্ণ প্রস্তুতি ছাড়াই মদীনা থেকে বের হয়ে এলো, তখন কিছু দূর গিয়ে রসূলে করীম (সাঃ) সাহাবীদের কাছে প্রকাশ করলেন যে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা এটাই যে, মক্কার আসল সেনাবাহিনীর সঙ্গেই যুদ্ধ হবে। সৈন্য-সামন্তের ব্যাপারে

মক্কা থেকে যেসব খবরাখবর এসে পৌঁছুচ্ছিল, তা থেকে বুঝা যাচ্ছিল যে, তাদের সৈন্য সংখ্যা এক হাজারের কিছু বেশী হবে। তারা সকলেই ছিল পুরাদস্তুর সুদক্ষ সশস্ত্র সৈন্য। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সঙ্গে আগমনকারী লোকদের সংখ্যা ছিল ৩১৩ (তিন শ' তের)। তাদের মধ্যে এমন অনেকে ছিল যারা যুদ্ধের কলা-কৌশল সম্পর্কে আদৌ কিছু জানতো না। তাছাড়া, যুদ্ধ-সামগ্রী বলতেও তাদের কাছে তেমন কিছুই ছিল না। প্রায় সবাই ছিলেন পদচারী এবং কিছু উটের আরোহী। ঘোড়া ছিল মাত্র একটি, (কারো কারো মতে দু'টি)। এই ছোট্ট একটি সেনাদল, যাদের না ছিল যুদ্ধের কোন অভিজ্ঞতা, না ছিল অস্ত্রশস্ত্র, না যুদ্ধের রসদপাতি, তাদের পক্ষে তাদের তিন গুণের অধিক সংখ্যক অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত একটি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা নিঃসন্দেহে দারুণ ঝুঁকিপূর্ণ কাজ ছিল। এজন্য আঁ হযরত (সাঃ) এটা চাননি যে, কোন ব্যক্তিকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে বাধ্য করা হোক। কাজেই তিনি তাঁর সঙ্গীদেরকে ডেকে বললেন যে, এখন কাফেলার কোন প্রশ্ন নেই, এখন সেনাবাহিনীর সঙ্গেই মোকাবেলা করতে হবে। এবং তিনি তাঁদেরকে এ ব্যাপারে পরামর্শ দিতে বললেন।

একের পর এক মুহাজের খাড়া হচ্ছিলেন এবং বলছিলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! দুশমন যদি আমাদের বাড়ীঘরে পর্যন্ত আক্রমণ করে, তথাপি আমরা ভয় পাব না। আমরা তাদের মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত।' তিনি (সাঃ) তাঁদের প্রত্যেকের কথা শুনছিলেন এবং বলছিলেন, 'আমাকে আরও পরামর্শ দাও, আরো পরামর্শ দাও।' এতক্ষণ পর্যন্ত মদীনার লোকেরা চুপচাপ বসেছিলেন এই ভেবে যে, আক্রমণকারী সেনাবাহিনী তো মুহাজেরদের আত্মীয়স্বজন, তাই তাদের আশংকা ছিল, এমনটা আবার না হয় যে, তাদের কথায় মুহাজেররা মনে কষ্ট পায়। যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বারবার বলতে থাকলেন, 'আমাকে পামর্শ দাও, আমাকে পরামর্শ দাও'। তখন একজন আনসার সর্দার খাড়া হলেন এবং নিবেদন করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্। পরামর্শ তো আপনাকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু, তবু আপনি যখন বারবার পরামর্শ চাচ্ছেন, তাতে মনে হচ্ছে যে, আপনার লক্ষ্য হচ্ছে মদীনার বাসিন্দারা। তিনি (সাঃ) বললেন, 'হ্যাঁ, তাই'। সেই আনসার সর্দার জওয়াব দিলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! হতে পারে, আপনি এইজন্য আমাদের কাছে পরামর্শ চাচ্ছেন যে, আপনার মদীনা আগমনের পূর্বে আপনার এবং আমাদের মধ্যে একটা অঙ্গীকার হয়েছিল, এবং সেই অঙ্গীকার ছিল এই যে, যদি মদীনার ভিতরে আপনার এবং মুহাজেরদের উপরে কেউ কখনও আক্রমণ করে, তাহলে আমরা আপনাদেরকে রক্ষা করবো। কিন্তু এখন, এই সময়ে, আপনি মদীনা থেকে বাইরে এসেছেন, তাই সেই অঙ্গীকার এই পরিস্থিতিতে এই খানে কার্যকর নয়। ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যে সময়ে ঐ অঙ্গীকার করা হয়েছিল সেই সময় পর্যন্ত

আপনার সত্যতা আমাদের কাছে সুস্পষ্টভাবে পূরোপূরি প্রকাশিত হয়নি, কিন্তু এখন যখন আপনার মর্তবা-মর্যাদা এবং শান ও সত্যতা আমাদের কাছে পূরোপূরি প্রকাশিত হয়েছে তখন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ঐ সব অঙ্গীকার-ফঙ্গীকারের কোন প্রশ্ন আর নেই, আমরা মূসা (আঃ)-এর সঙ্গীদের ন্যায় আপনাকে কখনই বলবো না যে,

اَذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هٰهُنَا

'তুমি আর তোমার প্রভু যাও এবং শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকো, আমরা এখানেই থাকবো।' বরং আমরা আপনার ডানে যুদ্ধ করবো, আপনার বামে যুদ্ধ করবো, আপনার সামনে যুদ্ধ করবো, আপনার পিছনে যুদ্ধ করবো। এবং হে আল্লাহ্র রসূল! যে দুশমন আপনার ক্ষতিসাধন করতে এসেছে তারা আপনাকে স্পর্শ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা আমাদের লাশের উপর দিয়ে যাবে। হে আল্লাহ্র রসূল! যুদ্ধ তো একটা মামুলী ব্যাপার। এখান থেকে কিছু দূরেই সমুদ্র, আপনি যদি হুকুম দেন, তোমরা তোমাদের ঘোড়া নিয়ে ঐ সমুদ্রে ঝাঁপ দাও, আমরা তৎক্ষণাৎ ঘোড়াসহ সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়বো।' *

এই ছিল সেই আত্মোৎসর্গ ও সততার দৃষ্টান্ত যার তুলনা পূর্ববর্তী কোন নবীই পেশ করতে পারবেন না। মূসা (আঃ)-এর সঙ্গীদের দৃষ্টান্ত তো তারা নিজেরাই দিয়েছেন। হযরত ঈসা (আঃ)-এর অনুসারী হাওয়ারীরা শত্রুর মোকাবেলায় যে নমুনা দেখিয়েছিলেন তার সাক্ষী ইঞ্জিল। একজন তো মাত্র কয়েক টাকার বিনিময়ে নিজের ওস্তাদকে বিক্রী করে দিল; আর একজন তো তাঁর উপরে অভিশাপ দিয়ে গেল। এবং বাকী দশজন তাঁকে ছেড়ে এদিকে সেদিকে চলে গেল। পক্ষান্তরে মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সঙ্গীগণ মাত্র দেড় বৎসরের সংসর্গেই ঈমানে এতবেশী দৃঢ়তা অর্জন করেছিলেন যে, তাঁরা তাঁর (সাঃ) হুকুমে অথৈ সমুদ্রের মধ্যেও ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত।

উক্ত পরামর্শ শুধু এ কারণেই গ্রহণ করা হয়েছিল যে, যেন দুর্বল ঈমানের লোকদেরকে ফেরৎ পাঠানো যায়। কিন্তু সকল মুহাজের ও আনসার একে অপরের চাইতে অধিকতর দৃঢ়তা ও ঈমানের পরিচয় দান করলেন এবং উভয় তরফই এই বিষয়ে ঐকমত্য প্রকাশ করলেন যে, তারা খোদার ওয়াদা মোতাবেক সংখ্যায় শত্রুর তুলনায় নগণ্য হওয়া সত্ত্বেও, এবং তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধ-সামগ্রী শত্রুর তুলনায় কয়েক গুণ কম হওয়া সত্ত্বেও, যুদ্ধে কখনই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবেন

---

* *ইবনে হিশাম ঃ ২য় খণ্ড; পৃষ্ঠা-১২*

না। বরং খোদাতায়ালার ধর্মের সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করতে করতে যুদ্ধের ময়দানে হাসিমুখে প্রাণ বির্সজন দিবেন। অতঃপর তিনি (সাঃ) সম্মুখ পানে অগ্রসর হলেন। যখন তিনি বদর প্রান্তরে পৌছলেন তখন একজন সাহাবীর পরামর্শ অনুযায়ী শত্রুপক্ষের কাছাকাছি উপনীত হয়ে বদরের ঝরণার পাশে সৈন্য দলের শিবির স্থাপন করলেন। এতে পানি তো আয়ত্বের মধ্যে এলো, কিন্তু প্রান্তরের যে দিকটায় মুসলমানরা শিবির স্থাপন করলেন সে দিকটা বালুকাময় হওয়ার দরুন যুদ্ধ পরিচালনার জন্য দারুণ অনুপযোগী বিবেচিত হলো। ফলে, সাহাবাগণ (রাঃ) কিছুটা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। রসূল করীম (সাঃ) সারা রাত ধরে দোয়া করতে থাকলেন, এবং বার বার খোদাতায়ালার কাছে আকুতি জানাতে থাকলেনঃ

'হে আমার প্রভু! সারা পৃথিবীর উপরে মাত্র এই ক'টি লোকই তোমার এবাদতকারী।

হে আমার প্রভু! যদি এই লোক ক'টি আজ এই যুদ্ধে মারা যায়, তাহলে তোমার নাম নেওয়ার মত আর কে থাকবে এই ভূপৃষ্ঠে ?' *

আল্লাহ্তায়ালা তাঁর দোয়া কবুল করলেন এবং রাত্রে প্রচুর বৃষ্টি হলো। যার ফলে, যে ময়দানে মুসলিম সেনারা ছাউনী ফেলেছিল তা বালুময় থাকার দরুন বৃষ্টি হওয়ার ফলে জমে গিয়ে শক্ত হয়ে গেল, এবং ময়দানের যে এলাকাটা কাফেরদের আয়ত্বে ছিল তা এঁটেল মাটি হওয়ার কারণে বৃষ্টি পড়ে পিচ্ছিল হয়ে গেল। হতে পারে যে, মক্কার কাফেররা ঐ প্রান্তরে পূর্বেই পৌছে গিয়ে ঐ এলাকাটা এজন্যই বেছে নিয়েছিল যে, মাটি শক্ত হওয়ার দরুন সেখান থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করা বেশী সুবিধাজনক হবে। এবং সম্মুখের বালুকাময় ময়দানটা তারা এ জন্যই খালি রেখে দিয়েছিল যে, ভাল জায়গা না পেয়ে মুসলমানরা ওখানেই তাদের শিবির স্থাপন করবে, এবং যুদ্ধ করার সময় ওদের পা বালুর মধ্যে জোর পাবে না বরং ভস্ ভস্ করে ডুবে যাবে। কিন্তু, আল্লাহ্তা'লা রাতারাতি অবস্থাটা পাল্টিয়ে দিলেন। বালুকাময় ময়দান একটি জমাট মাটির শক্ত ময়দান হয়ে গেল এবং শক্ত ময়দান পিচ্ছিল জমিনে পরিণত হলো। রাত্রে আল্লাহ্তায়ালা রসূলে করীম (সাঃ)-কে শুভ সংবাদ দিলেন এবং বললেন যে, তোমার অমুক অমুক দুশমন মারা যাবে এবং তারা অমুক অমুক জায়গায় মারা পড়বে। বস্তুতঃ সেটাই ঘটলো যুদ্ধে। এবং ঐ সকল শত্রু ঠিক সেই সেই জায়গাতেই মারা পড়লো, যে যে জায়গার কথা তিনি বলেছিলেন। যখন সৈন্যরা

---

* *যুরকানী ঃ ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪১৯ ও ইবনে হিশাম ঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৭*

অপরের মুখোমুখি হয়ে সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হয়েছিল, তখন সাহাবারা (রাঃ) যে এখলাস ও সত্যনিষ্ঠার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিলেন তা নিম্নে বর্ণিত একটা ঘটনা থেকেই পরিষ্কার বুঝা যাবে।

ইসলামী সেনাদলে মাত্র কয়েকজন জেনারেল ছিলেন। তাঁদের একজন ছিলেন হযরত আব্দুর রহমান বিন আওফ (রাঃ) তিনি ছিলেন মক্কার একজন সর্দার। তিনি বর্ণনা করেছেনঃ

'আমি মনে মনে চিন্তা করলাম যে, আমার উপরে আজ ভীষণ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। এই ধারণা থেকে আমি আমার ডানে ও বামে তাকালাম এবং আমি দেখলাম যে, আমার ডানে বামে মদীনার দু'টি নওজোয়ান ছেলে ছাড়া আর কেউই নেই। এতে আমি রীতিমত দমে গেলাম এবং আমি ভাবলাম, তেজস্বী জেনারেলদের যুদ্ধ করার সময় যা প্রয়োজন, তা হচ্ছে তাদের ডানে ও বামে রক্ষণ ব্যবস্থা সুদৃঢ় থাকতে হবে, যাতে তারা সাহসিকতার সঙ্গে শত্রুসৈন্যের ব্যূহ ভেদ করে এগিয়ে যেতে পারে। কিন্তু আমার পাশে তো মদীনার দু'টি আনাড়ী ছেলে মাত্র। আমি আজ কীভাবে আমার যুদ্ধ-কৌশল কাজে লাগাবো। আমি এটা মনে মনে ভেবেই সারিনি ঠিক তক্ষুণি আমার এক পাশের খাড়া ছেলেটি আমার পাঁজরে কনুই মারলো, আমি তার দিকে ফিরতেই সে আমার কানে কানে বললো, 'চাচা, আমি শুনেছি, আবু জাহল রসূলুল্লাহ্(সাঃ)-কে খুব কষ্ট দিত। চাচা, আমার প্রাণ চাচ্ছে যে, আমি আজ তার সাথে মোকাবেলা করি। আপনি বলুন তো কোন লোকটা আবু জাহল ?' আমি তার কথার জওয়াব দিতে না দিতেই আমার অপর পার্শ্বের ছেলেটি আমাকে কনুই মারলো। তার দিকে যখন ফিরলাম, তখন সেও ফিস্ ফিস্ করে ঐ একই কথা বললো।

আব্দুর রহমান বিন আওফ বলছেন,

'আমি তাদের এই দুঃসাহস দেখে তাজ্জব বনে গেলাম। কেননা, নিজে একজন ট্রেনিংপ্রাপ্ত সৈনিক হওয়া সত্ত্বেও,আমি এটা চিন্তাই করতে পারি না যে, সেনাবাহিনীর কমান্ডারের উপর একলা গিয়ে আক্রমণ করা সম্ভব।'

তিনি বলছেন, 'আমি তাদের কথার উত্তরে অঙ্গুলী উঠায়ে দেখিয়ে দিলাম, ঐ যে, ঐ লোকটা, যে মাথা থেকে পা পর্যন্ত যুদ্ধসাজে সুসজ্জিত এবং শত্রু সেনার সারির পিছনে দাঁড়িয়ে আছে এবং যার সামনে দুজন তেজস্বী জেনারেল নাংগা তরবারি নিয়ে খাড়া, ঐ লোকটাই আবু জাহল'। তিনি (রাঃ) বলছেন,

'আমি আমার অঙ্গুলি নামায়ে সারিনি, এর মধ্যেই ঐ ছেলে দুটো, বাজ যেভাবে চড়ুই পাখির উপরে ছোঁ মারে ঠিক সেইভাবে সোঁ করে কাফেরদের ব্যূহ

ভেদ করে ঢুকে পড়লো। তাদের এই হামলা এত আকস্মিক এবং এত ত্বরিৎ ছিল যে, কেউ তাদের উপরে তরবারি উঠাবার সময়ই পেল না। তারা তীর বেগে আবু জাহলের কাছে পৌঁছে গেল। তার দেহরক্ষীরা ওদের উপরে আঘাত হানলো, একজনের আঘাত ফসকে গেল, আর একজনের আঘাতে একটি ছেলের হাত কাটা গেল। কিন্তু তারা উভয়ে কোন কিছুর তোয়াক্কা না করে সরাসরি আবু জাহলকে আক্রমণ করলো। এবং এত জোরে আঘাত হানলো যে, সে মাটিতে পড়ে গেল, এবং তারা উভয়ে তাকে মারাত্মকভাবে আহত করলো। কিন্তু, তরবারি চালানোর কৌশল জানা না থাকার কারণে তাকে কতল করতে পারলো না।'

এই ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, মক্কাবাসীরা যে সব জুলুম অত্যাচার মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উপর করতো তা যে কত ভয়ঙ্কর ছিল, তা কেবল তারাই জানতো যারা তা দেখতো কাছে থেকে। আজও সেই সকল অত্যাচারের কাহিনী পাঠ করলে যে কোন ভদ্র লোকের হৃদয়ে কাঁপন শুরু হয়ে যায়, শরীর শিহরিত হয়ে ওঠে। মদীনার লোকেরা তো ঐ সকল অত্যাচারের কাহিনী তাদের মুখ থেকেই শুনতো যারা নিজের চোখে দেখেছে ঐ সব নিষ্ঠুর অত্যাচার। তারা একদিকে রসূলে করীম (সাঃ)-এর পবিত্র ও শান্তিপ্রিয় জীবনকে দেখছিল, এবং অপর দিকে মক্কাবাসীদের অমানুষিক বর্বর অত্যাচারের কাহিনী শুনছিল, ফলে তাদের হৃদয় দুঃখব্যথায় ভরে যেত। তারা মনে মনে ভাবতো যে, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তো নিজের শান্তিপ্রিয় ও কল্যাণকামী মানসিকতার কারণে তাদের কোন জওয়াব দিতেন না। কিন্তু, ওরা যদি আমাদের সামনে এসে যেত, তাহলে আমরা দেখিয়ে দিতাম যে, ওদের অত্যাচারের জওয়াব যে দেওয়া হতো না, তার কারণ এই ছিল না যে, মুসলমানরা দুর্বল ছিল। বরং তার কারণ এটাই ছিল যে, খোদাতায়ালার তরফ থেকে তখন মুসলমানদের প্রতি ওর জওয়াব দেওয়ার অনুমতি ছিল না। মুসলমানদের হৃদয়ের অবস্থার অনুমান এখেকেও করা যায় যে, যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে আবু জাহল এক বেদুঈন সরদারকে এইজন্য পাঠিয়েছিল যে, সে যেন আন্দাজ করে আসে যে, মুসলমানদের সংখ্যা কত হতে পারে। সে ফিরে গিয়ে বলেছিল যে, তিনি শ' সোয়া তিন শ' হবে। এতে আবু জাহল এবং তার সঙ্গীরা খুবই উল্লসিত হয়ে উঠলো এবং বললো, 'এবার মুসলমানরা আমাদের হাত থেকে বেঁচে যাবে কোথায়?' কিন্তু ঐ লোকটা বললো, 'হে মক্কাবাসীরা! তোমাদের জন্য আমার নসিহত হচ্ছে, তোমরা ওদের সঙ্গে যুদ্ধ করার কথা ছেড়ে দাও। কেননা, আমি মুসলমানদের যত জনকে দেখেছি- দেখে আমার মনে হয়েছে যে, উটগুলোর উপরে কোন জীবিত লোক বসা নেই, মোর্দারা বসে আছে'। অর্থাৎ ওদের প্রত্যেকটি লোক মরবার জন্যই ময়দানে এসেছে,

জীবিত ফিরে যাওয়ার জন্য আসেনি এবং যারা মৃত্যুকে নিজেদের জন্য বরণ করে নেয় এবং মৃত্যুর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায় তাদের সঙ্গে মোকাবেলা না করাই উচিত'।

একটি শক্তিশালী ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হলো

যখন যুদ্ধ আসন্ন হয়ে এলো তখন রসূলে করীম (সাঃ), যে স্থানে বসে বসে প্রার্থনা করতেন সেই স্থান থেকে বের হয়ে এলেন এবং বললেন,

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ

অর্থাৎ - শত্রুর সেনাদল পর্যুদস্ত হয়ে যাবে। এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পলায়ন করবে।

এই ভবিষ্যদ্বাণী ছিল কোরআন করীমের, যা ইতোপূর্বেই অবতীর্ণ হয়েছিল মক্কাতে, এই যুদ্ধ সম্পর্কে। মক্কাতে যখন মুসলমানরা কাফেরদের অত্যাচারে জর্জরিত হচ্ছিল, এবং এদিকে সেদিকে হিজরত করে চলে যাচ্ছিল তখন আল্লাহ্তায়ালা কোরআন করীমে রসূল করীম (সাঃ)-এর উপরে নাযিল করেছিলেন এই আয়াতঃ

وَلَقَدْ جَآءَ اٰلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ۝ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كُلِّهَا فَاَخَذْنٰهُمْ اَخْذَ عَزِيْزٍ مُّقْتَدِرٍ ۝
اَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ اُولٰٓئِكُمْ اَمْ لَكُمْ بَرَآءَةٌ فِى الزُّبُرِ ۝ اَمْ يَقُوْلُوْنَ نَحْنُ جَمِيْعٌ
مُّنْتَصِرٌ ۝ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ ۝ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ
اَدْهٰى وَاَمَرُّ ۝ اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِىْ ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ ۝ يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِى النَّارِ عَلٰى
وُجُوْهِهِمْ ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ ۝

"এবং ফেরাউনের জাতির কাছেও সতর্ককারীগণ এসেছিল। তারা আমাদের সকল নিদর্শনকে মিথ্যা বলে অস্বীকার করেছিল। ফলে আমরা এক মহা পরাক্রমশালী শক্তিধরের ধৃত করার ন্যায় তাদেরকে ধৃত করেছিলাম। (হে মক্কাবাসীগণ!) তোমাদের কাফেরগণ কি ওদের চাইতে অধিকতর উত্তম ? অথবা পূর্ববর্তী কেতাবসমূহে কি তোমাদের জন্য (আযাব থেকে) নিষ্কৃতি লিখা আছে ?

তারা কি বলে, 'আমরা বিজয়ীদল।' অচিরেই সেই দলকে পরাভূত করা হবে। এবং তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করবে। বরং (তাদের ধ্বংসের) সেই মুহূর্ত তাদের সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুত মুহূর্ত, বস্তুতঃ সেই মুহূর্ত অত্যন্ত ধ্বংসকারী এবং তিক্ত। নিশ্চয় অপরাধীরা পথভ্রষ্টতা ও উন্মাদনায় আক্রান্ত। যেদিন তাদেরকে অধোমুখী করে আগুনের মধ্যে ছ্যাঁচড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে (এবং বলা হবে) 'তোমরা জাহান্নামের স্পর্শ-স্বাদ আস্বাদন কর।" *(সূরা কমর, রুকূ ৩)।*

এই আয়াতগুলি সূরা কমরের। এবং সকল বর্ণনাকারীর মতে সূরা কমর নাযিল হয়েছিল মক্কায়। মুসলিম আলেমরাও বলেছেন যে, এই সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছিল নবুওয়তের পাঁচ থেকে দশ বছরের মধ্যে অর্থাৎ হিজরতের অন্ততঃ তিন বছর পূর্বে। বরং ইউরোপীয় লেখকরা বলেন আট বছর পূর্বে। নোলডিকী বলেন, এই সূরা অবতীর্ণ হয়েছে নবুওয়তের পাঁচ বছর পরে। হুয়েরী লিখেছেন আমার মতে নোলডিকী এই সূরা অবতীর্ণের সময়কাল কিছুটা এগিয়ে বলেছেন। তাঁর বিবেচনায় এই সূরা হিজরতের ছয়/সাত বছর পূর্বেই অবতীর্ণ হয়েছিল যার অর্থ হচ্ছে, তাঁর মতে নবুওয়তের দাবীর ছয়/সাত বছর পরেই সুরাটি নাযিল হয়েছে। যাহোক, মুসলমানদের শত্রুরাও বলছে যে, এই সূরা নাযিল হয়েছে হিজরতের কয়েক বৎসর পূর্বেই। সেই সময়েই কত সুস্পষ্টরূপে এই যুদ্ধের সংবাদ দেওয়া হয়েছিল। এবং কাফেরদের পরিণতির কথাও বলা হয়েছিল পরিষ্কারভাবে। এবং কত প্রকাশ্যভাবে রসূলে করীম (সাঃ) বদরের যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বেই এই আয়াত পাঠ করে মুসলমানদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করেছিলেন যে, আল্লাহ্তায়ালার অঙ্গীকার পূর্ণ হওয়ার সময় এসে গেছে।

যেহেতু, ঐ সময় এসে গিয়েছিল, যার খবর যিশাইয় নবী বহু পূর্বেই দিয়ে গিয়েছিলেন (২১ঃ ১৩-১৭), এবং যার খবর পুনরায় কোরআন করীমে যুদ্ধ শুরুর ছয় অথবা আট বছর পূর্বে দেওয়া হয়েছিল, সেহেতু মুসলমানদের এই যুদ্ধের জন্য কোন প্রস্তুতি না থাকা সত্ত্বেও, এবং কাফেরদেরকে এই যুদ্ধ না করার পরামর্শ দেওয়া সত্ত্বেও, যুদ্ধ হয়ে গেল; এবং মাত্র ৩১৩ জন লোক, যাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন যুদ্ধ বিদ্যায় অদক্ষ, অনভিজ্ঞ এবং যাদের নিকটে তেমন কোন যুদ্ধাস্ত্র বা যুদ্ধ-সামগ্রীও ছিল না, তারা কাফেরদের যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী এক সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ সেনাবাহিনী- যাদের সংখ্যা ছিল এক হাজারের উপরে- তাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়ে গেল, এবং এই অসম যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে গেল। এবং কয়েক ঘন্টার মধ্যেই আরবের বীর যোদ্ধারা পরাস্ত ও নিহত হলো। যিশাইয় নবীর (আঃ) ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক, 'কেদারের শক্তি ও প্রতাপ পিষ্ট হয়ে গেল'। এবং মক্কার সেনাবাহিনী কিছু লাশ ও কিছু যুদ্ধবন্দী পিছনে ফেলে উর্ধ্ব শ্বাসে মক্কার

দিকে পালিয়ে গেল। মক্কার যে সকল যোদ্ধা গ্রেফতার হয়েছিল, তাদের মধ্যে ছিলেন রসূলে করীম (সাঃ)-এর চাচা আব্বাস (রাঃ) যিনি সর্বদা আঁ হযরত (সাঃ)-কে সহায়তা দান করছিলেন। তাঁকে বাধ্য করেছিল মক্কাবাসীরা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে। তেমনিভাবে কয়েদীদের মধ্যে রসূলে করীম (সাঃ)-এর বড় মেয়ের স্বামী আবুল আসও ছিলেন। এবং যারা মারা গিয়েছিল তাদের মধ্যে ছিল মক্কার সেনাবাহিনীর কমাণ্ডার ইসলামের সব চাইতে বড় দুশমন আবু জাহল।

বদরের যুদ্ধবন্দী *

বদরের যুদ্ধের এই বিজয়ে রসূলে করীম (সাঃ) খুশীও হয়েছিলেন। কেননা, যে ভবিষ্যদ্বাণী চৌদ্দ বৎসর যাবৎ তাঁর মাধ্যমে প্রকাশ করা হচ্ছিল, যে ভবিষ্যদ্বাণীগুলি পূর্ববর্তী নবীগণ এই দিনের সম্পর্কে করেছিলেন, তা সবই পূর্ণ হয়ে গেল। কিন্তু, মক্কার বিরুদ্ধবাদীগণের ভয়াবহ পরিণতিও ছিল তাঁর চোখের সামনে। তাঁর জায়গায় যদি অন্য কেউ হতো তাহলে সে আনন্দে উল্লসিত হয়ে লাফাতো। কিন্তু, যখন তাঁর সামনে দিয়ে মক্কার যুদ্ধবন্দীদেরকে রশি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন তাঁর এবং তাঁর প্রিয় সাথী আবুবকর (রাঃ)-এর চক্ষু থেকে দরদর করে অশ্রু ঝরছিল। এই সময় হযরত উমর (রাঃ) যিনি পরে তাঁর দ্বিতীয় খলীফা হয়েছিলেন, সম্মুখে এলেন এবং আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে, এত বড় বিজয় ও খুশীর পরেও আঁ হযরত (সাঃ) কাঁদছেন কেন ! তিনি বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকেও বলুন এ সময় কান্নার কি কারণ হলো? এবং তা যদি আমার জন্যেও কান্নার কারণ হয়, তাহলে আমিও কাঁদবো। অন্ততঃ আপনার কান্নার ভাগী হয়ে চোখমুখে কান্নার ভংগী করবো।' তিনি (সাঃ) বললেন, 'দেখতে পাচ্ছ না, আল্লাহ্তায়ালার নাফরমানী করার জন্য আজ মক্কাবাসীদের অবস্থা কী হয়ে গেছে?' তাঁর (সাঃ) ইনসাফ ও তাঁর ন্যায়পরায়ণতার- যে খবর যিশাইয় নবী বার বার নিজের ভবিষ্যদ্বাণীতে দিয়ে গেছেন, এই ঘটনা তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

মদীনায় ফিরে আসার পথে রাত্রিতে যখন তিনি (সাঃ) ঘুমাবার জন্য শুয়ে পড়লেন, তখন সাহাবারা (রাঃ) দেখতে পেলেন যে, তিনি ঘুমাতে পারছেন না। শেষে তাঁরা ভেবে চিন্তে বুঝতে পারলেন যে, তাঁর চাচা আব্বাস যেহেতু রশি দিয়ে বাঁধা অবস্থায় থাকার দরুন শুইতে পারছেন না, এবং যেহেতু তার কষ্টজনিত গোঙ্গানির শব্দ শোনা যাচ্ছিল, সেহেতু তার কষ্টের প্রতি খেয়াল করেই

---

* *আস্ সিরাতুল হালবিয়া ঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২১৯ ও যুরকানীঃ ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৪০-৪৪১*

তিনি ঘুমাতে পারছেন না। তাই, তাঁরা নিজেরা পরামর্শ করে হযরত আব্বাসের বাঁধনগুলি ঢিলা করে দিলেন। হযরত আব্বাস শুয়ে পড়লেন। এবং রসূলে করীম (সাঃ)-এর চোখেও ঘুম এসে গেল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তিনি চমকে উঠলেন, তাঁর চোখ খুলে গেল, এবং তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আব্বাস কেন চুপ হয়ে গেছে?' তার গোঙ্গানির শব্দ কেন শোনা যাচ্ছে না ?' তাঁর ভয় হচ্ছিল, কষ্টের কারণে তিনি বেহুঁশ তো হয়ে যান নি? সাহাবারা বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা আপনাকে কষ্ট পেতে দেখে ওর বাঁধন ঢিলা করে দিয়েছি। তিনি বললেন, 'না, না, এ বেইনসাফী, এ হতে পারে না। আব্বাস যেমন আমার আত্মীয়, অন্যান্য যুদ্ধবন্দীরাও তেমনি অন্যান্যদের আত্মীয়। হয় সকল বন্দীর বাঁধন ঢিলা করে দাও, যাতে তারাও আব্বাসের মত শুইতে পারে, নয়তো আব্বাসের বাঁধন আবারও শক্ত করে দাও'। সাহাবারা (সাঃ) তাঁর কথা শুনে সকল বন্দীর বাঁধন ঢিলা করে দিলেন। এবং তাদের হেফাযতের সকল দায়িত্ব নিজেদের স্বন্ধে নিয়ে নিলেন। যারা বন্দী হয়েছিল, তাদের মধ্যে যারা লেখাপড়া জানতো, তিনি (সাঃ) তাদের জন্য স্রেফ এতটুকু মুক্তিপণ ঠিক করলেন যে, তাদের প্রত্যেকে মদীনার দশটি করে ছেলেকে লিখাপড়া শেখাবে। অন্যদের মধ্যে যাদের মুক্তিপণ পরিশোধ করার মত কেউ ছিল না, তাদেরকে এমনিতেই মুক্তি দিয়ে দিলেন। যাদের মুক্তিপণ দেওয়ার আর্থিক সামর্থ্য ছিল তাদের কাছে পরিমিতভাবে মুক্তিপণ নিয়ে তাদেরকে মুক্ত করে দিলেন। এবং এই পন্থা অবলম্বন করে তিনি আদিকাল থেকে চলে আসা যে প্রথা, অর্থাৎ যুদ্ধবন্দীদেরকে ক্রীতদাসে পরিণত করার যে প্রথা, তা উচ্ছেদ করে দিলেন।

'ওহোদ' এর যুদ্ধ

কাফেরদের সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেল বটে, কিন্তু যাওয়ার সময় এই ঘোষণাও দিয়ে গেল যে, তারা আগামী বছর পুনরায় মদীনা আক্রমণ করবে, এবং তাদের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিবে। বস্তুতঃ এক বছর পরেই তারা পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে মদীনা আক্রমণ করতে এলো। মক্কা বাসীদের ক্রোধের অবস্থা এই ছিল যে, বদরের যুদ্ধের পর তারা ঘোষণা দিয়েছিল যে, কোন ব্যক্তি তার মৃতের জন্য কাঁদতে পারবে না, এবং যে সব বাণিজ্য কাফেলা আসবে সেগুলোর মালমাতা মুনাফা আগামী যুদ্ধের জন্য বরাদ্দ থাকবে। অতএব, তারা পুরাদস্তুর প্রস্তুতি গ্রহণ করলো এবং আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে তিন সহস্রাধিক সৈন্যের এক সেনাবাহিনী নিয়ে মদীনা আক্রমণ করতে এলো। রসূলে করীম (সাঃ) সাহাবাগণের কাছে পরামর্শ চাইলেন, 'আমাদের কি শহরের ভিতরে থেকে যুদ্ধ

করা উচিত, না বাইরে গিয়ে ?' তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত ছিল যে, শত্রুকে আগে আক্রমণ করতে দেওয়াই উচিত, যাতে যুদ্ধ করার দায়-দায়িত্ব তাদের স্কন্ধেই বর্তায়, এবং মুসলমানরা নিজেদের ঘরে থেকে সহজেই তাদেরকে প্রতিহত করতে পারে। কিন্তু নও জোয়ান মুসলমানরা যারা বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ পায়নি এবং সেজন্য মনেমনে অস্থির ও উত্তেজিত ছিল, তারা ভাবলো যে, এবারে হয়তো তারা শহীদ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করবে। তাই, তারা বললো, 'আমাদেরকে কেন শাহাদৎ থেকে বঞ্চিত করা হবে ?' কাজেই, তিনি (সাঃ) তাদের কথা মেনে নিলেন।

পরামর্শ নেওয়ার সময় তিনি (সাঃ) একটি স্বপ্নের কথা উল্লেখ করলেন এবং বললেন, 'স্বপ্নে আমি একটি গাভী দেখলাম। আমি দেখলাম যে, আমার তরবারির ডগা ভেঙ্গে গেছে। আমি আরও দেখলাম ঐ গাভীটিকে যবাই করা হচ্ছে। এবং আবারও দেখলাম যে, আমি আমার হাতে একটা শক্ত ও সুনির্মিত বর্মের ভেতরে ঢুকায়ে দিয়েছি।* আমি আরও দেখলাম যে, আমি একটি মেষের উপরে সওয়ার হয়েছি'।** সাহাবারা (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্! আপনার এই স্বপ্নের তাবির (বাখ্যা) কি ? তিনি (সাঃ) বললেন, 'গাভী যবাই করার অর্থ হচ্ছে, আমার কোন কোন সাহাবী শহীদ হবেন। তরবারির আগা ভেঙ্গে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে, আমার আত্মীয় স্বজনদের মধ্য থেকে কোন এক বড় ব্যক্তি শহীদ হয়ে যাবেন, অথবা আমি নিজেই কোন কষ্ট পাব। এবং বর্মের মধ্যে হাত ঢোকানোর তাবীর, আমার মনে হচ্ছে- মদীনার ভিতরে থেকে যুদ্ধ করাই আমাদের জন্য সুবিধাজনক হবে। এবং মেষের উপর সওয়ার হওয়ার তাবীর মনে হচ্ছে কাফেরদের সেনাবাহিনীর কমান্ডারের উপরে আমরা বিজয় লাভ করবো। অথবা সে মুসলমানদের হাতে মারা যাবে।'

এই স্বপ্নের মাধ্যমে মুসলমানদের কাছে এটা প্রকাশ করা হয়েছিল যে, তাদের পক্ষে মদীনার ভিতরে থাকাই অধিকতর সুবিধাজনক হবে। কিন্তু, স্বপ্নের এই ব্যাখ্যা ছিল রসূলে করীম (সাঃ)-এর নিজের, এই ব্যাখ্যা ঐশী ছিল না। কাজেই, তিনি অধিকাংশের মতামতকেই গ্রহণ করলেন। এবং যুদ্ধের জন্য শহর থেকে বাইরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। যখন তিনি বাইরে এলেন, তখন নও জোয়ানরা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে বিব্রত বোধ করতে লাগলো এবং বললো,

---

* *ইবনে হিশাম ঃ ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৭৭*

** *তাবাকাত ইবনে সা'দ ঃ প্রথম কিসম, জুয ২য়, পৃষ্ঠা-২৬*

'ইয়া রসূলাল্লাহ্! আপনার পরামর্শই সঠিক। আমাদের উচিত মদীনার ভিতরে থেকেই যুদ্ধ করা।'

আঁ হযরত (সাঃ) বললেন,

'আল্লাহ্‌র নবী যখন বর্ম পরিধান করে, তখন তা আর খুলে ফেলে না। এখন যাই হোক না কেন আমরা অগ্রসর হব। তবে, তোমরা যদি ধৈর্য সহকারে কাজ করো, তাহলে তোমরা অবশ্যই আল্লাহ্‌র সাহায্য পাবে।'

এই কথা বলে তিনি (সাঃ) এক হাজার সৈন্যের এক বাহিনীসহ মদীনা ছেড়ে রওয়ানা হয়ে গেলেন। এবং কিছু দূর অগ্রসর হয়ে রাত কাটাবার জন্য শিবির স্থাপন করলেন।

আঁ হযরত (সাঃ) সব সময় এই নীতিই অবলম্বন করতেন যে, তিনি শত্রুর কাছাকাছি পৌঁছে গেলে নিজের সৈন্যদেরকে কিছু বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ দিতেন, যাতে করে সৈন্যরা তাদের যুদ্ধ-সামগ্রী ঠিক ঠাক করে নিতে পারে। ফজরের নামাযের সময় যখন তিনি বাইরে এলেন, তখন তিনি দেখতে পেলেন যে, কিছু সংখ্যক ইহুদী কবিলা তাদের সঙ্গে চুক্তির বাহানায় যুদ্ধে সাহায্য করার জন্য এসেছে। যেহেতু ইহুদীদের চক্রান্তের কথা তাঁর জানা ছিল, সেহেতু তিনি তাদের ফেরৎ যেতে বল্লেন। এতে মুনাফেক-সর্দার আব্দুল্লাহ্ বিন উবায় বিন সলুলও তার তিনশ' সৈন্যের বাহিনী সহ সঙ্গে সঙ্গে ফিরে গেল এবং সে বললো 'এখন এটা তো কোন যুদ্ধ হবে না, হবে ধ্বংসের মুখে নিজেদেরকে নিক্ষেপ করা। কেননা, নিজেদের সাহায্যকারীদেরকে যুদ্ধ থেকে বাদ দেওয়া হলো। ফল এই হলো যে, মুসলমানদের সংখ্যা দাঁড়াল মাত্র সাত শ'তে। যা সংখ্যার দিক থেকে কাফেরদের সৈন্যসংখ্যার এক চতুর্থাংশেরও কম। এবং যুদ্ধ-সামগ্রী আরও কম কেননা, কাফেরদের বর্মধারী সৈন্যের সংখ্যাই ছিল সাত শ'। পক্ষান্তরে, মুসলমানদের বর্মধারী সৈন্যের সংখ্যাছিল মাত্র এক শ'। এছাড়া, কাফেরদের ছিল দু'শত ঘোড়-সওয়ার। অপরদিকে, মুসলমানদের ছিল মাত্র দু'টি ঘোড়া।

যাহোক, আঁ হযরত (সাঃ) ওহোদ প্রান্তরে পৌঁছে গেলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি একটি গিরিপথ পাহারা দেওয়ার জন্য পঞ্চাশ জন্য সৈন্যের একটি দলকে মোতায়েন করলেন, এবং তাদের কমান্ডারকে বার বার জোর দিয়ে বললেন, 'এই গিরিপথ এতো গুরুত্বপূর্ণ যে, আমরা এদিকে মরি বা বাঁচি, তোমরা কিছুতেই এই স্থান ত্যাগ করবে না'।* অতঃপর, তিনি বাদবাকী সাড়ে ছয় শত সৈন্য নিয়ে

---

* *ইবনে হিশাম ঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৮*

শত্রুর মোকাবেলার জন্য বেরিয়ে পড়লেন। এক্ষণে তাঁর সৈন্যসংখ্যা দাঁড়ালো শত্রুসৈন্যের প্রায় এক পঞ্চমাংশ। যুদ্ধ শুরু হলো। এবং আল্লাহ্‌তায়ালার সাহায্যে ও সহায়তায় কিছুক্ষণের মধ্যেই সাড়ে ছয় শ' মুসলিম সৈন্যের কাছে মক্কার তিন হাজার সুদক্ষ ও অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত যোদ্ধা পরাজয় বরণ করলো এবং যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে প্রাণের ভয়ে উর্ধ্বশ্বাসে পালাতে লাগলো।

বিজয় পরাজয়ে পরিণত হলো

মুসলমান সৈন্যরা পলায়নপর সৈন্যদের পশ্চাদ্ধাবন করতে লাগলো। যে সকল সৈন্য গিরিপথ পাহারায় নিয়োজিত ছিল তারা তাদের কমান্ডারকে বললো, 'এখন তো শত্রু পরাজিত হয়ে গেছে, এখন আমাদেরকেও পুণ্য অর্জন করতে দেওয়া হোক।' কমান্ডার তাদেরকে বারণ করলেন। এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নির্দেশের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। কিন্তু সৈন্যরা বললো, 'রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যা বলেছিলেন, তা শুধু জোর দেওয়ার জন্যই বলেছিলেন। তাঁর কথার অর্থ এই ছিল না যে, শত্রু পালাতে থাকবে আর তোমরা সব ঠাঁয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।' এই কথা বলেই তারা গিরিপথ ত্যাগ করলো এবং যুদ্ধের ময়দানে ছুটে যেতে লাগলো। পলায়নপর শত্রু সৈন্যদের মধ্যে ছিল খালেদ বিন ওলীদ (যিনি পরবর্তীকালে ইসলামের একজন সুদক্ষ জেনারেল হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন)। খালেদের দৃষ্টি পড়লো ফাঁকা গিরিপথের উপর। সেখানে তখন মাত্র কয়েকজন সৈন্য তাদের কমাণ্ডারের সাথে পাহারা দিচ্ছিল। খালেদ কাফেরদের অপর এক জেনারেল আমর ইবনুল আসকে হাঁক ছেড়ে বললো, 'একটু পিছনে গিরিপথের দিকে তাকাও।' আমর বিন আস যখন গিরিপথের দিকে তার দৃষ্টি ফেরালো, তখন সে বুঝতে পারলো, সে আজ তার জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় সুযোগ পেয়ে গেছে। উভয় জেনারেল তাদের পলায়নপর সৈন্যদেরকে সামলিয়ে নিলো এবং মুসলিম সৈন্যদের পাশ কাটায়ে পাহাড় পর্যন্ত পৌঁছে গেল। যে ক'জন মুসলিম সৈন্য গিরিপথ রক্ষার জন্য সেখানে খাড়া ছিল তাঁদেরকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলে পিছন দিক থেকে এসে আচমকা ইসলামী সৈন্যের উপরে আক্রমণ করে বসলো। তাদের বিজয়সূচক শ্লোগান শুনে তাদের পলায়নপর সৈন্যরাও আবার যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে ধাবিত হয়ে এলো। এই আক্রমণ এত আকস্মিক হয়েছিল এবং কাফেরদের পিছনে ছুটতে ছুটতে মুসলিম সৈন্যরা এত দূর দূর স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল যে, মুসলমানরা কেউই দলবদ্ধভাবে যুদ্ধ করার মত অবস্থায় ছিল না। তারা একত্রিত হতে পারলো না। যুদ্ধের ময়দানে তাদের একেক জন একেক জায়গায় একলা একলা যুদ্ধ করতে লাগলো। যাদের

অনেকেই শহীদ হয়ে গেলেন। বাকীসব এই ভেবে হতভম্ব হয়ে পড়লো যে, আসলে হলোটা কি ? অনেকে আবার পিছনের দিকে ছুটে গেল। মাত্র কয়েকজন সাহাবী দৌড়ে গিয়ে রসূলে করীম (সাঃ)-এর পাশে সমবেত হলেন। তাঁদের সংখ্যা খুব বেশী হলেও তিরিশের বেশী হবে না। *

যে স্থানটায় রসূলে করীম (সাঃ) দাঁড়িয়ে ছিলেন, কাফেররা সেই স্থানটায় প্রচণ্ড হামলা চালাতে থাকলো। তাঁকে (সাঃ) রক্ষা করতে গিয়ে একের পর এক সাহাবী (রাঃ) শহীদ হতে লাগলেন। তলোয়ারধারী সৈন্য ছাড়াও তীরন্দাজ সৈন্যরা উঁচু উঁচু টিলার উপরে দাঁড়িয়ে রসূলে করীম (সাঃ)-এর উপরে অজস্র তীর বর্ষণ করতে লাগলো, ঐ সময় তালহা (রাঃ) যিনি ছিলেন মক্কার কোরেশ বংশের লোক এবং মোহাজের তিনি লক্ষ্য করলেন যে, প্রত্যেকটা তীর ছোঁড়া হচ্ছে রসূলে করীম (সাঃ) -এর চেহারার দিকে তাক করে। তিনি তখন তাঁর হাত রসূলে করীম (সাঃ)-এর মুখের সামনে তুলে ধরে আড়াল দিলেন। তীরের পর তীর এসে পড়ছিল এবং তালহা সেগুলোকে হাত দিয়ে ঠেকাচ্ছিলেন। জানবাজ এবং বিশ্বস্ত সেই সাহাবী নিজের হাতকে একটুও সরাচ্ছিলেন না। তীরের পর তীরের আঘাতে আঘাতে তার হাত ক্ষতবিক্ষত হতে হতে শেষ হয়ে গেল। একটা হাত তার ভাল হয়েছিল। কয়েক বৎসর পর ইসলামের চতুর্থ খলীফার সময় যখন মুসলমানদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ হচ্ছিল তখন একজন শত্রু বিদ্রূপ করে তালহাকে (রাঃ) বলেছিল, 'হাত-কাট নুলা'। এই কথা শুনে একজন সাহাবী আর একজন সাহাবীকে বলেছিলেন, 'হ্যাঁ নুলাই তো বটে, কিন্তু কত মুবারক এই নুলা; কত আশিসমন্ডিত!! তুমি কি জান তালহার এই হাত নুলা হয়েছে রসূলে করীম (সাঃ)-এর মুখমণ্ডল রক্ষা করতে গিয়েই ? ওহোদের যুদ্ধের পর এক ব্যক্তি তালহাকে জিজ্ঞেস করেছিল, তীরগুলো যখন আপনার হাতে এসে পড়ছিল, তখন কি আপনি ব্যথা পাচ্ছিলেন না ? আপনি কি উহ্ আহ্ করছিলেন না ?' উত্তরে তালহা (রাঃ) বলেছিলেন, 'ব্যথা তো লাগছিলই, মুখ থেকেও উহ্ আহ্ বের হতে চাচ্ছিল। কিন্তু আমি উহ্ আহ্ করি নি এই ভয়ে যে, পাছে উহ্ করতে গিয়ে না আবার হাত সরে যায়, আর তক্ষুণি তীর এসে পড়ে রসূলে করীম (সাঃ)-এর চেহারার উপরে।'

এই কয়েকটি মানুষ আর কতক্ষণ এত বড় সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারে। কাফের সেনাহিনীর একটা দল অগ্রসর হয়ে এলো এবং তারা রসূলে করীম (সাঃ)-এর চতুষ্পার্শ্বের সৈন্যদেরকে আক্রমণ করে পিছু হটিয়ে দিল। রসূলে

---

* *যুরকানী ঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫*

করীম (সাঃ) সেখানে একাকী পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে রইলেন। প্রচন্ড জোরে ছুড়ে মারা একখন্ড পাথর এসে তাঁর কপালে পড়লো এবং একটা গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করলো। হেলমেটের কাঁটা তাঁর মাথায় বিদ্ধ হয়ে গেল। তিনি বেহুঁশ হয়ে সেই সাহাবীদের (রাঃ) লাশের উপরে পড়ে গেলেন, যাঁরা তাঁর পাশে থেকে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেছে।* এরপর আরও কিছু সংখ্যক সাহাবী (রাঃ) তাঁর দেহের হেফাযত করতে গিয়ে সেখানেই শহীদ হয়ে গেলেন। তাঁদের লাশগুলিও আঁ হযরত (সাঃ)-এর দেহের উপরে গিয়ে পড়লো। কাফেররা তাঁর দেহকে ঐসব লাশের নীচে পড়ে থাকতে দেখে মনে করলো যে, তিনি (সাঃ) মারা গেছেন। কাজেই মক্কার সৈন্যরা নিজেদের বাহিনীর লাইন ঠিক করার জন্য পিছনে সরে গেল, যে সাহাবারা তার চতুষ্পার্শে দণ্ডায়মান ছিলেন এবং যাঁদেরকে কাফেররা আক্রমণ করে পিছনে হটিয়ে দিয়েছিল তাদের মধ্যে হযরত উমর (রাঃ)ও ছিলেন। যখন তিনি দেখলেন যে, যুদ্ধের ময়দান খালি হয়ে গেছে, আর কেউ নেই, তখন তাঁর স্থির বিশ্বাস জন্মালো যে, রসূলে করীম (সাঃ) শহীদ হয়ে গেছেন। এবং সেই ব্যক্তি যিনি পরবর্তীকালে একই সময়ে রোমান সম্রাট ও পারস্য সম্রাটের বিরুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন, যার হৃদয় কখনও ভীত হতো না, ঘাবড়াতো না, তিনিও একটা পাথরে উপরে বসে বাচ্চাছেলের মত কান্না শুরু করে দিলেন। এতে মালেক (রাঃ) নামক একজন সাহাবী, যিনি ইসলামী সেনাবাহিনীর বিজয়ের পর পিছনে চলে গিয়েছিলেন, (কারণ রাতভর কিছু খেতে না পেয়ে তিনি তখন ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং কিছু খেজুর সংগ্রহ করে পিছনের দিকে চলে গিয়েছিলেন যাতে খাতিরজমা বসে খেয়ে নিয়ে ক্ষুধা মেটাতে পারেন)। তিনি বিজয়ের আনন্দে হেলে দুলে আসছিলেন। এবং হযরত উমরের কাছে এছে পৌঁছুলেন। হযরত উমরকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, উমর! আপনার কি হয়েছে ? ইসলামের বিজয়ে তো আপনার আনন্দিত হওয়ার কথা। উত্তরে উমর (রাঃ) বললেন, 'হতে পারে তুমি বিজয়ের পর পিছনে চলে গিয়েছিলে। তুমি জান না যে, কাফেরদের বাহিনী পাহাড়ের পাশ দিয়ে চক্কর কেটে এসে ইসলামী ফৌজকে হামলা করে এবং যেহেতু মুসলিম সৈন্যরা সকলেই ছড়িয়ে, ছিঁটিয়ে পড়েছিল, তাই তাদেরকে আর প্রতিহত করা যায়নি রসূলে করীম (সাঃ) জন কয়েক সঙ্গীসহ তাদের বিরুদ্ধে দন্ডায়মান হয়ে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেছেন'। মালেক (রাঃ) বললেন, একথা যদি ঠিক হয়, তাহলে এখানে বসে বসে কাঁদছেন কিসের জন্য ? যে জগতে আমাদের প্রিয়তম চলে গেছেন, আমাদের তো উচিত সেখানেই চলে যাওয়া! এই কথা বলে তিনি তাঁর হাতের যে শেষ খেজুর মুখে দিতে যাচ্ছিলেন তা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, 'হে খেজুর! মালেক ও জান্নাতের মাঝে এখন তুমি ছাড়া আর কি কোন বাধা আছে ? এই কথা বলে তিনি তৎক্ষণাৎ তলোয়ার হাতে শত্রু সৈন্যদের মধ্যে ঢুকে

---

* *ইবনে হিশাম ঃ ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৭৪।*

পড়লেন। প্রায় তিন হাজার সৈন্যের বিরুদ্ধে একটি মানুষ কী-ই আর করতে পারে। তবু, এক আল্লাহ্‌র এবাদতকারী আত্মা তো বহু লোকের চাইতে ভারী হয়ে থাকে। মালেক এমন ভয়ানকরূপে যুদ্ধ করতে লাগলেন যে, শত্রুরা প্রথমে হতভম্ব হয়ে পড়লো । কিন্তু, অবশেষে তিনি আহত হয়ে পড়ে গেলেন। পড়ে গিয়েও শত্রু সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করতেই থাকলেন। মক্কার কাফেররা তাঁর উপরে সমবেত হামলা চালালো । এবং এত অসংখ্য আঘাত করলো যে, যুদ্ধের পর তাঁর লাশের সত্তরটি টুকরা পাওয়া গিয়েছিল। তাঁর লাশ সনাক্ত করাই যাচ্ছিল না শেষে একটা আঙ্গুল দেখে তাঁর বোন তাঁকে চিনতে পারেন এবং বলেন, 'এটাই আমার ভাইয়ের লাশ।' যে সাহাবারা (রাঃ) রসূলে করীম (সাঃ)-এর চতুর্দিকে ব্যূহ রচনা করে দন্ডায়মান ছিলেন এবং পরে কাফেরদের আক্রমণের চাপে পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাঁরা যখন দেখলেন যে, কাফেরদের সেনাবাহিনী চলে গেছে, তখন তাঁরা পুনরায় রসূলে করীম (সাঃ)-এর পাশে ফিরে এলেন। তাঁরা তাঁর (সাঃ) পবিত্র দেহ উপরে নিয়ে এলেন। একজন সাহাবী, উবায়দা বিন্ আশ জাবাহ্ (রাঃ) নিজের দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে তাঁর (সাঃ) মাথায় ঢুকে পড়া খিল খুব জোরে টেনে তুললেন, এতে তাঁর (সাঃ) দুটো দাঁত ভেঙ্গেই গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে রসূলে করীম (সাঃ)-এর জ্ঞান ফিরে এলো। সাহাবারা যুদ্ধের ময়দানে চতুর্দিকে লোক পাঠিয়ে দিলেন যেন মুসলমানরা দ্রুত একত্রিত হয়। ছড়িয়ে পড়া সৈন্যরা পুনরায় সমবেত হতে লাগলো। রসূলে করীম (সাঃ) তাঁদেরকে সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ের এক প্রান্তে চলে গেলেন। যখন পাহাড়ের প্রান্তে মুসলিম সৈন্যরা একত্রে খাড়া হয়েছিলেন, তখন আবু সুফিয়ান খুব জোরে হাঁক ছেড়ে বললো, 'আমরা মুহাম্মদকে হত্যা করেছি ।'

রসূলে করীম (সাঃ) আবু সুফিয়ানের ঐ কথার কোন উত্তর দিলেন না। কেননা, তাতে শত্রুরা তাদের অবস্থান জানতে পেরে পুনরায় হামলা করে বসতে পারে। এবং জখম হওয়া মুসলমানরা আবারও শত্রুর আক্রমণের শিকারে পরিণত হবে। ইসলামী সৈন্যদের পক্ষ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে আবু সুফিয়ানের নিশ্চিত বিশ্বাস হলো যে, তার নিজের ধারণাই সঠিক এবং সে তখন খুব জোরে চীৎকার করে বললো, 'আমরা আবুবকরকেও হত্যা করেছি।'

রসূলে করীম (সাঃ) হযরত আবুবকর (রাঃ) -কে কোন উত্তর দিতে বারণ করলেন। আবারও আবু সুফিয়ান চীৎকার করে বললো, 'আমরা উমরকেও হত্যা করেছি।' উমর (রাঃ) ছিলেন খুবই তেজস্বী মানুষ, তিনি চাইলেন যে,

তিনি জবাব দেন, 'আমরা সবাই আল্লাহ্‌র ফযলে জিন্দা আছি। এবং তোমাদের মোকাবেলা করার জন্যেও প্রস্তুত'। কিন্তু রসূল করীম (সাঃ) নিষেধ করে বললেন, 'মুসলমানদেরকে বিপদের মধ্যে ফেলিও না, চুপ থাক।' এবারে কাফেরদের, দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো যে, ইসলামের প্রবর্তক এবং তাঁর সঙ্গে তাঁর ডান হাত ও বাম হাত উভয়কেই তারা হত্যা করতে পেরেছে। এই ভেবে, আবু সুফিয়ান ও তার সঙ্গীরা উল্লসিত হয়ে উঠলো এবং তাদের জাতীয় শ্লোগান দিতে লাগলো, 'উল্লো হোবল উলো হোবল!' -'আমাদের সম্মানিত দেবতা হোবলের মর্যাদা বুলন্দ হোক! তিনি আজ ইসলামকে শেষ করে দিয়েছেন।'

রসূলে করীম (সাঃ)-যিনি তাঁর নিজের মৃত্যুর ঘোষণায়, আবুবকরের (রাঃ) মৃত্যুর ঘোষণায়, উমরের (রাঃ) মৃত্যুর ঘোষণায়, চুপ করে থাকতে বলেছিলেন, এই ভেবে যে, পাছে শত্রু না আবার জখমী মুসলমানদের উপরে হঠাৎ আক্রমণ করে বসে, এবং পরিশ্রান্ত মুসলমানরা শহীদ হয়ে যায়। এখন, যখন এক আল্লাহ্‌র ইজ্জতের মর্যাদার প্রশ্ন দেখা দিল, এবং যুদ্ধের ময়দানে শিরকের শ্লোগান দেওয়া হলো, তখন তাঁর আত্মা বিচলিত হয়ে উঠলো। তিনি দারুণ উত্তেজনায় সাহাবাদের দিকে ফিলে বললেন,

'তোমরা সব জওয়াব দিচ্ছ না কেন ?'

সাহাবারা বল্‌লেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্‌ কি জওয়াব দিব ?'

তিনি বললেন, 'বল, আল্লাহো 'আলা ওয়া আজাল্লো

আল্লাহো 'আলা ওয়া আজাল্লো।'*

অর্থ্যাৎ, 'তোমরা মিথ্যা বলছ যে, হোবলের, মর্যাদা উচ্চ হয়েছে, বরং যে আল্লাহ্‌ এক ও অংশীদারবিহীন তাঁর মর্যাদাই সর্বোচ্চ।' এবং এভাবে তিনি তাঁর দুশমনকে জানিয়ে দিলেন যে, তাঁরা সবাই জিন্দা আছেন। এই বীরোচিত ও তেজোদ্দীপ্ত উত্তর শত্রুদের উপরে এমন প্রভাব বিস্তার করলো যে, তাদের আশা ভরসা সব মাটিতে মিশে গেল। এবং তাদের সামনে পরিশ্রান্ত জখমী মুসলিমদেরকে খাড়া হয়ে থাকা জেনেও -যাদেরকে আক্রমণ করে তারা খুব সহজেই মেরে ফেলতে পারতো, তাদেরকে আর আক্রমণ করতে সাহস পেল না,

---

* *আস্‌ সিরাতুল হালবিয়া ঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭০*

এবং যতটুকু বিজয় তাদের ভাগ্যে জুটেছিল তাতেই সন্তুষ্ট থেকে মক্কার পথে ফিরে চল্‌লো।

ওহোদের যুদ্ধে স্পষ্ট বিজয় লাভের পরও বিপর্যয় ঘটে গিয়েছিল, কিন্তু, প্রকৃত প্রস্তাবে, এই যুদ্ধ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সত্যতার এক বড় নিদর্শন ছিল। এই যুদ্ধে রসূলে করীম (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে প্রথমে মুসলমানরা বিজয় লাভ করে আবার রসূলে করীমের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারেই তাঁর প্রিয় চাচা হযরত হামযা (রাঃ) শহীদ হন। আবার রসূলে করীম (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক যুদ্ধ শুরুর দিকেই কাফের সেনাবাহিনীর এক বড় নেতা নিহত হয়। আবার রসূলে করীম (সাঃ)-এর ভাবিষ্যদ্বাণী অনুসারেই তিনি নিজে আহত হন এবং কিছু সংখ্যক সাহাবীও শহীদ হন। এই সব ঘটনা ছাড়াও, মুসলমানদের সত্যনিষ্ঠা ও ঈমানের এমনই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল যার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে নেই। এই সত্যনিষ্ঠা ও ঈমানের কিছু কিছু ঘটনার কথা তো ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে আরও একটি ঘটনা উল্লেখের দাবী রাখে যা থেকে বুঝা যায় যে, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সংসর্গ সাহাবাগণের (রাঃ) হৃদয়ে কত অটল ঈমান পয়দা করেছিল! যখন রসূলে করীম (সাঃ) কিছু সংখ্যক সাহাবী (রাঃ)-কে নিয়ে পাহাড়ের প্রান্তদেশে চলে গেলেন এবং শত্রুরাও পিছনে সরে গেল, তখন কোন কোন সাহাবাকে এই আদেশ দিয়েছিলেন যে, তারা যেন ময়দানে যায় এবং আহত সৈনিকদের খোঁজ খবর নেয়। একজন সাহাবী ময়দানে খোঁজ করতে করতে একজন আহত আনসারীর কাছে যান, এবং দেখেন তাঁর অবস্থা খুব সংকটজনক এবং প্রাণ যায় যায় অবস্থা। এই সাহাবী (রাঃ) তাঁর খুব কাছে গিয়ে তাঁকে 'আস্‌সালামু আলায়কুম' বল্লেন। তিনি কাঁপতে কাঁপতে তাঁর হাত উঠালেন মুসাফাহা করার জন্য। এবং তাঁর হাত ধরে বললেন, 'আমি অপেক্ষা করছিলাম, কেউ আসে কি না। আগত সাহাবী তাঁকে বললেন, 'আপনার অবস্থা তো ভাল মনে হচ্ছে না আপনার কি কোন কথা বলার আছে, যা আপনার আত্মীয় স্বজনের কাছে বলতে হবে ?' ঐ মুমূর্ষু সাহাবী (রাঃ) বললেন, 'হ্যাঁ, আমার পক্ষ থেকে আমার আত্মীয় স্বজনের কাছে আমার সালাম পৌঁছে দিবেন এবং বলবেন যে, আমি মরে যাচ্ছি, কিন্তু তোমাদের কাছে আমি আল্লাহ্‌তায়ালার এক পবিত্র আমানত মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে রেখে যাচ্ছি। হে আমার ভাইয়েরা এবং আত্মীয়স্বজনেরা! তিনি আল্লাহ্‌র সত্য রসূল, আমি এই প্রত্যাশা করি যে, তাঁর হেফাযতের খাতিরে তোমরা তোমাদের প্রাণ বিসর্জন দিতে

কুণ্ঠাবোধ করবে না। এবং তোমরা আমার এই ওসীয়্যত স্মরণ রাখিও (মুয়াত্তা ও যুরকানী)। মুমূর্ষু মানুষের মনে হাজারো কথা আসে আত্মীয় স্বজনের কাছে বলার জন্য। কিন্তু এই সমস্ত লোক মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) প্রেমে এত বেশী আত্মবিলীন ছিলেন যে, মৃত্যুর সময় না তারা ছেলেমেয়েদের কথা মনে করতেন, না তাদের বিধবা স্ত্রীদের কথা, না ধন-সম্পত্তির কথা। মৃত্যুর সময় তাঁদের শুধু এক ব্যক্তির কথাই মনে হত এবং তিনি হলেন মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)। তাঁরা এটা জানতেন যে, পৃথিবীর পরিত্রাণ বা নাজাত ঐ এক ব্যক্তির হাতেই ন্যস্ত। আর আমাদের মৃত্যুর পর যদি আমাদের সন্তান সন্ততিরা জীবিত থাকে, তাহলে তারা হয়ত কোন মহত্তর কাজ করতে পারবে না। কিন্তু তারা যদি এই পরিত্রাণ কর্তার হেফাযত করতে গিয়ে প্রাণ বিসর্জন দেয় তাতে হয়তো আমাদের বংশ লোপ পেয়ে যাবে, কিন্তু পৃথিবী জীবন লাভ করবে। শয়তানের খপ্পরে পড়ে থাকা মানুষেরা আবার মুক্তি পাবে। আমাদের বংশধরদের জীবনের চাইতে হাজারো গুণ বেশী মূল্যবান জীবনের অধিকারী আদম সন্তানেরা পরিত্রাণ লাভ করতে থাকবে।

যাহোক, রসূলে করীম (সাঃ) অনেক আহতকে এবং অনেক শহীদকে একত্রে জমা করালেন। জখমীদের সেবা-শুশ্রূষা করালেন। শহীদগণের দাফনের বন্দোবস্ত করলেন। এমন সময় তিনি জানতে পারলেন যে, জালেম কাফেররা অনেক শহীদের নাক, কান কেটে ফেলছে। যাঁদের নাক কান কাটা হচ্ছিল দেখা গেল, তাদের মধ্যে খোদ রসূলে করীমের চাচা হযরত হামযাও (রাঃ) ছিলেন। এই দৃশ্য দেখে তিনি দারুণভাবে শোকাহত হয়ে পড়লেন। তিনি বললেন, কাফেররা তাদের নিজেদের এই অন্যায় কাজের জন্য তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করা বৈধ করে দিল, যা আমরা অবৈধ মনে করতাম। কিন্তু খোদাতায়ালার তরফ থেকে ঐ সময়ে ওহী নাযিল হলো যে, কাফেররা যা করছে, তাদেরকে করতে দাও। তুমি রহম ও ইনসাফের আঁচল কখনই ছেড়ে দিও না।

ওহোদ থেকে প্রত্যাবর্তন

এবং

মদীনাবাসীদের আত্মবিলীনতা

ইসলামী সেনাবাহিনী মদীনার দিকে রওয়ানা হলো। কিন্তু ইতোমধ্যে রসূলে করীম (সাঃ)-এর শাহাদতের গুজব এবং ইসলামী সেনাবাহিনী পর্যুদস্ত হওয়ার খবরাদি মদীনায় ছড়িয়ে পড়লো। মদীনার মহিলা এবং ছেলেমেয়েরা পাগলের মত ছুটতে লাগলো ওহোদ প্রান্তরের দিকে। তাদের অধিকাংশ রাস্তার মধ্যেই সঠিক খবর পেয়ে থেমে গেল। বনু দীনার কবিলার এক মহিলা দেওয়ানার মত ছুটতে ছুটতে ওহোদ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছলেন। তিনি পাগলীনির মত যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে দৌড়াচ্ছিলেন। তাঁর স্বামী, ভাই ও পিতা ওহোদে নিহত হয়েছিলেন। কোন কোন বর্ণনা মতে তাঁর এক ছেলেও নিহত হয়েছিলেন। তাঁকে তাঁর পিতার মৃত্যুর খবর দেওয়া হলো তখন তিনি বললেন, 'রসূল করীম (সাঃ)-এর খবর কি?' খবরদাতা যেহেতু জানতেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) জীবিত আছেন, সেহেতু তিনি ঘুরে ফিরে মহিলাকে তাঁর ভাই, তাঁর স্বামী ও ছেলের মৃত্যুর খবরই দিচ্ছিলেন। কিন্তু মহিলাও ঘুরে ফিরে শুধু একই কথা বলছিলেন,

ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم

'রসূলুল্লাহ (সাঃ)! আপনি এটা কী করলেন ?' বাহ্যিকভাবে এই কথাটিকে ভ্রমাত্মক মনে হয়। এবং এ জন্যই ঐতিহাসিকরা লিখেছেন যে, কথাটার অর্থ ছিল- 'রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর অবস্থা কি ?' কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে, কথাটা ভ্রমাত্মক ছিল না। স্ত্রীলোকদের ব্যবহৃত বিশেষ বাচনভঙ্গী অনুসারে সম্পূর্ণ ঠিক ছিল। স্ত্রীলোকদের ভাবাবেগ বেশী এবং তারা কোন কোন সময় মৃত ব্যক্তিকে ধরে নিয়েই তাকে সম্বোধন করে কথা বলে। যেমন, অনেক স্ত্রীলোক ছেলে মারা গেলে তার লাশকে সম্বোধন করে বলে, 'আমাকে ফেলে গেলে। এই বুড়া বয়সে কেন আমার কার কাছ থেকে মুখ ফেরায়ে নিলে'। এটা শোকাভিভূত মানুষের প্রকৃতির একটা সুক্ষ্ম প্রকাশ মাত্র। তাই, রসূল করীম (সাঃ)-এর ওফাতের খবর শুনে ঐ মহিলার অবস্থাও তদ্রূপ হয়েছিল। কিছুতেই তাঁকে (সাঃ) মৃত ভাবতে পারছিলেন না। এবং অপরদিকে সত্যতা ঠিক যাচাইও করতে পারছিলেন না। এ জন্যও

শোকার্ত অর্থে ঐ কথাই বলছিলেন যে, ইয়া রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আপনি এটা কী করলেন ? অর্থাৎ এমন বিশ্বস্ত ও দয়ালু ব্যক্তি আমাদেরকে এত বড় দুঃখ কী করে দিলেন ?

লোকেরা যখন দেখলেন যে, মহিলার বাপ, ভাই এর কোন-তোয়াক্কা নেই, তখন তাঁরা তাঁর প্রকৃত অনুভূতি বুঝতে পারলেন এবং তাঁকে বললেন, 'অমুকের মা ! তুমি যেমন চাচ্ছ, রসূল তেমনই আল্লাহ্‌র ফযলে ভালই আছেন।' এতে মহিলা বললেন, 'দেখাও তিনি কোথায় ?' লোকেরা বললেন, 'সামনে এগিয়ে যাও,পাবে, তিনি ঐ,ঐখানে দাঁড়িয়ে আছেন।' মহিলা এক দৌড়ে রসূল (সাঃ)-এর কাছে পৌঁছে গেলেন। এবং তাঁর আঁচল ধরে বললেন,

(بابی انت وامی یا رسول اللہ لا ابالی اذ سلمت من عطب)

'ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমার বাপ-মা আপনার জন্য কোরবানী, আপনি যখন ভাল আছেন, তখন আমি আর কারো জন্য চিন্তা করি না।'

এই তো সেই ঈমানের দৃষ্টান্ত যা পুরুষরা দেখিয়েছিলেন যুদ্ধে! ইহাতে সেই আন্তরিকতা যা দেখিয়ে ছিলেন নারী, যার কিছু উদাহরণ এখানে তুলে দিলাম আমি। খৃষ্টান জগত মরিয়ম মগ্‌দীলিনীর এবং তার সাথীদের সেই বাহাদুরীতে খুশী প্রকাশ করেন যে, তারা খুব ভোরে শত্রুদেরকে লুকায়ে মসীহ্ (আঃ)-এর কবরের কাছে গিয়েছিলেন। আমি তাদের বলতে চাই যে, আসো এবং আমার প্রিয়তমের (সাঃ) একনিষ্ঠ ও আত্মনিবেদিত অনুসারীদেরকে দেখ! কী অবস্থার মধ্যে তাঁরা তাঁর সঙ্গে ছিলেন এবং কী অবস্থায় তাঁরা তৌহীদের পতাকা উড্ডীন রেখেছিলেন।

এই ধরনের আত্মোৎসর্গের আর একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ আছে ইতিহাসে। যখন রসূলে করীম (সাঃ) শহীদগণের দাফনের কাজ সমাধা করে মদীনায় ফিরে আসছিলেন, তখন আবারও নারীরা এবং ছেলেমেয়েরা শহরের বাইরে এলো তাঁকে স্বাগতম জানাতে। রসূলে করীম (সাঃ)-এর উট্‌নীর লাগাম ধরে আসছিলেন মদীনার এক নেতা সায়াদ বিন মোয়ায। এবং তিনি দুনিয়ার সামনে এই কথা বলছেন দেখ, আমরা মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সহী সালামতে ঘরে নিয়ে এসেছি। শহরের কাছাকাছি এলে তাঁর বুড়ী মা, যাঁর দৃষ্টি শক্তি কমে

গিয়েছিল, তিনিও এসে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হলেন। ওহোদে তাঁর এক ছেলে উমর বিন মোয়ায শহীদ হয়েছিলেন, তাঁকে দেখে সা'দ বিন মোয়ায বললেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমার মা, ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমার মা আসছেন।' তিনি (সাঃ) বললেন, 'অনেক বরকত ও আশিসের সঙ্গে আসছেন। বুড়ী এগিয়ে এলেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে দেখবার জন্য তাঁর দুর্বল দৃষ্টি দিয়ে এদিক সেদিক তাকাতে লাগলেন। শেষে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর চেহারার প্রতি তার দৃষ্টি পড়লো এবং তিনি খুশীতে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বল্লেন, 'মা মনি! তোমার ছেলে শহীদ হওয়াতে আমি খুব দুঃখ পেয়েছি। আমি আমার সমবেদনা জানাচ্ছি।' এই কথা শুনে ঐ পুণ্যবতী মহিলা বললেন, 'হুযুর! আমি যখন আপনাকে ভাল অবস্থায় দেখেছি, তক্ষুণি আমি আমার সব দুঃখ বেদনাকে রোস্ট করে খেয়ে ফেলেছি।' কী সুন্দর বাচন-ভঙ্গী! ভালবাসার কী গভীর অনুভূতি! চিন্তা ভাবনাই তো মানুষকে খেয়ে ফেলে, অথচ তিনি কত উদ্দীপনার সঙ্গে বলছেন যে, ছেলের চিন্তা আমাকে কী খেয়ে ফেলবে ? যতক্ষণ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বেঁচে আছেন, ততক্ষণ আমি আমার সমস্ত চিন্তা ভাবনাকেই গিলে গিলে খাব। আমার ছেলের মৃত্যুর দুঃখতো আমাকে মারাতে পারবে না। বরং সে যে রসূলে করীম (সাঃ)-এর জন্য প্রাণ দিতে পেরেছে, সে আমার শক্তি বৃদ্ধির কারণ হবে।' হে আন্‌সার! আমার জীবন তোমাদের জন্য কোরবানী হোক। কত না মহান পুরস্কার তোমরা পেয়ে গেছ!

যাহোক, ভালোয় ভালোয় রসূলে করীম (সাঃ) মদীনায় পৌঁছে গেলেন। যদিও ঐ যুদ্ধে অনেক মুসলমান শহীদ হয়েছিলেন এবং অনেকে আহত হয়েছিলেন, তবু ওহোদের যুদ্ধকে পরাজয় বলা সমীচীন হবে না। আমি যে সকল ঘটনার বিবরণ দিয়ে এসেছি, সেগুলোকে সামনে রেখে বলা যায় যে, এই যুদ্ধেও এক বিরাট বিজয় অর্জিত হয়েছে। এ এমন এক বিজয় যার কথা মনে করে কেয়ামত পর্যন্ত মুসলমানরা তাদের ঈমান আরও বেশী চাঙ্গা করতে পারবে, জোরদার করতে পারবে। মদীনায় পৌঁছে আঁ হযরত (সাঃ) পুনরায় তাঁর আসল কাজ অর্থাৎ তালীম, তরবীয়ত এবং ইসলাহে নফ্‌স বা শিক্ষা প্রশিক্ষণ ও আত্মিক সংশোধনের কাজে মনোনিবেশ করলেন। কিন্তু, তিনি সকল কাজ অবাধে ও সহজে করতে পারেন নি।

ওহোদের ঘটনার পর ইহুদীদের মধ্যে আরও বেশী করে উৎসাহের সৃষ্টি হলো এবং মুনাফেকরাও আবার মাথা তুলতে শুরু করলো। তারা মনে করলো,

ইসলামকে ধ্বংস করা লৌকিক শক্তি দ্বারাই সম্ভব। কাজেই, ইহুদীরা থেকে থেকেই আঁ হযরত (সাঃ)-কে কষ্ট দেওয়া শুরু করে দিল। তারা অশ্লীল সব কবিতা রচনা করে তাঁর এবং তাঁর পরিবারের অবমাননা করতে লাগলো। একটা ঝগড়া মীমাংসা করার জন্য আহূত হয়ে, তিনি (সাঃ) ইহুদীদের কেল্লায় গেলেন। ইহুদীরা সিদ্ধান্ত নিল যে, তিনি (সাঃ) যেখানটায় বসবেন, সেখানে উপর থেকে একটা পাথর ফেলে দিয়ে তাঁকে হত্যা করা হবে। কিন্তু, খোদাতায়ালা ব্যাপারটা তাঁকে (সাঃ) যথাসময়ে অবহিত করলেন এবং তিনি কাউকে কিছু না বলেই সেখান থেকে চলে এলেন। পরে ইহুদীরা তাদের এই অপরাধ স্বীকার করেছিল। মুসলমান নারীদেরকে বাজারে গেলে অপমান করা হতো। একদিন এই রকম একটা ঘটনায় একজন মুসলমান মারা যান। একদিন একজন মুসলমান মেয়ের মাথায় পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে ক্ষত-বিক্ষত করা হয় ফলে মেয়েটি তড়পাতে তড়পাতে মারাই যায়। এই সকল কারণে মুসলমানদের যুদ্ধ করতে হয়েছিল ইহুদীদের সাথে। কিন্তু, আরব ও ইহুদীদের প্রথা অনুসারে তাদেরকে মুসলমানরা হত্যা করেনি। বরং, শুধু মদীনা থেকে চলে যাওয়ার শর্তেই তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছিল। কাজেই তাদের দু'টি কবিলার মধ্যে একটি হিজরত করে চলে গেল সিরিয়ার দিকে, এবং দ্বিতীয়টির কিছু অংশ গেল সিরিয়ায় এবং বাদবাকী অংশ গেল মদীনার দক্ষিণে খায়বর নামক এক শহরে। এই শহরটি ছিল আরবের ইহুদীদের কেন্দ্র এবং তা বড় বড় কেল্লা দ্বারা সুরক্ষিত ছিল।

মদ হারাম ঘোষণা ও তার প্রভাব

ওহোদের যুদ্ধ এবং তার পরবর্তী যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়কালে পৃথিবী ইসলামের প্রভাবের সেই সব কার্যকারিতার এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করে, যা বিস্তার লাভ করেছিল তার অনুসারীদের উপরে। আমি বলতে চাই মদপান নিষিদ্ধ করার কথা। ইসলামের পূর্বেকার আরববাসীদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে আমি বলেছিলাম যে, আরবের অধিবাসী পাঁড় মদখোর ছিল। প্রত্যেক সম্মানিত আরব খান্দান বা পরিবারে প্রতিদিন পাঁচ বার করে মদ পান করা হতো। মদের নেশায় মাতাল হয়ে যাওয়া তাদের কাছে একটা মামুলী ব্যাপার ছিল। এতে তাদের সামান্য লজ্জাবোধও হতো না। বরং এটাকে তারা একটা উত্তম কাজ বলেই মনে

করতো। যখন কোন অতিথি আসতো তখন গৃহিণীর কর্তব্য হতো, বারবার মদ্য পানের ব্যবস্থা করা। এই শ্রেণীর লোকদের এই প্রকারের মজ্জাগত অভ্যাস ছাড়ানো কোন সহজ কাজ ছিল না। কিন্তু হিজরতের চতুর্থ বছরে, আঁ হযরত (সাঃ)-এর উপরে এই আদেশ অবতীর্ণ হলো যে, মদ হারাম করা হলো। এই আদেশের ঘোষণা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মুসলমানরা মদপান সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দিল। এমন কি, হাদীসে এসেছে যে, যখন মদ্যপানের নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত ওহী নাযিল হলো, তখন আঁ হযরত (সাঃ) একজন সাহাবীকে হুকুম দিলেন, 'এই নতুন আদেশ মদীনার অলিতে গলিতে এক্ষণি ঘোষণা করে দাও।' একজন আনসারীর (মদীনার মুসলমান) বাড়ীতে সেই সময়ে মদ ও গানের আসর বসেছিল। বহু লোক মদ পান করেছিল, এবং মদের পেয়ালা একটার পর একটা পরিবেশন করা হচ্ছিল। এবং তারা ক্রমাগত পান করেই যাচ্ছিল। মদের একটা বড় মট্‌কা খালি হয়ে গিয়েছিল এবং আর একটা মটকা আনা হয়েছিল। অনেকে মাতাল হয়ে পড়েছিল। এবং অনেকে মাতাল হয় হয় অবস্থায় পৌঁছেছিল। এই অবস্থায় তারা শুনতে পেল, একজন লোক ঘোষণা করছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আল্লাহ্‌তায়ালার হুকুম অনুযায়ী মদ্যপান নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। তাদের মধ্য থেকে একজন উঠলো এবং বললো যে, এতে মনে হচ্ছে শরাব হারাম হয়ে যাওয়ার ঘোষণা কিন্তু, একটু থামো, ব্যাপারটা বুঝতে দাও ভাল করে। এতে আর এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালেন এবং মদভর্তি যে মটকাটা আনা হয়েছিল সেটা লাঠি মেরে ভেঙ্গে খান খান করে দিলেন এবং বললেন, 'প্রথমে হুকুম পালন করো, পরে বুঝতে চেষ্ট করো। এটাই তো আমাদের জন্য যথেষ্ট যে, আমরা ঘোষণা শুনেছি। কাজেই, এটা কিছুতেই উচিত হবে না যে, আমরা মদ পান করতেই থাকবো, আর ঘোষণার সত্যাসত্য যাচাই করতে চেষ্টা করব। বরং আমাদের কর্তব্য এটাই যে, আগে শরাব গলিতে গলিতে প্রবাহিত হয়ে যাবে, পরে ঘোষণার তাৎপর্য জানতে চেষ্টা করা হবে।* এবং এই ব্যক্তির ধারণাই সঠিক ছিল। কেননা, মদ পান নিষিদ্ধ হওয়ার পরেও তারা যদি মদ পান করতেই থাকতো, তাহলে সে অবস্থায় তারা পাপী বলে সাব্যস্ত হতো। আর যদি মদ নিষিদ্ধ না-ই হতো তাহলে, ঐ মদ ফেলে দেওয়াটায় এমন বিশেষ কিছু একটা ক্ষতি হয়ে যেতো না, যা পুষিয়ে নেওয়াই সম্ভব নয়। এই ঘোষণার পর মুসলমানদের মধ্য থেকে মদ্যপান তিরোহিত হয়ে গেল।

---

* *বুখারী : কিতবুল আশরিবাহ্*

এই বিপ্লবী পরিবর্তন সাধনের জন্য কোন বিশেষ প্রচেষ্টা ও প্রচারণার প্রয়োজন হলো না। ঐ মুসলমানরা যাঁরা ঐ হুকুম পালন করেছিলেন, এবং যারা ঐ হুকুম তাৎক্ষণিকভাবে পালন করে দেখেছিলেন তাঁরা সত্তুর/আশি বছর পর্যন্ত বেঁচেছিলেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে এমন একজন মুসলমানও ছিলেন না যিনি ঐ হুকুমের পর তা অমান্য করার দুর্বলতা দেখিয়েছিলেন। যদি এমন কোন ঘটনা ঘটেও থাকে, তবে তা ঘটেছিল এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে যার সৌভাগ্যই হয়নি আঁ হযরত (সাঃ)-এর প্রত্যক্ষ প্রভাবাধীনে আসবার। এর তুলনায় আমরা যখন আমেরিকার মদ্যপান নিষেধাজ্ঞা সহ আন্দোলন এবং এ ব্যাপারে ইউরোপের বছরের পর বছর ধরে সচেতনতা সৃষ্টির প্রচেষ্টার প্রতি লক্ষ্য করি, তখন পরিষ্কার দেখতে পাই যে, আঁ হযরত (সাঃ)-এর একটি ঘোষণাই যথেষ্ট ছিল আরবদের মধ্য থেকে ঐ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যাধি নিরাময়ে জন্য। আজ মদ্যপান নিষিদ্ধ করার জন্য আইন পাশ করা হচ্ছে, এবং পুলিশ, সেনাবাহিনী, শুল্ক আদায়কারী, আবগারী কর্মচারী সকলের মাধ্যমে সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে, কিন্তু তা সফলকাম হতে পারছে না। এবং তাদেরকে তাদের এই অসাফল্যের কথা স্বীকার করতে হচ্ছে, -স্বীকার করতে হচ্ছে যে, মদখোররাই জিতে যাচ্ছে। এবং মদখোরী দূর করা যাচ্ছে না। আমাদের এই যুগকে তো বলা হয় প্রগতির যুগ। কিন্তু যখন এই যুগের তুলনা আমরা ইসলামের প্রাথমিক যুগের সঙ্গে করি, তখন প্রকৃত প্রগতির যুগ কোন্‌টি, আমাদের এই যুগ, না কি ইসলামের ঐ যুগটি যখন অত বড় মহান এক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব সাধিত হয়েছিল।

ওহোদ যুদ্ধের পর
কাফের গোত্রগুলোর অপবিত্র মৈত্রী

ওহোদের ঘটনা এমন ছিল না যা সহজেই ভুলা যায়। মক্কাবাসীরা মনে করেছিল যে, এটা তাদের বিরুদ্ধে প্রথম বিজয়। তারা তাদের এই খবর সারা আরবে প্রচার করে দেয়। এবং আরব গোত্রগুলোকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলতে থাকে। এবং সঙ্গে সঙ্গে এই নিশ্চয়তাও দিতে থাকে যে, মুসলমান কোন অপরাজেয় শক্তি নয়। যদি তারা কোন উন্নতি করেও থাকে,

তবে সেটা তাদের কোন শক্তির কারণে না, বরং সেটা আরবের গোত্রগুলির অনৈক্যের কারণেই। আরবরা যদি ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা চালায় তাহলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করাটা কোন ব্যাপারই নয়। এই প্রচারণার ফলে মুসলমানদের বিরোধিতা জোরদার হয়ে উঠলো। এবং অন্যান্য গোত্রগুলো মুসলমানদেরকে কষ্ট দেওয়ার ব্যাপারে মক্কাবাসীদের চাইতেও বেড়ে গেল। অনেকেই খোলাখুলিভাবে হামলা শুরু করে দিল। অনেকে আবার গোপনে গোপনে ক্ষতিসাধান করার প্রচেষ্টা চালাতে লাগলো।

হিজরতের চতুর্থ বছরে আরবের দুইটি গোত্র- আযল ও কারা*- নিজেদের প্রতিনিধিদল প্রেরণ করলো আঁ হযরত (সাঃ)-এর নিকটে। তারা এসে জানালো যে, তাদের গোত্রের বহুলোক ইসলামের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছে। কাজেই তারা এই আবেদন নিয়ে এসেছে যে, ইসলাম সম্পর্কে উত্তম জ্ঞান রাখেন এমন কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে যদি তাদের ওখানে পাঠানো হয় তাহলে তাঁরা সেখানে অবস্থান করে ঐসব উৎসাহী লোকদেরকে নতুন ধর্ম সম্পর্কে শিক্ষাদান করতে পারবেন। আসলে এটা ছিল একটা ষড়যন্ত্র। এবং এই ষড়যন্ত্র করেছিল ইসলামের ঘোর শত্রু বনু লেহ্ইয়ান গোত্র। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, যখন এই প্রতিনিধি দল মুসলমানদের নিয়ে আসবে তখন তারা তাঁদেরকে হত্যা করবে। এবং এই হত্যা কাণ্ডের মাধ্যমে তারা তাদের নেতা সুফিয়ান বিন খালেদের প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। সুতরাং তারা আযল ও কারা'র প্রতিনিধিদলকে যথেষ্ট পরিমাণে পুরস্কার দিয়ে, কিছু সংখ্যাক মুসলমানকে সঙ্গে করে নিয়ে আসার জন্য আঁ হযরত (সাঃ)-এর দরবারে প্রেরণ করেছিল। যখন আযল ও কারার লোকেরা আঁ হযরত (সাঃ)-এর নিকটে উপস্থিত হয়ে দরখাস্ত করলো, তখন তিনি তাদের কথার উপরে বিশ্বাস করে দশজন মুসলমানকে তাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন, যেন তাঁরা ওদেরকে ইসলামের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং নীতি নিয়মগুলি শিক্ষা দিতে পারেন। এই দলটি যখন বনু লেহ্ইয়ান গোত্রের এলাকায় পৌঁছে গেল তখন আযল ও কারা গোত্রের লোকেরা বনু লেহ্ইয়ান গোত্রের লোকদেরকে খবর পাঠিয়ে দিল, 'এখন তোমরা মুসলমানদেরকে হয় গ্রেফতার করো, নয়তো হত্যা করো।' এই অপবিত্র চক্রান্ত অনুযায়ী বনু লেহ্ইয়ানের দুই শ' সশস্ত্র ব্যক্তি মুসলমানদেরকে পাকড়াও

---

* *বুখারী : ২য় খণ্ড, কিতাবুল মাগাযী ও যুরকানী : ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২-২৫*

করার জন্য বেরিয়ে পড়লো। এবং তারা রাজী' নামক প্রান্তরে এসে মুসলমানদেরকে ঘিরে ফেললো। দশজন মুসলমান ও দু'শত কাফেরের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলো। মুসলমানদের হৃদয় ঈমানের আলোতে ভরপুর ছিল। পক্ষান্তরে, শত্রু ছিল সেই আলো থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। মুসলমান দশজন টিলার উপরে উঠলেন। এবং দু'শত লোককে যুদ্ধের জন্য চ্যালেঞ্জ করলেন। শত্রুরা ধোকাবাজি করে তাঁদেরকে গ্রেফতার করার সিদ্ধান্ত নিল। এবং বললো যে, তাঁরা যদি নীচে নেমে আসেন, তাহালে তাদেরকে কিছু বলা হবে না। কিন্তু মুসলমানদের দলীয় নেতা বা আমীর বললেন, 'আমরা কাফেরদের বহু কিরা কসম ও বহু অঙ্গীকার দেখেছি।' এরপর তাঁরা আসমানের দিকে মুখ তুলে বল্লেন, 'হে খোদা তুমি আমাদের অবস্থা দেখছো! তুমি তোমার রসূলের কাছে আমাদের এই অবস্থার কথা জানিয়ে দাও। যখন কাফেররা দেখলো যে, মুসলমানদের এই ছোট্ট একটা দলের উপরে তাদের কথার কোনও প্রভাব পড়লো না, তখন তারা তাঁদের উপরে আক্রমণ চালালো। এবং মুসলমানরাও কোন পরাজয়ের চিন্তা না করে যুদ্ধ করতে লাগলেন। দশজনের মধ্যে সাতজন শহীদ হয়ে গেলেন বাকী তিনজন যাঁরা বেঁচে ছিলেন, তাঁদেরকে কাফেররা পুনরায় প্রতিশ্রুতি দিল, 'আমরা তোমাদেরকে প্রাণে বধ করবো না, তবে শর্ত এই যে, তোমরা টিলা থেকে নেমে আসবে।' অবশেষে, তাঁরা যখন কাফেরদের কথায় বিশ্বাস করে নীচে নেমে এলেন, তখন কাফেররা তাঁদেরকে তাদের ধনুকের ছিলা দিয়ে পেঁচিয়ে বেঁধে ফেল্লো। এতে তাঁদের একজন বললেন, 'এটা তোমদের প্রথম অঙ্গীকার ভঙ্গ। যা তোমরা করেছিলে আমাদের সঙ্গে। আল্লাহ্ই জানেন, তোমরা এরপর কী করবে।' এই কথা বলে তিনি তাদের সঙ্গে যেতে অস্বীকার করলেন। কাফেররা তাঁর বিরোধিতা ও অবিচলতা দেখে হতাশ হয়ে তাঁকে কতল করে ফেললো এবং বাকী দু'জনকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল। এবং মক্কার কোরেশদের কাছে ক্রীতদাসরূপে বিক্রী করে দিল। এঁদের মধ্যে একজনের নাম ছিল খোবায়েব (রাঃ) এবং অপর জনের নাম যায়েদ (রাঃ)। খোবায়েবের যে ক্রেতা ছিল তার পিতাকে খোবায়েব বদরের যুদ্ধে হত্যা করেছিল। কাজেই সে চেয়েছিল, খোবায়েবকে (রাঃ) হত্যা করেই সে তার পিতার হত্যার প্রতিশোধ নিবে। একদিন বন্দী খোবায়েব নিজের জরুরী কাজের জন্য একটা ক্ষুর চেয়ে নেন। সেই ক্ষুরটি এক সময় খোবায়েব (রাঃ)-এর হাতে থাকা অবস্থায় বাড়ীর মালিকের একটি ছোট্ট ছেলে খেলতে খেলতে তাঁর

কাছে চলে যায়। খোবায়েব তাকে তুলে নিয়ে নিজের উরুর উপরে বসালেন। ছেলেটির মা যখন এই দৃশ্য দেখতে পেলো, তখন তার কলিজা উড়ে গেল। সে নিশ্চিত ভাবলো যে, খোবায়ের তার বাচ্চাকে মেরে ফেলবে। কেননা, কয়েকদিনের মধ্যেই খোবায়েবকে হত্যা করার কথা। ঐ সময় ক্ষুরটি যেহেতু তাঁর হাতেই ছিল এবং বাচ্চাটাও তাঁর কোলেই ছিল, সেহেতু তাঁর পক্ষে বাচ্চাটার ক্ষতিসাধন করা খুবই সহজ ছিল। খোবায়েব (রাঃ) বাচ্চার মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে তার মনের অবস্থা বুঝতে পারলেন এবং বললেন, 'তুমি কি মনে করছে যে, আমি তোমার বাচ্চাকে মেরে ফেলবো ? এমন কথা কখনোও ভেবো না। আমি এমন জঘন্য কাজ কখনই করতে পারবো না। মুসলমান ধোকাবাজ হয় না'। স্ত্রীলোকটি খোবায়েবের এই সততা ও সরলতা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। সে এই কথা সব সময়েই বলে বেড়াতো, 'আমি খোবায়েবের মত বন্দী কখনও দেখিনি।' অবশেষে, মক্কাবাসীরা একদিন হযরত খোবায়েব (রাযিঃ)-কে একটি খোলা ময়দানে নিয়ে গেল যাতে তাকে হত্যা করে আনন্দ উৎসব করতে পারে। যখন তাঁকে কতল করার সময় উপস্থিত হলো তখন খোবায়েব (রাঃ) বললেন, 'আমাকে দু'রাকাত' নামায পড়ার সময় দাও। কোরেশরা তাঁর এই কথা মেনেই নিল। খোবায়েব (রাঃ) সকলের সামনে এই পৃথিবীর বুকে শেষ বারের মত নিজের আল্লাহ্‌র এবাদত করলেন। যখন তিনি নামায শেষ করলেন তখন বললেন, 'আমি আমার নামায জারি রাখতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমি তা করিনি এই কারণে যে, পাছে না আবার তোমরা মনে কর যে, আমি মরার ভয়ে নামায লম্বা করছি।' এই বলেই তিনি জল্লাদের সামনে তাঁর মাথা পেতে দিলেন এবং এই কবিতা আবৃত্তি করলেনঃ

ولست ابالى حين اقتل مسلما ÷ على اى جنب كان لله مصرعى
وذلك فى ذات الاله وان يشأ ÷ يبارك على اوصال شلو ممزع

অর্থাৎ 'আমি যখন মুসলমান থাকা অবস্থায় নিহত হতে যাচ্ছি, তখন আমার কোন পরওয়া নেই যে, আমার ধড় কোন দিকে গিয়ে পড়বে। এ সমস্ত কিছু খোদারই জন্য। আমার খোদা চাইলে আমার দেহের খণ্ড বিখণ্ড করা টুকরোগুলোর উপরে অশেষ কল্যাণ ও আশীষ বর্ষিত হবে।' *

---

* *বুখারী ঃ কিতাবুল মাগাযী*

খোবায়েব (রাঃ) তাঁর কবিতা আবৃত্তি শেষ করতে না করতেই জল্লাদের তলোয়ার তাঁর স্কন্ধে আঘাত করলো। এবং তার ছিন্ন মাথা মাটিতে পড়ে গেল। যে সমস্ত লোক এই উৎসব পালনের জন্য সমবেত হয়েছিল তাদের মধ্যে সাঈদ বিন আমের নামে এক ব্যক্তি ছিল যে মুসলমান হয়েছিল পরে। কথিত আছে যে, কোন ব্যক্তি কখনও তাঁর সামনে খোবায়েব (রাঃ)-এর হত্যাকাণ্ডের কথা তুল্‌লেই তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়তেন।

দ্বিতীয় বন্দী যায়েদকে (রাঃ) হত্যা করার জন্য বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেই তামাশা দেখা লোকদের মধ্যে মক্কার নেতা আবু সুফিয়ানও ছিল। সে যায়েদের দিকে ফিরলো এবং জিজ্ঞেস করলো, 'এটা কি তুমি এখন চাও না যে, তোমার জায়গায় মুহাম্মাদ হোক এবং তুমি নিশ্চিন্তে ঘরের মধ্যে বসে থাক ?'

যায়েদ (রাঃ) অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে জবাব দিলেনঃ

'আবু সুফিয়ান, এটা তুমি কি বলছ ? আল্লাহ্‌র কসম! আমি বরং মৃত্যুকে কবুল করবো, তবু আঁ হযরত (সাঃ) এর পায়ের তলায় মদীনার গলিতে একটা কাঁটাও বিদ্ধ হতে দেব-না।' *

এই আত্মনিবেদনের এই অনুরাগের রূপ দেখে আবু সফিয়ানও প্রভাবান্বিত না হয়ে পারেনি। এবং সে বিস্মিত হয়ে যায়েদের দিকে ফিরে তাকালো এবং চাপা গলায় বললো,

'আল্লাহ্‌ সাক্ষী, যেভাবে মুহাম্মদের (সাঃ) সঙ্গীরা মুহাম্মদকে ভালবাসে, সেভাবে কখনও কোন ব্যক্তিকে ভালবাসতে আমি কাওকে দেখিনি।' * *

---

* *ইবনে হিশাম : ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২২*

** *ইবনে হিশাম : ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২৬-১৩০, যুরকানী : ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ৭৪ ও বুখারী : কিতাবুল মাগাযী।*

কোরআনের সত্তুর জন হাফিযকে হত্যা করার মর্মান্তিক ঘটনা

উল্লিখিত ঘটনার কিছু দিনের মধ্যেই নজ্‌দের কিছু লোক রসূলে করীম (সাঃ)-এর কাছে এলো। তারা আবেদন জানালো যে, তাদের সাথে কয়েকজন মুসলমান পাঠানো হোক, যাতে তাঁদের কাছ থেকে তারা ইসলাম শিখতে পারে। আঁ হযরত (সাঃ) তাদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করতে পারলেন না। সেই সময়ে আমের গোত্রের নেতা আবু বারা মদীনায় ছিল, সে বললো, আমি আমার কবিলার পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে জামিন থাকলাম। এবং সে আঁ হযরত (সাঃ)-কে নিশ্চয়তা দিল যে, তারা কোন ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। এতে আঁ হযরত (সাঃ) সত্তুর জন হাফিযকে (হাফিয-এ-কোরআন) ঐ কাজের জন্য মনোনীত করলেন। হাফিযগণের এই জামা'ত যখন বি'র মাউনা নামক স্থানে পৌঁছলো, তখন তাঁদের মধ্য থেকে একজন হারম বিন্ মালহান (রাঃ) আমর গোত্রের এক নেতার কাছে গেলেন, যে ছিল আবু বারা'র ভাতিজা। তাকে তিনি ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার উদ্দেশ্যেই গেলেন। কবিলার লোকেরা বাহ্যতঃ হারম (রাঃ)-কে সসম্মানে অভ্যর্থনা জানালো। তিনি সেই নেতার সামনে তাঁর বক্তব্য রাখতে শুরু করলেন। ঠিক তখনই একটা লোক পিছন দিক থেকে চুপিসারে এলো এবং তার উপরে নেজা দিয়ে জোরে আঘাত হানলো। সেই আঘাতেই হারম মারা গেলেন। যখন ঐ নেজা তাঁর গলা ভেদ করে গেল তখন শোনা গেল যে, তিনি বলছেন ঃ

اللہ اکبر فزت ورب الکعبۃ

অর্থাৎ 'আল্লাহো আকবর, কসম কা'বার মালিকের! আমি আমার লক্ষ্যে পৌঁছে গেছি।' এইভাবে ধোকাবাজি করে হযরত হারম (রাঃ)-কে হত্যা করার পর সেই গোত্রের নেতারা তাদের লোকজনদেরকে উত্তেজিত করে তুললো যেন তারা বাকী মুসলিম শিক্ষকদের উপরেও হামলা চালায়। কিন্তু গোত্রের লোকেরা বললো, আমাদের নেতা আবু বারা তো এদের জন্য জামিন রয়েছেন। আমরা তো এদের উপরে আক্রমণ চালাতে পারি না। তখন এই কবিলার সর্দাররা, যে কবিলা দু'টোর লোক মুসলিম শিক্ষকদের নিয়ে আসতে গিয়েছিল তাদের সঙ্গে

একত্রিত হয়ে ঐ শিক্ষকগণের উপরে আক্রমণ চালালো। মুসলিম শিক্ষকরা বল্‌লেন যে, 'তাঁরা তো ইসলাম শেখাতে এসেছেন, যুদ্ধ করতে আসেন নি। কিন্তু কাফেররা তাঁদের কথায় কর্ণপাত না করে তাঁদেরকে কতল করতে লাগলো। অবশেষে, তিন জন বাদে বাকী সবাই শহীদ হয়ে গেলেন। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন ল্যাংড়া তিনি যুদ্ধ শুরুর আগেই পাহাড়ের উপড়ে গিয়েছিলেন এবং বাকী দু'জন উট চরানোর জন্য মরুভূমির মধ্যে গিয়েছিলেন। তাঁরা ফিরে এসে দেখলেন যে, তাঁদের ৬৬ (ছেষট্টি) জন সঙ্গী মৃত অবস্থায় ময়দানে পড়ে আছেন। এই দু'জন নিজেরা পরামর্শ করলেন। একজন বল্‌লেন, 'আমাদের উচিত, 'আঁ হযরত (সাঃ)-এর কাছে এই মর্মান্তিক ঘটনার খবর পৌঁছে দেওয়া।' অপরজন বল্‌লেন, 'যেস্থানে আমাদের আমীর যাঁকে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) নিযুক্ত করেছিলেন, তাঁকে হত্যা করা হয়েছে, সেখান থেকে আমি যেতে পারবো না।' এই কথা বলতে বলতেই তিনি একাই কাফেরদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, এবং যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। দ্বিতীয় জনকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হলো। নিহতদের মধ্যে আমের বিন ফোহায়রা (রাঃ)ও ছিলেন। তিনি ছিলেন হযরত আবুবকর (রাঃ) কর্তৃক মুক্তি প্রাপ্ত ক্রীতদাস। তাঁর হত্যাকারী ছিল জব্বার বিন সালমা নামক এক ব্যক্তি, যে পরে মুসলমান হয়েছিল। জব্বার বলতেন, 'আমেরকে হত্যা করাটাই আমার মুসলমান হওয়ার কারণ।' জব্বার বলেছেন, যখন আমি আমেরকে হত্যা করার জন্য আঘাত করলাম তখন আমেরকে আমি এই কথা বলতে শুনলাম, فزت والله

অর্থাৎ 'আল্লাহ্‌র কসম! আমি আমার লক্ষ্যে পৌঁছে গেছি।' পরে আমি এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, মুসলমানরা মারা যাওয়ার সময় অমন কথা বলে কেন। সেই ব্যক্তি তার উত্তরে বলেছিলেন, 'মুসলমানরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় মারা যাওয়াকে আশীর্বাদ ও বিজয় মনে করে।' এই উত্তর জব্বারকে এত বেশী প্রভাবান্বিত করে যে, সে ইসলাম সম্পর্কে জানার জন্য সাধনা শুরু করে দেয় এবং পরিণামে মুসলমান হয়ে যায়।*

এই দু'টি বিয়োগান্ত ঘটনা-যাতে শত্রুর দুষ্কৃতি ও ষড়যন্ত্রের কারণে প্রায় আশিজন মুসলমান শহীদ হয়ে যান- তার খবর মদীনার পৌঁছে যায়। নিহত

---

* *সিরাত ইবনে হিশাম : ১২৭ পৃষ্ঠা*

ব্যক্তিরা কোন সাধারণ লোক ছিলেন না, তাঁরা 'হাফিয-এ-কোরআন' ছিলেন। তাঁরা কোন অপরাধ করেন নি। কারো কোন ক্ষতি করেন নি, তাঁরা কোন যুদ্ধেও অংশ গ্রহণ করতে যাননি। আল্লাহ্ এবং ধর্মের নামে ধোকা দিয়ে তাদেরকে নিয়ে গিয়ে শত্রুর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। এই ঘটনাগুলো থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের বিরুদ্ধে কাফেরদের শত্রুতা কত গভীর ছিল, কত পোক্ত ও অটল ছিল! পক্ষান্তরে, ইসলামের প্রতি মুসলমানদের প্রেম ছিল আরো বেশী গভীর, আরো বেশী অবিচল।

বনী মুস্তালিকের যুদ্ধ

ওহোদের যুদ্ধের পর মক্কায় দারুণ দুর্ভিক্ষ পতিত হয়। হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর সঙ্গে মক্কাবাসীরা যে শত্রুতা করছিল এবং তাঁর বিরুদ্ধে সমগ্র দেশের মধ্যে লাগাতারভাবে যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়াচ্ছিল তা সমস্তই উপেক্ষা করে আঁ হযরত (সাঃ) এই কঠিন বিপদের সময় মক্কার গরীব লোকদের জন্য সাহায্য তহ্বিল গঠন করলেন। কিন্তু এই উপকারও মক্কাবাসীদের উপরে কোন সু-প্রভাব ফেলতে পারলো না। এবং তাদের শত্রুতায় কোন তারতম্য এলো না। বরং তারা শত্রুতায় আরো বেশী বেড়ে গেল। যে সকল গোত্র পূর্বে মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল তারাও শত্রু হয়ে গেল। এদের মধ্যে একটি গোত্র ছিল- 'বনী মুস্তালিক'। এদের সঙ্গে মুসলমানদের সম্পর্ক ভালই ছিল। কিন্তু এখন তারা মদীনা আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলো। যখন আঁ হযরত (সাঃ) তাদের এই প্রস্তুতির খবর পেলেন, তখন তিনি প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য কিছু লোক পাঠিয়ে দিলেন। তারা ফিরে এসে জানাল যে, খবর সত্য। এতে আঁ হযরত (সাঃ) সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তিনি নিজে গিয়েই তাদের হামলার মোকাবেলা করবেন। তিনি একটি সেনাবাহিনী গঠন করলেন এবং সেই বাহিনী নিয়ে বনী মুস্তালিক গোত্রের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। যখন মুসলিম ফৌজ শত্রুদের মুখোমুখী হলো, তখন আঁ হযরত (সাঃ) চেষ্টা করলেন যেন শত্রুরা যুদ্ধ না করেই পিছপা হয়ে যায়। কিন্তু তারা সেটাতে রাজি হলো না, অগ্রাহ্য করলো। অতএব, যুদ্ধ হলো। এবং কয়েক ঘন্টার মধ্যেই শত্রু পরাজিত হলো।

যেহেতু মক্কার কাফেররা মুসলমানদের ক্ষতিসাধন করার জন্য স্থির-প্রতিজ্ঞ ছিল এবং যে সকল গোত্র বন্ধুভাবাপন্ন ছিল তারাও শত্রু হয়ে গেল, সেহেতু মুসলমানদের মধ্যেকার মুনাফেকরা এই পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নিল যে, তারা মুসলমানদের পক্ষে থেকেই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে। খুব সম্ভব, তাদের উদ্দেশ্য ছিল, তারা এই উপায়ে মুসলমানদের ক্ষতিসাধন করতে পারবে। বনী মুস্তালিক

গোত্রের সঙ্গে যুদ্ধ ঘন্টা কয়েকের মধ্যেই শেষ হয়েছিল ফলে, এই যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় মোনাফেকদের কোন সুযোগ মেলেনি ক্ষতিসাধন করার। কিন্তু, আঁ হযরত (সাঃ) সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তিনি বনী মুস্তালিকদের শহরে কিছুদিন থাকবেন। সেখানে অবস্থান কালে মক্কার একজন মুসলমানের সঙ্গে মদীনার একজন মুসলমানের ঝগড়া বাধে কূয়া থেকে পানি তোলা নিয়ে। মক্কার মুসলমান যিনি তিনি ছিলেন একজন মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস, তিনি মদীনার সেই মুসলমানদেরকে মারধোর করেন। এতে মদীনার মুসলমান লোকটি মদীনাবাসী মুসলমানদেরকে/অর্থাৎ আনসারদেরকে হাঁক-ডাক শুরু করে দেয়। অপরদিকে মক্কার মুসলমান লোকটিও মক্কার মুসলমানদেরকে অর্থাৎ মুহাজেরদেরকে হাঁক-ডাক শুরু করে। ফলে, দারুণ একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। কেউই জানবার চেষ্টা করলেন না যে, আসলে ঘটনাটা কি ? উভয় পক্ষের জওয়ানরা তরবারি নিষ্কোষিত করলো। এই পরিস্থিতিতে, আবদুল্লাহ্ বিন উবায় বিন সলুল মনে করলো, এইবার খোদা তাকে সুযোগ দিয়েছেন। সে আগুনে ঘৃতাহুতি দিতে চাইলো এবং মদীনাবাসীদেরকে সম্বোধন করে বললো, 'এই মুহাজেরদের প্রতি তোমাদের দয়া-দাক্ষিণ্য সীমা ছাড়িয়ে গেছে, তোমাদের ভালমানুষীই ওদের মাথা গরম করে দিয়েছে, এখন ওরা দিনে দিনে তোমাদের উপরে প্রভুত্ব খাঁটাতে শুরু করেছে।' এই বক্তৃতায় আব্দুল্লাহ্ যা আশা করেছিল, হয়তো বা তেমনি একটা প্রভাবও পড়েছিল। সংঘর্ষ লাগে লাগে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল; কিন্তু হলো না। কারণ, আব্দুল্লাহ্ তার হীন উদ্দেশ্য প্রণোদিত বক্তৃতার প্রভাব সম্পর্কে একটা ভুল অনুমান করেছিল। সে মনে করেছিল, আনসারদের উপরে তার প্রভাব যথেষ্ট কার্যকর হয়েছে। তাই সে বলেই ফেলেছিল -

'চল, আমরা আগে মদীনায় ফিরে যাই, তারপর মদীনার যে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি, সে, সেখানকার সর্বাপেক্ষা নিন্দিত ও ঘৃণিত ব্যক্তিকে বের করে দেবে।'

সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি বলতে সে নিজেকেই বুঝিয়েছিল এবং সর্বাপেক্ষা নিন্দিত ও ঘৃণিত ব্যক্তি বলতে বুঝিয়েছিল আঁ হযরত (সাঃ)-কে-(নাউযু বিল্লাহে মিন যালেকঃ এথেকে আল্লাহ্র পানাহ্ চাই)। কিন্তু, যেমনিতর মুখ থেকে ঐ কথাগুলো বেরিয়েছে, আর অমনি মুমিনরাও আসল ব্যাপারটা বুঝে ফেলেছেন। তৎক্ষণাৎ তাঁরা বললেন, 'এটা তো কোন মামুলী কথা নয়। এটাতো শয়তানের কথা! এতো আমাদের বিভ্রান্ত করতে এসেছে।' একজন জওয়ান তার চাচার মারফত কথাটা আঁ হযরত (সাঃ)-এর কাছে পৌছে দিলেন। তিনি (সাঃ) আব্দুল্লাহ্ বিন উবায় বিন্ সলুল ও তার সঙ্গীদের ডেকে পাঠালেন। তারা এলে তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন যে, 'ঘটনাটা কি হয়েছিল ? আব্দুল্লাহ্ ও তার

সঙ্গীরা সবকিছু সরাসরি অস্বীকার করলো। এবং বললো 'যে ঘটনার দায়দায়িত্ব আমাদের ঘাড়ে চাপানো হচ্ছে, আসলে তেমন কোন ঘটনা আদৌ ঘটেনি।' তিনি (সাঃ) আর কিছু বল্‌লেন না। কিন্তু, সত্য যা তা ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। বিষয়টা আব্দুল্লাহ্ বিন উবায় বিন সলুলের ছেলেও জানতে পেলো। সে তৎক্ষণাৎ আঁ হযরত (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হলো এবং বললোঃ

'হে আল্লাহ্‌র নবী! আমার পিতা আপনাকে অপমান করেছে। এর শাস্তি তো মৃত্যুদণ্ড। এবং আপনার ফায়সালাও যদি তা-ই হয়, তাহলে আমি চাই যে, আপনি আমাকে আদেশ করুন, আমিই আমার পিতাকে কতল করি। যদি আপনি অন্য কাউকে এই আদেশ দেন, এবং তারই হাতে আমার পিতা নিহত হয়, তাহলে হতে পারে যে, আমি সেই ব্যক্তিকে কতল করে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেব। যার ফলে, আমি তখন আল্লাহ্‌র গযবে পতিত হবো।'

কিন্তু আঁ হযরত (সাঃ) বল্‌লেন,না তো, আমার তো এ ধরণের কোন ইচ্ছা নেই। আমি বরং তার সাথে নরম ব্যবহার করবো, তার উপরে দয়া করবো।*

পুত্র আব্দুল্লাহ্ যখন দেখলো যে, তার পিতার বিশ্বাসঘাতকতা এবং অবমাননাকর উক্তির জওয়াবে আঁ হযরত (সাঃ) দয়া ও অনুকম্পা প্রদর্শন করছেন, তখন তার ঈমান আরও বেড়ে গেল। এবং তার পিতার বিরুদ্ধে তার ক্রোধ আরও বৃদ্ধি পেল। সেনাবাহিনী যখন মদীনার কাছাকাছি এসে পৌছলো, তখন সে এগিয়ে গিয়ে তার বাপের সামনে মুখোমুখী দাঁড়ালো এবং বললোঃ

'আমি তোমাকে মদীনায় প্রবেশ করতে দিব না। যতক্ষণ না তুমি তোমার সেই কথাটা প্রত্যাহার করো যা তুমি উচ্চারণ করেছিলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে। যে মুখ থেকে ঐ কথা বেরিয়েছে যে, আল্লাহ্‌র নবী নিন্দিত ও ঘৃণিত এবং তুমি নিজে সম্মানিত, সেই মুখ দিয়েই তোমাকে বলতে হবে যে, আল্লাহ্‌র নবী সম্মানিত এবং তুমিই নিজে নিন্দিত ও ঘৃণিত। যতক্ষণ না তুমি এ কথা বলবে , ততক্ষণ আমি তোমাকে এক কদমও অগ্রসর হতে দেব না।'

আব্দুল্লাহ বিন উবায় বিন সলুল হতভম্ব হয়ে গেল। সে দারুণভাবে ভীত হয়ে পড়লো। শেষে বল্‌লোঃ

'হে আমার পুত্র! আমি তোমার সাথে একমত। মুহাম্মদ (সাঃ) সম্মানিত এবং আমিই নিন্দিত ও ঘৃণিত।'

যুবক তখন তার পিতার রাস্তা ছেড়ে দিল।*

---

* ইবনে হিশাম : ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২৯
* তাবাকাতে কবীর, ইবনে সা'দ:১ম খন্ড, ২য় অংশ, পৃষ্ঠা ৪৬

মদীনার উপরে সারা আরবের সম্মিলিত আক্রমণ

খন্দকের যুদ্ধ

ইতোপূর্বে ইহুদীদের দু'টো গোত্রের কথা বলা হয়েছে। যাদেরকে যুদ্ধ, কলহ-ফাসাদ, হত্যা ও হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্যে চক্রান্ত করার অপরাধে মদীনা ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল। তাদের মধ্যে বনু নাযীর গোত্রের একটা অংশ হিজরত করে সিরিয়ার দিকে চলে গিয়েছিল। এবং একটা অংশ হিজরত করে গিয়েছিল মদীনা থেকে দক্ষিণে খায়বার নামক একটা শহরে। খায়বার ছিল আরবে ইহুদীদের একটা খুব বড় কেন্দ্র এবং কেল্লা পরিবেষ্টিত একটি শহর। সেখানে গিয়ে বনু নাযীর গোত্রটি মুসলমানদের বিরুদ্ধে আরবদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে থাকলো, যদিও মক্কাবাসীরা প্রথম থেকেই বিরুদ্ধে ছিল, কোন নতুন উস্কানীর প্রয়োজন ছিল না। একইভাবে নজদের গোৎফান নামক কবিলাটি, যাদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল আরবে, তারাও মক্কাবাসীদের সঙ্গে বন্ধুত্বের কারণে ইসলামের দুশমনীতে লিপ্ত হলো। ইহুদীরা এখন কোরেশ ও গোৎফান গোত্রকে উত্তেজিত করা ছোড়াও বনু সালিম ও বনু আসাদ নামক আরো দু'টো শক্তিশালী গোত্রকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া শুরু করলো। এমনিভাবে, বনু সায়াদ নামক কবিলাটি, যারা ইহুদীদের সাথে চুক্তি-বদ্ধ ছিল তাদেরকেও ইহুদীরা মক্কার কোরেশদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করে তুললো। দীর্ঘদিনের চক্রান্তের পর আরবের সমস্ত শক্তিশালী গোত্রগুলোর মধ্যে একটা ঐক্যজোট গড়ে উঠলো। যার মধ্যে মক্কাবাসীরাও ছিল, মক্কার আশে পাশের গোত্রগুলিও ছিল। এছাড়া এই জোটের মধ্যে নজদ এবং মদীনার দক্ষিণের এলাকাগুলোর কবিলাগুলিও শামিল ছিল। আর ইহুদীরা তো ছিলই। এই সমস্ত গোত্রগুলি সম্মিলিতভাবে মদীনার উপর আক্রমণ চালনোর জন্য একটা বিশাল শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করলো। সময়টা ছিল পঞ্চম হিজরীর শওয়াল মাস (ফেব্রুয়ারী-মার্চ, ৬২৭ খৃষ্টাব্দ)।*

ঐতিহাসিকরা উক্ত সেনাবাহিনীর সৈন্যসংখ্যা নিরূপণ করেছেন ১০ (দশ) হাজার থেকে ২৪ (চব্বিশ) হাজার পর্যন্ত। কিন্তু সমগ্র আরবের একটা সম্মিলিত বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা মাত্র দশ হাজার হতে পারে না। তাই চব্বিশ হাজারের কথা যাঁরা বলেছেন তাদের হিসাবই অধিকতর নির্ভুল। তবে এই সংখ্যা যে আঠার/বিশ হাজার ছিল তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। মদীনা ছিল একটা সাধারণ ছোট শহর। সেই শহরের উপরে সমগ্র আরবের সম্মিলিত আক্রমণ কোন মামুলী

---

* *ইবনে হিশাম : ২য় খণ্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা, উইলিয়াম মুইর রচিত 'লাইফ অব মুহাম্মদ'।*

ব্যাপার ছিল না। মদীনার সকল পুরুষ মানুষের সংখ্যা - ছেলে, বুড়ো, জওয়ান মিলে ছিল মাত্র তিন হাজার। মাত্র এই তিন হাজার মানুষই বের হতে পারতো। এদের বিরুদ্ধে শত্রু সৈন্যের সংখ্যা ছিল বিশ থেকে চব্বিশ হাজার। এবং তারা সকলেই ছিল রীতিমত সৈনিক, জওয়ান ও যুদ্ধ-বিদ্যায় পারদর্শী। যখন শহরের ভিতরে থেকে শহর রক্ষার প্রশ্ন উঠে তখন তাতে ছেলে বুড়ো সবাই শামিল হতে পারে। কিন্তু, দূর দূরান্তরে যখন সেনাবাহিনী যুদ্ধ করতে যায় তখন কেবল যুবক ও শক্তিশালী লোকেরাই তাতে অংশ গ্রহণ করতে পারে। কাজেই, এটা নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, শত্রুদের সৈন্যসংখ্যা বিশ বা পঁচিশ হাজার যাই হোক না কেন, তারা সবাই ছিল শক্তিশালী যুবক এবং সুদক্ষ সৈনিক। পক্ষান্তরে, মদীনার সমস্ত পুরুষের সংখ্যা বাচ্চা বুড়ো, ল্যাংড়া-নুলো, সব মিলেও তিন হাজার হওয়াই কঠিন ছিল। তবু, মদীনার সৈন্যসংখ্যা যদি তিন হাজার ধরা হয়, তাহলেও শত্রুসৈন্যের সংখ্যা সেই তুলনায় সব মিলে চল্লিশ হাজার পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। যদি মনে করা হয় যে, শত্রুসৈন্যের সংখ্যা ছিল বিশ হাজার, তাহলে সেক্ষেত্রে, মদীনার প্রকৃত সৈন্যসংখ্যা হবে দেড় হাজার।

রসূলে করীম (সাঃ) যখন শত্রুর এই বিশাল সেনাবাহিনী এবং তাদের আক্রমণের প্রস্তুতির সংবাদ জানতে পেলেন, তখন তিনি সাহাবীদেরকে (রাঃ) ডেকে পরামর্শ চাইলেন যে, এই পরিস্থিতিতে কি করা যায়। সাহাবীগণের মধ্যে ছিলেন হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)। তিনি ছিলেন পারস্যের প্রথম মুসলমান। তাঁকে আঁ হযরত (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, 'এই রকম পরিস্থিতিতে তোমাদের দেশে কি করা হয় ?'

তিনি (রাঃ) বললেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্! শহর যখন অরক্ষিত থাকে, এবং সৈন্যসংখ্যাও কম থাকে, তখন আমাদের দেশের লোকেরা শহরের চতুর্দিকে খন্দক বা পরিখা খনন করে এবং ভিতরে অবস্থান গ্রহণ করেই শহর রক্ষা করে।'

রসূলে করীম (সাঃ) তাঁর (রাঃ) এই প্রস্তাব পসন্দ করলেন। মদীনার এক দিকে ছিল ছোট ছোট পাহাড়, আর একদিকে ঘন বসতি, যেখানটায় বাড়ীগুলো ছিল লাগালাগি -যার মধ্যে মাত্র গুটিকতক গলি দিয়ে ছাড়া শত্রু ঢুকতে পারবে না। আর এক দিকে ছিল কিছু বাড়ীঘর, কিছু ফলের বাগান এবং খানিকটা দূরে ইহুদী গোত্র বনু কোরায়যার কেল্লা। এই গোত্রটি যেহেতু মুসলমানদের সঙ্গে ঐক্যের চুক্তি করেছিল, সেহেতু এই এলাকাটিকেও সুরক্ষিত মনে করা হয়েছিল। চতুর্থ যে দিকটি ছিল, সেদিকেই ছিল শুধু খোলা ময়দান। এবং এইদিক থেকেই বিপদের আশঙ্কা ছিল সবচেয়ে বেশী।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সিদ্ধান্ত নিলেন যে, এই খোলা ময়দানের দিকটাতেই পরিখা খনন করা হবে, যেন দুশমন আকস্মিকভাবে শহরে ঢুকে পড়তে না পারে। সুতরাং তিনি দশ গজ করে খোঁড়ার জন্য দশজন করে লোককে দায়িত্ব দিলেন। এবং এভাবেই প্রায় এক মাইল দীর্ঘ একটা পরিখা খনন করা হলো। যখন পরিখা খনন করা হচ্ছিল, তখন এক জায়গায় মাটির নীচ থেকে এমন একটা পাথর বের হলো যা কিছুতেই ভাঙ্গা যাচ্ছিল না। সাহাবারা (রাঃ) ব্যাপারটা রসূলে করীম (সাঃ)-কে জানালেন। তিনি নিজে সেখানে গেলেন, নিজ হাতে কোদাল ধরলেন, এবং খুব জোরে পাথরটার উপরে আঘাত করলেন। কোদালের সেই আঘাতে পাথর থেকে আগুনের ফুল্‌কি বিচ্ছুরিত হয়ে গেল। তিনি (সাঃ) তকবীর দিয়ে উঠলেন, 'আল্লাহো আকবর'। আবার তিনি কোদাল মারলেন, আবার স্ফুলিঙ্গের আলো বিচ্ছুরিত হলে। তিনি আবার তকবীর দিলেন, 'আল্লাহো আকবর।' তিনি তৃতীয় বার কোদাল মারলেন, এবারও বিচ্ছুরিত হলো অগ্নিস্ফুলিঙ্গের আলো, পাথর ভেঙ্গে গেল। এবারেও তিনি তকবীর দিয়ে উঠলেন, 'আল্লাহো আকবর।'

সাহাবীরা (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্! আপনি কেন তিনবারই 'আল্লাহো আকবর' নারা লাগালেন ?'

উত্তরে তিনি বললেন, 'পাথরে কোদাল পড়াতে তিনবার যে আলোকের ঝলকানি ছড়িয়ে পড়েছিল, সেই তিন বারই আল্লাহ্‌তায়ালা আমাকে ইসলামের ভবিষ্যৎ উন্নতির দৃশ্যবলী দেখিয়েছেন। প্রথমবার আলোর ঝলকানিতে রোমান সাম্রাজ্যের সিরিয়ার মহলগুলো আমাকে দেখানো হয়েছে। এবং সেগুলির সমস্ত চাবিও আমাকে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়বার আলোর ঝলকানিতে মাদায়েনের শুভ্র মহলগুলো আমাকে দেখনো হয়েছে। এবং পারস্য সাম্রাজ্যের চাবিগুলিও আমাকে দেওয়া হয়েছে। তৃতীয়বার আলোর তীব্র ঝলকে আমাকে দেখানো হলো সানার তোরণ দুয়ার। এবং ইয়েমেন রাজ্যের চাবিগুলিও দেওয়া হলো আমাকে। অতএব, তোমরা আল্লাহ্‌তায়ালার অঙ্গীকারের উপরে দৃঢ় বিশ্বাস রাখো।'*

এত স্বল্প সংখ্যক লোক তো এত দীর্ঘ একটা পরিখা কোন সামরিক কৌশল অনুযায়ী খনন করতে পারছিল না। কাজেই, এই খন্দক মাত্র এতটুকু ফায়দাই দিতে পারে যে, শত্রুসৈন্য হঠাৎ করে ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে না। এই ধরনের একটা খন্দক পার হওয়াটা শত্রু সৈন্যের পক্ষে এমন কিছু একটা কঠিন কাজ ছিল না। এবং সেটাই লক্ষ্য করা যাবে পরবর্তী ঘটনাগুলো থেকে। শত্রুরাও

---

* *আস্ সিরাতুল হালবিয়া : ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৪৩, যুরকানী : ২য় খণ্ড, সিরাত ইবনে হিশাম : ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪০*

মদীনার পরিবেশ পরিস্থিতি জানতো। তাই তারাও ঠিক করেই রেখেছিল যে, খোলা ময়দানের দিক থেকেই আক্রমণ চালাতে হবে। সুতরাং শত্রুদের সৈন্যবাহিনী এই দিক দিয়েই মদীনায় প্রবেশের জন্য অগ্রসর হলো। এই খবর রসূলে করীম (সাঃ) পেয়ে গেলেন। তখন তিনি শহরের অন্যান্য দিকগুলো পাহারা দেওয়ার জন্য কিছুসংখ্যাক লোক মোতায়েন করলেন। এবং বাদবাকী লোকদেরকে নিয়ে যাদের সংখ্যা ছিল বারশ'য়ের মত তিনি পরিখা পাহারা দেওয়ার জন্য অগ্রসর হলেন।

খন্দকের যুদ্ধের সময়ে ইসলামী সৈন্যের সঠিক সংখ্যা কত ছিল ?

খন্দকের যুদ্ধের সৈন্যসংখ্যার হিসেব নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে যথেষ্ট মত পার্থক্য রয়েছে। কেউ কেউ লিখেছেন- এই সৈন্যসংখ্যা ছিল তিন হাজার, কেউ লিখেছেন বার/তের শ', কেউ বা সাত শ'। এই বিরাট মত পার্থক্যের সমাধান দৃশ্যতঃ কঠিন। কাজেই, ঐতিহাসিকরাও এর সমাধান দিতে পারেন নি। কিন্তু, এই মত পার্থক্যের তাৎপর্য আমার কাছে পরিষ্কার। এবং তা হচ্ছে তিন প্রকারের বর্ণনাই সঠিক। বলা হয়েছে যে, ওহোদের যুদ্ধে মুনাফেকদের চলে যাওয়ার পর মুসলমান সৈন্যদের সংখ্যা ছিল সাত শ'। তার মাত্র দু'বছর পরে সংঘটিত হয় খন্দকের যুদ্ধ। এই সময়ের মধ্যে কোনও বড় কবিলাও মুসলমান হয়ে মদীনায় আসেনি। কাজেই, এই সময়ের মধ্যে মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা সাত শ' থেকে তিনি হাজারে উন্নীত হওয়া সম্ভবপর ছিল না। অপরদিকে, এইরূপ ধারণা করারও জায়গা নেই যে, ওহোদের যুদ্ধের দু'বছর পর, ইসলামের উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও, যুদ্ধ করার মত উপযুক্ত লোকের সংখ্যা তেমনই ছিল যেমন ওহোদ যুদ্ধের সময় ছিল। অতএব, এই দুই বর্ণনা বিবেচনার পর বলা যায় যে, উভয় বর্ণনাই সঠিক ছিল। খন্দকের যুদ্ধের সময় যুদ্ধ করার মত উপযুক্ত লোকের সংখ্যা ছিল বার শ'। এখন বাকী থাকলো এই প্রশ্ন যে, তাহলে কেন এই সংখ্যা কেউ বলছেন তিন হাজার আর কেউবা সাত শ'? এর জওয়াব হচ্ছে, এই দুই বর্ণনা দুইটি পৃথক অবস্থার এবং দৃশ্যের। খন্দকের যুদ্ধের পর্যায় ছিল তিনটি। একটা পর্যায় হলো,- যখন শত্রুসৈন্য মদীনার কাছে এসে পৌঁছে নি এবং পরিখা খননের কাজ চলছিলই । এবং মাটি বহনের কাজে ছোট ছোট ছেলেরাও অংশ গ্রহণ করেছিল, এবং কখনও কখনও নারীরাও অর্থাৎ পরিখা খননের সময় মুসলমান সৈন্যের সংখ্যা যে তিন হাজার ছিল তাদের মধ্যে ছোট ছেলেরা এমনকি নারীরাও ছিল। এবং এই সংখ্যার মধ্যে কিছু সংখ্যক মহিলা ছিল যাঁরা পরিখা খোঁড়ার কাজ না

করলেও মাটি ফেলা ইত্যাদি উপরের কাজে অংশ নিয়েছিলেন। এটা আমার কোন ব্যক্তিগত ধারণা নয়, ইতিহাসেও এই ধারণার সমর্থন মিলে। বর্ণিত আছে যে, যখন পরিখা খোঁড়ার সময় এলো, তখন সব ছেলেদেরকেও জমা করা হলো। এবং সকল পুরুষ, তা সে বুড়োই হোক আর জওয়ানই হোক, পরিখা খননের কাজে, বা সেই কাজে সাহায্য করার কাজে নিয়োজিত করা হলো। পরে যখন শত্রু এসে পড়লো এবং যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) পনের বছরের কম বয়সের সব ছেলেদেরকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। আর যাদের বয়স পনের ছিল, তাদেরকে এই অনুমতি দিলেন যে, তারা ইচ্ছা করলে থাকতেও পারে, যেতেও পারে।*

এই বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, পরিখা খননের সময় মুসলমানদের সংখ্যা বেশী ছিল। কিন্তু যুদ্ধের সময় ছিল কম। কেননা, নাবালকদেরকে চলে যাওয়ার জন্য হুকুম দেওয়া হয়েছিল। কাজেই, যে সকল বর্ণনায় তিন হাজারের কথা বলা হয়েছে, সেই সকল বর্ণনা হচ্ছে পরিখা খননের সময়কার সংখ্যা যখন ছোট ছোট ছেলেরাও ছিল এবং কিছু সংখ্যক স্ত্রীলোকও ছিল। আর, বার শ'য়ের হিসাব হচ্ছে ঐ সময়ের যখন যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল যখন কেবল বয়স্ক পুরুষরাই ছিলেন। এখন বাকী রইলো সেই বর্ণনার কথা, যাতে সাত শ' বলা হয়েছে। এই বর্ণনাও কি ঠিক? এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, এই বর্ণনা দিয়েছেন ইবনে ইসহাক, যিনি ছিলেন একজন বিশ্বস্ত অথরিটি। এবং তাঁর বর্ণনাকে জোর সমর্থন করেছেন ইবনে হাযমের ন্যায় প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক। কাজেই এ বর্ণনাতেও সন্দেহের অবকাশ থাকার কথা নয় এবং এই বর্ণনাও সঠিক প্রমাণিত হয় তখন যখন আমরা ইতিহাসে বর্ণিত অন্যান্য ঘটনার দিকে তাকাই। যুদ্ধকালীন সময়ে বনু কোরায়যার লোকেরা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে কাফেরদের সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগদান করেছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, তারা অতর্কিতে মদীনার উপরে আক্রমণ চালাবে। কিন্তু, তাদের চক্রান্ত ফাঁস হয়ে যায়। কাজেই, যে দিকটায় বনু কোরায়যা গোত্র ছিল রসূলে করীম (সাঃ) সেই দিকটা রক্ষারও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন। ঐ দিকটার রক্ষাব্যবস্থা প্রথমে করা হয়নি। কারণ বনু কোরায়যার সঙ্গে মৈত্রীচুক্তি ছিল যে, তারা সেদিক দিয়ে শত্রুসৈন্য আসতে দিবে না। তাই, ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, যখন বনু কোরায়যার বিশ্বাস ঘাতকতার কথা জানা গেল, এবং যেহেতু প্রথমে বনু কোরায়যার উপরে বিশ্বাস রেখেই তাদের কেল্লার দিকটার এলাকাতেই মেয়েলোকদেরকে রাখা হয়েছিল এবং তাদের জন্য হেফাযতের বিশেষ প্রয়োজন বোধ করা হয়নি,

---

* *আস্ সিরাতুল হালবিয়া : ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪৪*

সেহেতু রসূলে করীম (সাঃ) এখন তাদের হেফাযতের ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন এবং দু'টো সৈন্যদল গঠন করে মেয়েলোকদের ঐ এলাকায় মোতায়েন করলেন। মোসলেম বিন আসালামকে (রাঃ) দু'শত সৈন্য দিয়ে এক জায়গায় এবং যায়েদ বিন্ হারসাকে (রাঃ) তিন শ' সৈন্য দিয়ে আর এক জায়গায় মোতায়েন করলেন এবং নির্দেশ দিলেন যে, মাঝে মাঝেই তারা যেন উচ্চস্বরে তক্‌বীর ধ্বনি দিতে থাকে। যাতে বুঝা যায় যে, স্ত্রীলোকদের সুরক্ষারও দৃঢ় ব্যবস্থা রয়েছে। এই বর্ণনা থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, খন্দকের যুদ্ধের সৈন্যসংখ্যা সাত শ' কেন বলেছেন ইব্‌নে ইস্‌হাক। কেননা, বার শ' সৈন্য থেকে পাঁচ'শ স্ত্রীলোকদের রক্ষার জন্য নিয়োজিত করা হয়েছিল। কাজেই, বার শ' সৈন্য শেষে সাত শ'তে এসে দাঁড়িয়েছিল। এবং এভাবেই, পরিখার যুদ্ধের সৈন্য সংখ্যা নিয়ে যে মত পার্থক্য বাহ্যতঃ দেখা যায়, তা দূরীভূত হয়। মোদ্দা কথা এই ভয়াবহ বিপজ্জনক অবস্থায় পরিখা রক্ষার জন্য রসূলে করীম (সাঃ)-এর সঙ্গে ছিল মাত্র সাত শ' সৈন্য। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তিনি কৌশলগতভাবে, পরিখা খনন করে ছিলেন, কিন্তু তথাপি শত্রুর অত বিশাল একটা সেনাবাহিনীকে প্রতিহত করার জন্য অত ছোট একটা সেনাদল কোনক্রমেই যথেষ্ট ছিল না। তবে, আল্লাহ্‌তায়ালার সাহায্যের উপরে ভরসা রেখে এই ছোট্ট সেনাবাহিনী ঈমান ও একীনের সঙ্গে পরিখার পিছনে থেকে শত্রুর বিশাল সেনাবাহিনীর প্রতীক্ষায় রইলো। স্ত্রীলোকদেরকে এবং ছোট ছেলে-মেয়েদেরকে দু'টো পৃথক পৃথক জায়গায় রাখা হলো। শত্রু যখন পরিখা পর্যন্ত এসে পৌছল তখন তারা হতভম্ব হয়ে গেল। কেননা, আরবের ইতিহাসে কাউকে কখনো যুদ্ধে এইরূপ কৌশল অবলম্বন করতে দেখা যায়নি। এবং এই ধরনের যুদ্ধের জন্য তারা আদৌ প্রস্তুত ছিল না; তারা পরিখার সামনে তাদের শিবির স্থাপন করলো এবং মদীনায় প্রবেশের উপায় খুঁজতে লাগলো।

বনু কোরায়যার বিশ্বাসঘাতকতা

মদীনার একটা বড় এলাকা যেহেতু পরিখা বেষ্টিত ছিল, এবং আর একটা এলাকায় ছিল কিছু পাহাড়ী টিলা ও কিছু শক্ত বাড়ীঘর এবং কিছু বাগান ইত্যাদি, সেহেতু শত্রুসৈন্য ঐসব এলাকা দিয়ে আক্রমণ চালাতে পারছিল না। কাজেই, তারা পরামর্শ করে ঠিক করলো যে, ইহুদীদের বনু কোরায়যা গোত্রের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করতে হবে। এতে মদীনা পর্যন্ত পৌছে যাওয়ার রাস্তা পাওয়া যাবে। সুতরাং পরামর্শমত, পূর্বে বিতাড়িত বনু নাযীর গোত্রের সর্দার হাই ইব্‌নে আখ্‌তার- যে একবার চক্রান্ত করেছিল সমগ্র আরবকে একত্রিত করে মদীনার

উপরে আক্রমণ চালানোর জন্য - তাকে কাফেরদের কমাণ্ডার আবু সুফিয়ান এই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করলো যে, সে যেন যে কোন প্রকারেই হোক বনু কোরায়যাকে রাজি করায়ে তাদেরকে এই যুদ্ধে শামিল করাতে পারে। তদনুসারে, হাই ইব্নে আখতার ইহুদীদের কেল্লায় গেল এবং সে বনু কোরায়যার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইলে। প্রথমে, তাকে সাক্ষাৎকার দিতে তারা অস্বীকার করলো। কিন্তু সে তাদেরকে বুঝালো যে, এবারে সমগ্র আরব মুসলমানদেরকে ধ্বংস করার জন্য সম্মিলিতভাবে এসেছে। এবং এবারে মুসলমানরা কোনক্রমেই তাদের মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে না। এবারে যে সেনাবাহিনী মুসলমানদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়েছে তাকে সেনা বাহিনী বললে ভুল করা হবে, বরং তাকে বলতে হবে সৈন্য সামন্তের এক উত্তাল মহাসমুদ্র। এইরূপ উস্কানীমূলক কথাবার্তার দ্বারা সে বনু কোরায়যা গোত্রকে অবশেষে বিশ্বাসঘাতকতা করতে এবং ঐক্যচুক্তি ভঙ্গ করতে রাজি করালো। এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো যে, কাফের সৈন্যবাহিনী সম্মুখ দিয়ে পরিখা অতিক্রম করার চেষ্টা করবে, এবং তারা যখন মদীনার সেই অংশের, উপরে আক্রমণ চালাবে যেখানে স্ত্রীলোকেরা ও ছেলেমেয়েরা রয়েছে, এবং যে এলাকাটাকে অরক্ষিত রাখা হয়েছে বনু কোরায়যার প্রতি আস্থা রেখেই। ফলে, এইভাবে, মুসলমানদের গোটা সামরিক শক্তিকেই সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে ফেলা সম্ভব হবে। এবং একই সঙ্গে মুসলমান নারী-পুরুষ, ছেলেমেয়ে সবাইকে হত্যা করাও সম্ভব হবে। এটা নিশ্চিত যে, কাফেরদের এই ষড়যন্ত্র যদি, কম হোক আর বেশী হোক, সফল হোত, তাহলে মুসলমানদের জন্য আত্মরক্ষার কোন ঠাঁই থাকতো না। বনু কেরায়যা মুসলমানদের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ ছিল, যদি তারা প্রকাশ্যে তাদের সাথে যুদ্ধে শামিল নাও হতো, তবু মুসলমানরা সঙ্গত কারণেই, এই প্রত্যাশা রাখতো যে, ওদের দিক থেকে মদীনার উপরে আক্রমণ পরিচালনা করা সম্ভব পর হবে না। এ জন্যই ঐ দিকটা সম্পূর্ণ অরক্ষিতই রাখা হয়েছিল। বনু কোরায়যা এবং কাফেররা এই অবস্থাটার প্রতি নযর রেখেই এই সিদ্ধান্ত নিল যে, বনু কোরায়যার কাফেরদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার ব্যাপারটা যেন কিছুতেই জানাজানি হয়ে না পড়ে, তাহলে মুসলমানরা ঐ অরক্ষিত এলাকাটাও সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা করবে। বলাই বাহুল্য, এই ষড়যন্ত্র ছিল সাংঘাতিক বিপজ্জনক।

মুসলমানদের গাফেল রেখে, শত্রুর সঙ্গে বনু কোরায়যার মিলিত হওয়ার কারণে, ইসলামী সৈন্যদের উপরে কাফের সৈন্যবাহিনীর প্রচণ্ড হামলার সময় মদীনার সেই দিকটা রক্ষা করা -যে দিকে বনু কোরায়যার কিল্লা ছিল -সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার ছিল। উভয় দিক থেকে মুসলমানদের উপরে আক্রমণের ব্যবস্থা সম্পন্ন করার পর মক্কার সেনাবাহিনী পরিখার উপর হামলা চালানো শুরু করলো।

প্রথম কায়েকদিন তো তারা কিছুই বুঝে উঠতে পারলো না যে, তারা পরিখা পার হবে কি ভাবে ? কিন্তু দিন কয়েক পর তারা একটা উপায় বের করলো যে, তীরন্দাজ সৈন্যরা উঁচু উঁচু জায়গায় খাড়া হয়ে সেই সব মুসলমান সৈন্যদের উপর তীর নিক্ষেপ শুরু করে, যারা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে পরিখা পাহারার কাজে নিয়োজিত আছে। যখন অবিরাম ধারায় অজস্র তীর বর্ষণ শুরু হলো, তখন মুসলিম সৈন্যরা বাধ্য হয়ে পিছু হটতে লাগলো। এই সুযোগে শত্রুপক্ষের জাঁদরেল ঘোড় সওয়ার সৈন্যরা খন্দক অতিক্রম করবার চেষ্টা চালাতে লাগলো। তারা মনে করলো, এই প্রকারের হামলার ফলে কোনও না কোনও জায়গা খালি করা যাবে এবং সেখান দিয়ে পদাতিক বাহিনী পরিখা পার হয়ে যেতে পারবে। তারা এই সব আক্রমণ এত উপর্যুপরি চালাতে থাকলো যে, মুসলমানরা নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ পাচ্ছিল না। এমনকি, একদিন এত প্রচণ্ড আক্রমণ চালানো হলো যে, মুসলমানরা সময়মত নামায পড়তেও পারলো না। এতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এত দুঃখ পেয়েছিলেন যে, তিনি বলেছিলেন,

'আল্লাহ্ যেন কাফেরদেরকে শাস্তি দেন, ওরা আমাদের নামাযও নষ্ট করে দিল।'* যদিও আমি ঘটনার বর্ণনা করছি শত্রুর প্রচণ্ড হামলার কথা বলার জন্যে, তবু এর মধ্য দিয়ে রসূলে করীম (সাঃ)-এর উজ্জ্বল চরিত্রের একটি দিকও ফুঠে উঠেছে। এবং এথেকে উপলব্ধি করা যায় যে, দুনিয়ার বুকে তাঁর কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় বিষয় ছিল খোদাতায়ালার এবাদত।

শত্রুসৈন্য যখন চারিদিক থেকে মদীনা ঘেরাও করে ফেলেছিল, যখন মদীনার পুরুষরা সবাই আলাদা হয়ে গিয়েছিল এবং স্ত্রীলোকদের ও বাচ্চা ছেলেমেয়েদের জীবন বিপদাপন্ন হয়ে পড়েছিল, যখন প্রতিমুহূর্তে মদীনাবাসীদের প্রাণ এই ভয়ে কাঁপছিল যে, না জানি কখন দুশমন মদীনার ভিতরে ঢুকে পড়ে; ঠিক সেই মুহূর্তেও মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রাণের ইচ্ছা একটা ব্যক্ত হয়েছে যে, খোদাতায়ালার এবাদত যেন ঠিক ঠিক সময় মত করা হয়। মুসলমানদের এবাদত ইহুদী, খৃষ্টান বা হিন্দুদের মত সপ্তাহে মাত্র একদিন করা হয় না। বরং মুসলমানদের এবাদত প্রত্যেক দিন রাতে পাঁচ বার করা হয়। অনুরূপ বিপদাপন্ন অবস্থায় তো কোন মানুষের পক্ষে দিনে একবার নামায পড়াই কঠিন ব্যাপার, পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া তো দূরস্থান, তাও আবার জামাতের সঙ্গে যথারীতি পড়া। কিন্তু ঐ মহা বিপদ সংকুল পরিস্থিতিতেও মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলোয়হে ওয়া সাল্লাম পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই

---

* *বুখারী : ২য় খণ্ড, কিতাবুল মাগাযী বাবু গাযওয়াতুল খন্দক*

যথারীতি সময়মতই আদায় করতেন। যদি একটা দিনও শত্রুদের প্রচন্ড হামলার মুখে তিনি তাঁর প্রভুর নাম স্বস্তি ও শান্তির সঙ্গে সময়মত নিতে না পারতেন, তাহলে তিনি কঠিন দুঃখ পেতেন।

ঐ সময়টাতে শত্রুরা আক্রমণ চালাচ্ছিল সম্মুখ থেকে এবং পিছন থেকে আক্রমণ চালাবার জন্য বনু কোরায়যা অপেক্ষায় ছিল যে, কোন সুযোগ পেলেই তারা মদীনায় ঢুকে পড়বে, এবং স্ত্রীলোকদেরকেও ছেলেমেয়েদেরকে হত্যা করে ফেলবে। কাজেই, বনু কোরায়যা একদিন, এক গুপ্তচরকে প্রেরণ করলো যাতে সে খোঁজ নিয়ে আসতে পারে যে, স্ত্রীলোকেরা ও ছেলেমেয়েরা একাকী আছে, নাকি তাদের পাহারার জন্য সেখানে যথেষ্ট সংখ্যক সৈন্যও মোতায়েন আছে। সেখানে একটা বিশেষ প্রাচীর ঘেরা এলাকা ছিল যার ভিতরে সেই সব বিশেষ বিশেষ পরিবারের লোকজনদেরকে একত্রে রাখা হয়েছিল, যাঁরা ছিলেন শত্রু পক্ষের বিশেষ লক্ষ্যস্থল। ঐ এলাকায় এসে গুপ্তচর লোকটা চারিদিকে ঘুরাফেরা করছিল এবং উঁকিঝুঁকি মেরে দেখছিল যে, মুসলমান সৈন্যরা কোথাও আত্মগোপন করে আছে কিনা। সে যখন উঁকিঝুঁকি মারছিল তখন আঁ হযরত (সাঃ)-এর ফুফুআম্মা হযরত সাফিয়া (রাযিঃ) তাকে দেখতে পেলেন। ঘটনাক্রমে, সেখানে তখন মাত্র একজনই পুরুষ মানুষ ছিলেন, এবং তিনিও অসুস্থ ছিলেন। হযরত সাফিয়া (রাঃ) তাঁকে বললেন যে, একটা লোক বহুক্ষণ ধরে মেয়েদের এলাকায় আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছে এবং তার ফিরে যাওয়ারও কোন লক্ষণ দেখছি না। সে চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে দেখছে। কাজেই সে নিশ্চয় কোন গুপ্তচর হবে। তুমি লোকটাকে আটকাও। নইলে শত্রুরা এখানকার অবস্থা জানতে পারলে আক্রমণ করে বসবে। কিন্তু ঐ অসুস্থ সাহাবী অপারগতা প্রকাশ করলেন। তখন হযরত সাফিয়া (রাঃ) নিজেই একটা শক্ত বাঁশের লাঠি নিয়ে ঐ লোকটাকে আক্রমণ করলেন এবং অন্যান্য মেয়েদের সাহায্যে তাকে হত্যা করলেন। পরে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে যে, লোকটা ঠিকই বনু কোরায়যা ইহুদীদের গুপ্তচর ছিল। এই ঘটনায় মুসলমানরা আরো বেশী উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লো। কেননা, তখন ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, মদীনার এই এলাকাটিও এখন আর সুরক্ষিত নয়। কিন্তু সম্মুখের দিকে দুশমনের হামলা এত প্রচণ্ড ছিল যে, তাঁরা এই দিকটার পাহারার কোন ব্যবস্থাই করতে পারছিলেন না। এতদ্সত্ত্বেও রসূলে করীম (সাঃ) স্ত্রীলোকদের ও ছেলেমেয়েদের রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। এবং পূর্বে বর্ণিত বার শ' সৈন্যর মধ্য থেকে পাঁচ 'শ সৈন্যকে ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীলোকদের রক্ষার জন্য শহরের মধ্যে মোতায়েন করলেন। তখন, পরিখা রক্ষার জন্য থাকলো শত্রু পক্ষের আঠার থেকে বিশ হাজার সৈন্যের মোকাবেলায় -মাত্র সাত শ' সৈন্য। এই পরিস্থিতিতে অনেক

মুসলমান ঘাবড়ে গিয়ে রসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকটে এলেন এবং আবেদন করলেনঃ

'ইয়া রসূলাল্লাহ্! অবস্থা তো মারাত্মক বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে, এখন আর মদীনা বাঁচাবার কোন আশা দেখছি না। এই অবস্থায় আপনি আল্লাহ্‌তায়ালার কাছে খাসভাবে দোয়া করুন, এবং আমাদেরকেও এমন কোন দোয়া শিখিয়ে দিন, যা পড়লে আল্লাহ্‌তায়ালার করুণা আমাদের উপরে অবতীর্ণ হবে।'

আঁ হযরত (সাঃ) বললেনঃ

'তোমরা ঘাবড়াবে না। তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে এই দোয়া করতে থাক যে, তিনি যেন তোমাদের দুর্বলতাসমূহ পর্দা দিয়ে ঢেকে দেন। এবং তোমাদের হৃদয়কে সুদৃঢ় করে দেন এবং তোমাদের ভয়-ভীতি দূর করে দেন।'

অতঃপর তিনি নিজেও এই দোয়া করলেন ঃ*

اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب
اللهم اهزمهم وزلزلهم

(বুখারী)

'হে সেই আল্লাহ্! যে তুমি আমার উপরে কোরআন অবতীর্ণ করেছ, এবং যে তুমি অতি দ্রুত তোমার বান্দার কাছ থেকে হিসাব নিয়ে থাক, তুমি, এই বাহিনীকে যা সম্মিলিতভাবে আমাদেরকে আক্রমণ করতে এসেছে, তুমি তাদেরকে পরাজয় দান করো। এবং আমাদেরকে ওদের উপরে বিজয় দান করো। এবং ওদের যাবতীয় হীন চক্রান্তকে ছিন্নভিন্ন করে নস্যাৎ করে দাও।'

এবং একইভাবে, এই দোয়াও করলেন ঃ *

يا صريخ المكروبين يا مجيب المضطرين اكشف
همي وغمي وكربي فانك ترى ما نزل بي وباصحابي

'হে বিপদগ্রস্ত ও দুঃখকষ্টে পীড়িত মানুষের প্রার্থনা শ্রবণকারী! হে উৎকণ্ঠিত ও আতংকিত মানুষের প্রার্থনার উত্তরদানকারী! আমার দুঃখ, আমার দুশ্চিন্তা, আমার উৎকণ্ঠা দূর করে দাও! এবং তুমি তো জানই ঐ সমস্ত দুঃখ কষ্টকে যে সবের সম্মুখীন হতে হয়েছে আমাকে এবং আমার সঙ্গীদেরকে।'**

---

* *বুখারী : ২য় খণ্ড, কিতাবুল মাগাযী, বাবু গাযওয়াতুল খন্দক*

** *আস্ সিরাতুল হালবিয়া : ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৫৩*

মুনাফেক ও মুমিনের অবস্থা

এই পরিস্থিতিতে মুনাফেকরা খুব বেশী ঘাবড়ে গেল। এমনি কি, ভয়ে তারা তাদের কওমী সম্মানের কথা, তাদের শহরের নিরাপত্তার কথা, তাদের স্ত্রী লোকদের ও ছেলেমেয়েদের রক্ষার কথা সব ভুলে গেল। কিন্তু, যেহেতু ওরা নিজেদের গোত্রের সামনে লজ্জিত হতেও চাচ্ছিল না, সেহেতু ওরা নানান বাহানায় সেনাবাহিনী থেকে ফেরার হয়ে যাওয়ার সুযোগ খুঁজছিল। এদের সম্পর্কে কোরআন করীমে বলা হয়েছে ঃ

وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ ۛ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۛ إِن يُرِيدُونَ
إِلَّا فِرَارًا ﴿١٣﴾

-(সূরা আহ্যাব : আয়াত ১৪, রুকূ ২)-

অর্থাৎ- তাদের মধ্য থেকে এক দল রসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকটে এলো, এবং তাঁর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলো যে, তাদেরকে যুদ্ধ থেকে পিছনে সরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হোক। এবং তারা বললো (এখন যেহেতু-ইহুদীরাও বিপক্ষে চলে গেছে, সেহেতু সেদিক থেকে মদীনাকে রক্ষা করার আর কোন উপায় নেই) 'আমাদের বাড়ীঘর ঐ এলাকার দিক থেকে অরক্ষিত অবস্থায় আছে।' (সুতরাং আমাদেরকে অনুমতি দিন, আমরা ফিরে গিয়ে আমাদের বাড়ীঘর রক্ষা করি) কিন্তু তাদের এই কথাটা বলা যে, তাদের বাড়ীঘর অরক্ষিত অবস্থায় আছে, সম্পূর্ণ ভুল। কেননা, সেগুলি অরক্ষিত ছিল না। (কারণ, খোদাতায়ালা মদীনার হেফাযতের জন্য প্রস্তুত ছিলেন)। ওরা শুধু ভয়ের কারণে যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালাতে চাচ্ছিল।

এই সময়ে মুসলমানদের যে অবস্থা ছিল, সে সম্পর্কেও কোরআন করীমে বলা হয়েছেঃ

إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ
وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ﴿١٠﴾ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴿١١﴾ وَإِذْ يَقُولُ
الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢﴾
وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا

-(সূরা আহযাব ঃ আয়াত ১১-১৪, রুকূ ২)-।

অর্থাৎ- স্মরণ করো (সেই সময়ের কথা)! যখন (শত্রুর) সৈন্যবাহিনী তোমাদের আক্রমণ করলো - তোমাদের উপর থেকেও এবং তোমাদের নীচ

থেকেও। অর্থাৎ নীচের দিক থেকে কাফেররা এবং উপরের দিক থেকে ইহুদীরা। তখন, তোমাদের চোখ ঠিকরে বেরিয়ে পড়ার উপক্রম হলো এবং প্রাণ কণ্ঠাগত হতে লাগলো, এমনকি তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ খোদার প্রতিও কুধারণা পোষণ করতে শুরু করলো, তখন মুমিনদের ঈমানের পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। এবং মুমিনদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত টলায়মান করে দেওয়া হয়েছিল। এবং স্মরণ করো! যখন মুনাফেকরা এবং ঐ সমস্ত লোকেরা যাদের হৃদয় ব্যধিগ্রস্ত ছিল, তারা বলাবলি শুরু করেছিল, 'আল্লাহ ও তাঁর রসূল আমাদের কাছে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন'। এবং স্মরণ করো। যখন তাদের মধ্য থেকে একটা দল এত দূর পর্যন্ত গিয়েছিল যে, তারা মুমিনদেরকেও গিয়ে বলতে শুরু করলো, 'এখন কোন ফাঁড়ি বা কেল্লা আর তোমাদেরকে বাঁচাতে পারবে না। কাজেই, এখান থেকে পালাও।' কিন্তু সেই মুমিনদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا
زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴿٢٢﴾ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ
فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴿٢٣﴾

-(সূরা আহযাব ঃ আয়াত ২৩-২৪, রুকূ ৩)-

অর্থাৎ- মুনাফেক ও দুর্বল ঈমানের লোকদের তুলনায় মুমিনদের অবস্থা এই ছিল যে, যখন তারা অসংখ্য শত্রুসৈন্য দেখতে পেলো, তখন তারা বলতে থাকলো, 'এই সেনাবাহিনী সম্পর্কেই তো আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সাঃ) পূর্বেই আমাদেরকে অবহিত করেছিলেন। এই সৈন্যবাহিনীর আক্রমণ তো আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের সত্যতারই প্রমাণ। এবং সেই বিশাল সৈন্যবাহিনী তাদের ঈমানকে একটুও হেলাতে পারলো না। বরং ঈমান ও আনুগত্যে মুসলমানরা আরো বেশী মজবুত হলো। মুমিনের অবস্থা তো এই যে, তারা আল্লাহ্র সঙ্গে যে অঙ্গীকার করেছিল, তা পুরোপুরি তারা রক্ষা করে চলেছিল। অনেকে এমনও ছিলেন যাঁরা জীবন দিয়েই তাঁদের অঙ্গীকার পালন করে ছিলেন। আবার অনেকে এমনও ছিলেন যে, জীবন দেওয়ার সুযোগ তাঁরা পাননি বটে, কিন্তু প্রতি মুহূর্তে এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন, যদি খোদার রাস্তায় জীবন দেওয়ার সুযোগ তাঁরা পেয়ে যান, তাহলে তৎক্ষণাৎ প্রাণ বিসর্জন দিবেন। এবং প্রথম দিনেই তারা যে অঙ্গীকার আল্লাহ্র সাথে করেছিলেন, তা তাঁরা পালন করে যাচ্ছিলেন।

ইসলামে মৃতব্যক্তির লাশের সম্মান

যে সকল শত্রুসৈন্য পরিখা অতিক্রম করার জন্য আক্রমণ চালাচ্ছিল, তারা কখনও কখনও সফলকামও হচ্ছিল। এমনকি, একদিন কাফেরদের বড় বড় কয়েকজন জেনারেল পরিখা পার হয়ে এপারে এসে গেল। কিন্তু মুসলিম সৈন্যরা এমন প্রাণপণে আক্রমণ চালালো যে, তাদের পিছে হটে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকলো না। এমনকি পরিখা অতিক্রম করে আসার সময় কাফেরদের নওফেল নামক একজন বড় নেতা মারা গেল। নওফেল এত বড় নেতা ছিল যে, কাফেররা মনে করলো -যদি তার লাশের অবমাননা করা হয়, তাহলে আরবে তাদের আর মুখ দেখাবার জায়গা থাকবে না। তাই, তারা রসূলে করীম (সাঃ)-এর কাছে বার্তা পাঠালো যে, যদি তিনি (সাঃ) ঐ লাশ ফিরিয়ে দেন, তাহলে তারা তাঁকে (সাঃ) দশহাজার স্বর্ণমুদ্রা দিতে প্রস্তুত আছে। ঐ লোকগুলোর ধারণা তো এটাই ছিল যে, যেভাবে তারা মুসলিম নেতাদের লাশের, এমনকি, স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর চাচার লাশেরও নাক, কান কেটে ওহোদের যুদ্ধে তাঁদের লাশের অবমাননা করেছে, হয়ত সেভাবেই আজ মুসলমানরাও তাদের ঐ নেতার নাক, কান কেটে তাদের জাতির বেইজ্জতী করবে। কিন্তু, ইসলামের রীতিনীতি তো সম্পূর্ণরূপে অন্য প্রকারের। ইসলাম মৃত ব্যক্তির লাশের অসম্মান করার অনুমতি দেয় না। কাজেই, যখন কাফেরদের ঐ বার্তা রসূলে করীম (সাঃ)-এর কাছে পৌঁছল, তখন তিনি বললেনঃ

'এ লাশ দিয়ে আমরা কি করবো ? এ লাশ আমাদের কোন্ কাজে আসবে, যে জন্য আমরা তোমাদের কাছে এর মূল্য গ্রহণ করবো? ইচ্ছা করলে তোমাদের লাশ তোমরা নিয়ে যেতে পার। এ নিয়ে আমাদের করার কিছু নেই'। *

মুসলমানদের উপরে সম্মিলিত বাহিনীর আক্রমণ

ঐ দিনগুলোতে যে প্রচণ্ডতার সাথে কাফেররা আক্রমণ চালাতো তার বর্ণনা দিতে গিয়ে মুইর লিখেছেনঃ

Next morning, Mahomed found the whole force of the Allies drawn out against him. It required the utmost activity and an unceasing vigilance on his side to frustrate the manoeuvres of the

---

* *আস্ সিরাতুল হালবিয়া : ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪৫*

enemy. Now they would threaten a general assault ; then breaking up into divisions they would attack various posts in rapid and distracting succession; and at last, watching their opportunity, they would mass their troops on the least protected point, and, under cover of a sustained and galling discharge of arrow, attempt to force the trench. Over and again a gallant dash was made at the city, and at the tent of Mahomed, by such leaders of renown as Khalid and 'Amru; and these were only repelled by constant counter-marches and unremitting archery. This continued throughout the day; and, as the army of Mahomed was but just sufficient to guard the long line, there could be no relief. Even at night Khalid, with a strong party of horses, kept up the alarm, and still threatening the line of defence, rendered outposts at frequent intervals necessary. But all the endeavours of the enemy were without effect. The trench was not crossed. *(Life of Mohammad, London, 1878, p. 322)*

অর্থাৎ 'পরদিন ভোরে মুহাম্মদ (সাঃ) দেখতে পেলেন যে, সমগ্র সেনাবাহিনী সম্মিলিতভাবে আক্রমণ চালাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। তাদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য অত্যন্ত সতর্কতার সহিত প্রতি মুহূর্তে প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন। কখনো কখনো তারা সমবেত হামলা চালাতে থাকলো। আবার কখনো কখনো বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন ফাঁড়িতে আক্রমণ চালাতে থাকলো। যখন কোনও একটা ফাঁড়িকে কিছুটা অরক্ষিত অবস্থায় পেয়ে যেত, তারা তখন সকল সৈন্য একত্রিত করতো এবং বিরতিহীনভাবে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর নিক্ষেপ করতে থাকতো এবং তারই ছত্রছায়ায় পরিখা অতিক্রম করার চেষ্টা করতো। খালেদ এবং উমরুর মত বিখ্যাত জেনারেলদের নেতৃত্বে সৈন্যরা একটার পর একটা প্রচণ্ড আক্রমণ চালাতে থাকলো শহরে প্রবেশের জন্য। এক সময়, মুহাম্মদ (সাঃ)-এর তাঁবুটিও শত্রু সৈন্যের আক্রমণের আওতায় এসে পড়লো। কিন্তু (মুসলিম সৈন্যদের) দুর্দমনীয় প্রতিরোধ এবং অবিরাম তীর বর্ষণ হামলাকারীদেরকে পিছু হটে যেতে বাধ্য করলো। এইরূপ হামলা সারা দিন ধরে চললো। এবং যেহেতু মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সৈন্যসংখ্যা ছিল সাকল্যে মাত্র সেই দীর্ঘ পরিখা পাহারা দেওয়ার মত (তার বেশী ছিল না), সেহেতু তাদের বিশ্রামেরও কোনও অবকাশ ছিল না। রাত এসে গেল। কিন্তু রাতের বেলায়ও খালেদ একটা অশ্বারোহী সেনাদল নিয়ে আক্রমণ অব্যাহত রাখলো এবং

প্রতিরক্ষা ভেদ করার চেষ্টা চালাতে থাকলো। ফলে, মুসলমানদেরকে রাত্রিতেও চৌকি পাহারার কাজে নিয়োজিত থাকতে হলো। কিন্তু, শত্রুর যাবতীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। পরিখা অতিক্রম করা তাদের পক্ষে সম্ভব হলো না।'

যুদ্ধ দু'দিন ধরে চললো। কিন্তু, তবু হাতাহাতি যুদ্ধ হলো না। চব্বিশ ঘন্টার যুদ্ধে সম্মিলিত বাহিনীর মাত্র তিনজন সৈন্য নিহত হলো। এবং মুসলমানদের পাঁচ জন। এই আক্রমণে আওস গোত্রের নেতা সায়াদ বিন মুয়ায (রাঃ), যিনি রসূলে করীম (সাঃ)-এর একজন ঘনিষ্ঠ ও একনিষ্ঠ সাহাবী ছিলেন, তিনি মারাত্মকভাবে আহত হলেন। আক্রমণের পর আক্রমণের ফলে পরিখার একটা কোণা ভেঙ্গে পড়েছিল এবং সেদিন থেকে হামলা চালানো সহজতর হয়েছিল। রসূলে করীম (সাঃ)-এর সাহসিকতা এবং সেই সঙ্গে মুসলমানদের জন্য তাঁর মঙ্গলকামিতার অবস্থা এইরূপ ছিল যে, তিনি নিজে প্রবল শীতের মধ্যেও রাত্রে উঠে উঠে এ স্থানটায় যেতেন এবং পাহারা দিতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেনঃ পাহারা দিতে দিতে তিনি অবসন্ন হয়ে পড়তেন, এবং ঠাণ্ডায় প্রায় অবশ হয়ে পড়তেন। কোন মতে ফিরে এসে বিছানায় কিছুক্ষণ আমার পাশে লেপ গায় দিয়ে শুয়ে থেকে শরীরটাকে একটুখানি গরম করে নিয়ে আবারও সেই স্থানটা পাহারা দিতে যেতেন। এমনিভাবে অনবরত জেগে থাকতে থাকতে একদিন তিনি সম্পূর্ণরূপে অবসন্ন হয়ে পড়লেন এবং রাত্রি বেলায় বললেন, 'হায় রে! এই সময় যদি কোন নিষ্ঠাবান মুসলমান এখানে থাকতো, তাহলে আমি একটুখানি জিরিয়ে নিতে পারতাম।' তৎক্ষণাৎ বাইরে সায়াদ বিন ওক্কাসের গলার আওয়াজ শোনা গেল। তিনি (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, 'কে ওখানে ? কেন এসেছ ?' সায়াদ বললেন, 'আমি এসেছি, আপনার পাহারার জন্যে।' তিনি (সাঃ) বললেনঃ 'আমার পাহারার দরকার নেই। তুমি বরং সেই জায়গাটায় যাও যেখানে পরিখার পাড় ভেঙ্গে পড়েছে। এবং সেখানেই পাহারা দাও যাতে মুসলমানরা রক্ষা পায়।'*

অতএব, সায়াদ সেই স্থানটায় পাহারা দেওয়ার জন্য চলে গেলেন। এবং আঁ হযরত (সাঃ) শুয়ে পড়লেন। আশ্চর্যের ব্যাপার যে, রসূলে করীম (সাঃ) যখন প্রথম মদীনায় এসেছিলেন এবং খুব ভয়ানক বিপদ দেখা দিয়েছিল, তখনও সায়াদ (রাঃ) পাহারা দেওয়ার জন্য এসেছিলেন।

যাহোক, ঐ সময়ে আর একদিন তিনি (সাঃ) যখন কিছু লোকের চলাচলের আওয়াজ, পেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কারা ?'

আবাদা বিন বশীর উত্তর দিলেন, 'আমি।'

---

* *আস্ সিরাতুল হালবিয়া : ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৫৩*

তিনি বললেন, 'তোমার সঙ্গে আর কে কে আছে?'

তিনি বললেন, 'আমার সাথে সাহাবীদের একটি জামাত আছে। যাঁরা আপনার তাঁবু পাহারা দিতে এসেছেন।'

তিনি (সাঃ) বললেন, 'এই মুহূর্তে তো মুশরেকরা পরিখা অতিক্রম করার চেষ্টা চালাচ্ছে। ওখানেই যাও এবং ওদেরকে প্রতিহত কর। আমার তাঁবুর পাহারা ছেড়ে দাও'।

বনু কোরায়যা ও মুশ্‌রেকদের মিলিত আক্রমণের প্রস্তুতি এবং তাদের ব্যর্থতা

উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইহুদীরা মদীনাতে চুপিসারে প্রবেশ করবার চেষ্টা চালিয়েছিল। এবং এই প্রচেষ্টায় তাদের এক গুপ্তচর মারা পড়েছে। ইহুদীরা যখন এটা বুঝতে পারলো যে, তাদের চক্রান্ত ধরা পড়ে গেছে, তখন তারা প্রকাশ্যেই সাহসের সঙ্গে আরবদেরকে সাহায্য করা শুরু করে দিল। যেহেতু মদীনার পিছন দিক থেকে সম্মিলিতভাবে হামলা চালানো সুবিধাজনক ছিল না, কেননা এ দিকটায় ময়দান ছিল ছোট এবং মুসলমানদের সৈন্যরাও মোতায়েন ছিল বলে বড় আকারের আক্রমণ পরিচালনাও সম্ভব ছিল না, -সেহেতু কিছুদিন পর উভয় পক্ষ এই সিদ্ধান্ত নিল যে, একটা নির্দিষ্ট সময়ে, ইহুদী এবং মুশরেকদের সৈন্যরা একসাথে মুসলমানদের উপরে আক্রমণ করে বসবে। কিন্তু এই সময়ে আল্লাহ্‌তায়ালা সাহায্য করলেন এক আশ্চর্য উপায়ে এবং তা হলোঃ গোৎফান কবিলার নঈম নামক এক ব্যক্তি মনে মনে মুসলমান ছিল। এই ব্যক্তিও কাফেরদের সঙ্গে এসেছিল। তবে সে এই অপেক্ষায় ছিল যে, যদি কোন সুযোগ সে কখনো পেয়ে যায়, তাহলে সে মুসলমানদের সাহায্য করবে। একথা একজন মানুষ কী-ই বা এমন করতে পারে! কিন্তু, যখন সে দেখতে পেল যে, ইহুদীরাও কাফেরদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে এবং দৃশ্যতঃ মুসলমানদের রক্ষা পাওয়ার আর কোনই উপায় নেই, তখন সে এই অবস্থায় খুব বেশী চিন্তিত হয়ে পড়লো। এবং সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে, এই ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করার জন্য তাকে একটা কিছু করতেই হবে।

শত্রুরা যখন সিদ্ধান্ত নিল যে, দুই পক্ষ মিলেই একদিন একসঙ্গে আক্রমণ চালাবে, তখন নঈম বনু কোরায়যা গোত্রের নিকটে গেল এবং তাদের নেতৃবৃন্দকে বললো, 'যদি আরবদের সেনাবাহিনী চলে যায় বা পশ্চাদপসরণ করে, তাহলে বলতে পার মুসলমানরা তোমাদের সঙ্গে কী ব্যবহার করবে? তোমরা তো

মুসলমানদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ আছ। এবং সেই চুক্তি ভঙ্গ করার অপরাধে তোমাদের যে শাস্তি পাওনা হবে, তা কি কখনও চিন্তা করে দেখেছ ?' নঈমের এই কথায় ইহুদীরা কিছুটা ভয় পেয়ে গেল, এবং তারা তাকে জিজ্ঞেস্ করলো, 'তাহলে আমরা এখন কি করতে পারি?' নঈম বললো, 'আরবরা যখন তোমাদেরকে যৌথভাবে হামলা করার জন্য বলছে, তখন তোমরা তাদেরকে এই শর্তের কথা বলে পাঠাও যে, তোমরা তোমাদের সত্তুর জন লোককে আমাদের কাছে জিম্মীস্বরূপ পাঠিয়ে দাও, তারা আমাদের কেল্লাগুলোকে পাহারা দেবে। তাহলে আমরা তখন মদীনার পিছন দিক থেকে আক্রমণ করতে পারবো।'

নঈম সেখান থেকে চলে এসে মুশরেকদের কাছেও গেল এবং তাদেরকে বললোঃ

'এই ইহুদীরা তো মদীনার অধিবাসী। এরা যদি মওকা বুঝে তোমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে বসে, তাহলে তোমরা কি করবে? এরা যদি মুসলমানদেরকে খুশী করার জন্য এবং নিজেদের অপরাধ ক্ষমা করে নেওয়ার জন্য তোমাদের কাছে জিম্মীস্বরূপ তোমাদের লোক চায় এবং তাদেরকে মুসলমানদের হাতে তুলে দেয়, তাহলেই বা তোমরা কি করবে ? তোমাদের উচিত হবে ওদেরকে পরীক্ষা করে দেখা যে, আসলে ওরা ঠিক থাকবে কি না? এবং সেজন্য ওদেরকে বলতে হবে এক্ষুণি তোমাদের সঙ্গে মিলিতভাবে এক সঙ্গেই আক্রমণ করতে।'

কাফেরদের নেতৃবৃন্দ নঈমের এই পরামর্শকে সঠিক মনে করলো এবং পরদিন ইহুদীদের কাছে এই বার্তা পাঠিয়ে দিল, 'আমরা সম্মিলিত আক্রমণ চালাতে যাচ্ছি, তোমরাও তোমাদের সৈন্য সামন্ত নিয়ে আগামী কাল আক্রমণ করো'। ওদিক থেকে বনু কোরায়যাও বলে পাঠালো, 'একে তো আগামীকাল আমাদের সাব্বাতের দিন, এদিনে আমরা যুদ্ধ করতে পারি না; দ্বিতীয়তঃ আমরা মদীনার অধিবাসী, তোমরা বাইরের, যদি তোমরা যুদ্ধ ছেড়ে চলে যাও, তাহলে আমাদের অবস্থাটা কি হবে ? সুতরাং, তোমরা যদি তোমাদের সত্তুর জন লোককে জিম্মী হিসেবে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দাও, তাহলে আমরা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারি।'

কাফেরদের মনে যেহেতু প্রথম থেকেই সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছিল, সেহেতু তারা ইহুদীদের এই দাবী পূরণ করতে রাজি হলো না। এবং বলে পাঠালো, 'আমাদের সঙ্গে যদি তোমাদের ঐক্য ঠিক থাকে তাহলে তো তোমাদের এই জাতীয় দাবীর কোন অর্থ হয় না।' এই ঘটনায় ইহুদীদের মনেও সন্দেহের সৃষ্টি হলো। এবং এটা তো স্বাভাবিক যে, যখন সন্দেহ সৃষ্টি হতে থাকে, তখন সাহসও শেষ হতে থকে।

মনের মধ্যে এইরূপ সন্দেহ ও সংশয় নিয়েই কাফেরদের সৈন্যরা বিশ্রাম করার জন্য নিজেদের শিবিরে শিবিরে ফিরে গেল।

এদিকে খোদাতায়ালা আসমানী সাহায্যের আরও একটি রাস্তা খুলে দিলেন। রাত্রিতে প্রবল বাতাস বইতে শুরু করলো। যার ফলে তাঁবুগুলি ছিড়ে ছুটে উড়ে যেতে লাগলো। চুল্লীগুলোর উপর থেকে ডেগচিগুলো উল্টে পড়ে আগুন নিভে গেল। যে সব গোত্র তাঁবুর সামনে আগুন জ্বালিয়ে রেখেছিল তাদের সেই সব আগুন নিভে গেল। পৌত্তলিক আরবদের একটা কুসংস্কার ছিল যে, তারা সারা রাত ধরে আগুন জ্বালিয়ে রাখতো, এবং এটাকে মনে করতো শুভ লক্ষণ, এবং সেই সব আগুন নিভে যাওয়াকে মনে করতো অশুভ লক্ষণ। কাজেই, যাদের আগুন নিভে গেল, তারা মনে করলো, আজকের দিনটি ভাল নয় সুতরাং সেদিনের জন্য তারা তাদের তাঁবুগুলো উঠায়ে নিয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পিছনে সরে যেতে লাগলো, এবং মনে করলো যে, একদিন পরে এসে আবার যুদ্ধ শুরু করা যাবে। কিন্তু, যেহেতু দিনের বেলায় তর্কবিতর্কের ফলে নেতৃবৃন্দের মনে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছিল, সেহেতু যে সকল গোত্র পিছনে সরে যাচ্ছিল, তাদের আশে পাশের গোত্রগুলো মনে করলো, ইহুদীরা হয়তো মুসলমানদের সঙ্গে মিলিত হয়ে একত্রে আক্রমণ করে বসেছে। তাই, আমাদের আশেপাশের গোত্রগুলো শিবির গুটিয়ে জায়গা ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং, তারাও দ্রুত তাদের তাঁবুটাবু উঠায়ে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালাতে লাগলো। আবু সুফিয়ান তার তাঁবুর মধ্যে রাতে আরামে ঘুমুচ্ছিল। তার কাছেও এই ঘটনার খবর পৌঁছে গেল। সে ঘাবড়ে গিয়ে তড়িঘড়ি করে তার উটের উপরে চেপে বসেলো এবং সেটাকে চাবুক মারতে লাগলো। কিন্তু উটটি ছিল বাঁধা কাজেই সেটা মারের চোটে সেখানেই ঘুরপাক খাচ্ছিল। শেষে অন্য লোকেরা তাকে বললো যে, সে কী আহাম্মকী শুরু করেছে, বাঁধা উটকে পিটাচ্ছে! তখন সে তার উটের বাঁধন খুলে দিল এবং সঙ্গীদেরকে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেল।

রাত্রি তৃতীয় প্রহরে দেখা গেল, যে ময়দানে প্রায় বিশ/ পঁচিশ হাজার কাফের সৈন্য তাঁবু গেড়ে অবস্থান করছিল, সেই ময়দান জনপ্রাণী শূন্য মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। ঐ সময়ে আল্লাহ্তায়ালা রসূলে করীম (সাঃ)-কে ইলহাম (ঐশী বাণী) যোগে জানালেন যে, আমি তোমার শত্রুকে বিতাড়িত করে দিয়েছি। তিনি (সাঃ) ব্যাপারটা পুরোপুরি জানার জন্য কাউকে পাঠাতে চাইলেন এবং তাঁর আশেপাশের সাহাবীদেরকে ডাক দিলেন। প্রচণ্ড শীত পড়ছিল, মুসলমানদের কাছে তেমন কাপড় চোপড়ও ছিল না। হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডার মুখ থেকে ঠিক মত আওয়াজও বের হচ্ছিল না। এ সম্পর্কে সাহাবীদের কেউ কেউ বলেছেন, 'মনে

হচ্ছিল রসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) গলার আওয়াজ কিন্তু, আমরা ঠাণ্ডার চোটে কথাই বলতে পারছিলাম না।' যাহোক, হোযায়ফা (রাঃ) বল্‌লেন - 'ইয়া রসূলল্লাহ্‌! কি করতে বলছেন ?' তিনি (সাঃ) বল্‌লেন, 'তুমি না হয় আর কাউকে বলো। আর কেউ নেই ?' কিন্তু যাঁরা ছিলেন তাঁরা জেগে থাকালেও প্রচণ্ড ঠাণ্ডার কারণে কথা বলতে পারছিলেন না। হোযায়ফা আবার বল্‌লেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্‌! আমিই তো আছি।' শেষে, আঁ হযরত (সাঃ) হোযায়ফাকে ডেকে বল্‌লেন, 'আল্লাহ্‌তায়ালা এই বলে আমাকে খবর দিয়েছেন, 'আমি তোমার শত্রুদের তাড়িয়ে দিয়েছি।' এখন তুমি গিয়ে দেখ তো দুশমনের অবস্থা কী ?' হোযায়ফা পরিখার কাছে গেলেন, এবং দেখলেন যে, সারাটা যুদ্ধক্ষেত্রের কোথাও কোন শত্রুসৈন্য নেই। তিনি ফিরে এলেন, এবং কলেমা শাহাদৎ পড়তে পড়তে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর রেসালাতের সত্যতা ঘোষণা করতে লাগলেন এবং বল্‌লেন যে, শত্রু যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে গেছে। সকাল বেলা মুসলমানরা নিজেদের তাঁবু গুটায়ে নিজ নিজ ঘরে ফিরতে লাগলেন। *

বনু কোরায়যার বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি

বিশ দিন পর মুসলমানরা একটু স্বস্তির সঙ্গে নিঃশ্বাস ফেলতে পারলেন। কিন্তু, এখন বনু কোরায়যার বিষয়টাও তৎক্ষণাৎ নিস্পত্তি হওয়া দরকার। গাদ্দারী তো এমন পর্যায়ের ছিল না যে, তা উপেক্ষা করা যায়। রসূলে করীম। (সাঃ) ফিরে এসে সাহাবাগণকে (রাঃ) বললেনঃ

'ঘরে বসে আরাম করা যাবে না। বরং সন্ধ্যা হওয়ার আগেই বনু কোরায়যার কেল্লা পর্যন্ত পৌঁছে যেতে হবে।' এবং তিনি হযরত আলীকে (রাঃ) বনু কোরায়যা গোত্রের নিকটে পাঠায়ে দিলেন যেন তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন যে, তারা চুক্তিবদ্ধ সত্ত্বেও, এই গাদ্দারী, এই বিশ্বাসঘাতকতা করলো কেন। কিন্তু এ ব্যাপারে বনু কোরায়যা না লজ্জিত হলো, না ক্ষমা প্রার্থনা করলো, না কোনও অজুহাত দেখিয়ে দুঃখ প্রকাশ করলো। হযরত আলী ও তাঁর সঙ্গীদেরকে ভালমন্দ যা তা বলা শুরু করল। তারা রসূলে করীম (সাঃ)-কে এবং তাঁর পরিবারের মহিলাদেরকে গালি গালাজ করতে লাগলো। তারা এঁহাতক বললো, 'আমরা জানি না মুহাম্মদ (সাঃ) কে ? তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।' হযরত আলী (রাঃ) সাহাবীদেরকে সঙ্গে নিয়ে ইহুদীদের কেল্লার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলেন। যেহেতু, ইহুদীরা জঘন্য সব গালিগালাজ করছিল, এবং রসূলে

---

* *আস্‌ সিরাতুল হালবিয়া: ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৫৪ ।*

করীম (সাঃ)-এর বিবি ও মেয়েদের সম্পর্কে নাপাক কথাবার্তাও বলছিল, সেহেতু হযরত আলী (রাঃ) মনে করলেন এই সব অশ্লীল কথা শুনলে তো রসূলে করীম (সাঃ) মনে কষ্ট পাবেন। বললেন,

'আপনি কেন কষ্ট করছেন? এদের সঙ্গে লড়াই করতে তো আমরাই যথেষ্ট। আপনি ফিরে যান।'

রসূলে করীম (সাঃ) বললেন, 'আমি বুঝতে পারছি যে, ওরা গালাগালি করছে, আর তুমি চাচ্ছ না যে, আমি ওদের ঐ গালাগালি শুনি। হযরত আলী (রাঃ) বললেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ! ঠিক, তা-ই।' রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, 'এতে আর কি হয়েছে যে, ওরা গালাগালি করেছে। মূসা নবী (আঃ) তো ওদের নিজের লোক ছিলেন, তাঁকে ওরা এর চাইতেও অনেক বেশী কষ্ট দিয়েছে।

এই কথা বলতে বলতে তিনি (সাঃ) ইহুদীদের কেল্লার দিকে এগিয়ে গেলেন। ইহুদীরা কেল্লার ফটক বন্ধ করে দিয়ে কেল্লার ভিতরে অবস্থান নিয়ে থাকল। এবং মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করে দিল। এমনকি তাদের স্ত্রীলোকেরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলো। এক সময়, কেল্লার প্রাচীরের পাশে কিছু সংখ্যক মুসলমান বসা ছিল, একজন ইহুদী স্ত্রীলোক উপর থেকে পাথর নিক্ষেপ করে একজন মুসলমানকে হত্যা করলো। কিছু দিন অবরুদ্ধ বা কেল্লা বন্দী অবস্থায় থাকার পর ইহুদীরা উপলব্ধি করলো যে, তারা দীর্ঘদিন ধরে মোকাবেলা চালিয়ে যেতে পারবে না। তখন তাদের সর্দাররা রসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকটে এই বার্তা পাঠিয়ে দিল যে, তিনি যেন আবু লাবাবা আনসারীকে তাদের কাছে পরামর্শের জন্য পাঠিয়ে দেন। আবু লাবাবা (রাঃ) ছিলেন তাদের বন্ধুলোক এবং আওস গোত্রের সর্দার। তাঁর কাছে ইহুদীরা জিজ্ঞেস করলো যে, তারা কি আত্মসমর্পণ করবে এবং মুহাম্মদ (সাঃ)-এর দেওয়া শাস্তি গ্রহণ করবে? আবু লাবাবা তো মুখে বললেন, 'হাঁ, কিন্তু, তিনি তার গলার উপর দিয়ে এমনভাবে হাত ঘুরালেন যে,তাতে কতল করার ইংগিতই প্রকাশ পেল। যদিও তখন পর্যন্ত রসূলে করীম (সাঃ) তাঁর কোন সিদ্ধান্তের কথাই প্রকাশই করেননি। আবু লাবাবা নিজের থেকেই এটা ধরে নিয়েছিলেন যে, ইহাদের এই অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। কোন কিছু চিন্তা-ভাবনা না করেই ইংগিতে তার মতামত ব্যক্ত করে ছিলেন। আখেরে, যা কিনা ইহুদীদের ধ্বংসের কারণ হয়েই দেখা দিল।

ইহুদীরা (বনু কোরায়যা) যদি রসূলে করীম (সাঃ)-এর ফায়সালা মেনে নিতো, তাহলে অন্যান্য ইহুদী গোত্রগুলোর মত তাদেরকেও বড় জোর মদীনা থেকে বিতাড়িত করা হতো। কিন্তু, তাদের দুর্ভাগ্য যে, তারা বললো, 'আমরা

মুহাম্মদের (সাঃ) ফায়সালা মানতে রাজি নই আমরা বরং আমাদের মিত্র আওস গোত্রের সর্দার সায়াদ বিন মুয়ায (রাঃ)-এর ফায়সালা মানতে রাজি আছি। তিনি যা রায় দিবেন, আমরা সেটাই মেনে নিব।'

কিন্তু, এই সময় ইহুদীদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। তাদের অনেকেই বল্‌লো, 'আমাদের কওম তো গাদ্দারী করেছে,। এবং মুসলমানদের দাবীই সঠিক, ওদের ধর্মই সত্য। কাজেই ওদের অনেকেই নিজেদের পূর্বের ধর্ম পরিত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করলো'।

ইহুদীদের অন্যতম সর্দার উমর ইবনে সা'দী তাঁর নিজের গোত্রের লোকদেরকে বকাঝকা করলো এবং বল্‌লো,

'তোমরা গাদ্দারী করেছ, চুক্তিভঙ্গ করেছ। এখন হয় তোমরা মুসলমান হয়ে যাও, নয়তো জিজিয়া কর দিতে রাজি হও।'

ইহুদীরা বললো, 'আমরা মুসলমানও হব না, জিজিয়াও দেব না।

এথেকে বরং মরণও ভাল।'

এখন উমর তাদেরকে বল্‌লো, 'আমি তাহলে এথেকে মুক্ত।' এই কথা বলেই সে কেল্লা থেকে বের হয়ে গেল। যখন সে বের হয়ে যাচ্ছিল, তখন মুসলমানদের একটি দলের নেতা মুহাম্মদ বিন মুসাল্লামা (রাঃ) তাকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন যে, সে কে ?

সে বল্‌লো, 'আমি অমুক।' এতে মুহাম্মদ বিন মুসাল্লামা (রাঃ) বল্লেন, আপনি নির্ভয়ে চলে যান। এবং তিনি (রাঃ) আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করলেন।

اللهم لا تحرمني اقالة عثرات الكرام

'ইলাহী! আমাকে শরীফ ব্যক্তিদের ত্রুটির উপরে পর্দা করে দেওয়ার মত পুণ্যকাজ থেকে কখনও বঞ্চিত করো না।' *

অর্থাৎ তিনি যা বলতে চেয়েছিলেন তা হচ্ছে- 'এই ব্যক্তি যেহেতু নিজের কাজ এবং নিজের কওমের কাজ থেকে বাঁচতে চাচ্ছে, সেহেতুই আমার কর্তব্য হচ্ছে, তাকে ক্ষমা করা। এইজন্য আমি তাকে গ্রেফতার করিনি বরং তাকে যেতে দিয়েছি। আল্লাহ্‌তায়ালা যেন সব সময় আমাকে এরূপ পুণ্য কাজ করার তৌফীক বা সামর্থ্য দান করেন।'

---

* *আস্ সিরাতুল হালবিয়া : ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৬৩*

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন এই ঘটনার কথা জানলেন, তখন ঐ ইহুদী সর্দারকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য মুহাম্মদ বিন মুসাল্লামার কাছে কোন কৈফিয়ৎ চাইলেন না। বরং তিনি (সাঃ) তাঁর ঐ কাজ অনুমোদন করলেন।

বনু কোরায়যা কর্তৃক মনোনীত বিচারক সায়াদ (রাঃ)-এর রায় ছিল তৌরাত মোতাবেক

উপরে বর্ণিত ঘটনাটি ছিল একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। গোত্রগতভাবে কোরায়যা তাদের জিদের উপরেই অটল থাকলো। এবং রসূলে করীম (সাঃ)-এর হুকুম অমান্য করে, সায়াদের (রাঃ) ফায়সালার উপরেই জিদ করতে চাইলো। রসূলে করীম (সাঃ) তাদের এই দাবী অবশেষে মেনে নিলেন। সায়াদ (রাঃ) যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন। তাঁকে ডেকে পাঠানো হলো যে, তাঁর ফায়সালাই মানবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে বনু কোরায়যা সুতরাং, তিনি যেন এসে ফায়সালা করে দেন। এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গেই আওস গোত্রের লোকেরা, যাদের সঙ্গে বনু কোরায়যা গোত্রের বহুদিনের বন্ধুত্ব ছিল, তারা দৌড়ে গিয়ে সায়াদ (রাঃ)-এর কাছে গিয়ে এই জিদ ধরলো যে, সেহেতু তাদের মিত্র ইহুদীদেরকে খাযরাজ গোত্র সবসময়েই শাস্তি থেকে বাঁচিয়েছে, সেহেতু আপনাকেও আজ এই মিত্র গোত্রের পক্ষে রায় দিতে হবে।

সায়াদ (রাঃ) আহত থাকার দরুন উটে চড়ে বনু কোরায়যা কিল্লার দিকে রওয়ানা হলেন। এবং তাঁর গোত্রের লোকেরা তাঁর ডানে বামে দৌড়াতে দৌড়াতে যেতে লাগলো এবং সায়াদকে (রাঃ) জোর অনুরোধ করতে থাকলো, 'দেখুন, বনু কোরায়যার বিরুদ্ধে যেন রায় না দেন।' কিন্তু সায়াদ তাদের অনুরোধের জওয়াবে শুধু এতটুকুই বল্লেন, 'যার উপরে বিচার দেওয়া হয়, সে তখন আমানতদার হয়। সুতরাং তার উচিত, সততার সঙ্গে বিচার করা। আমিও সততার সঙ্গেই বিচার করবো।' সায়াদ (রাঃ) যখন ইহুদীদের কেল্লার নিকট পৌঁছালেন তখন সেখানে বনু কোরায়যার লোকেরা আগে থেকেই কেল্লার প্রাচীরের একদিকে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রতীক্ষা করছিল এবং অপরদিকে মুসলমানরা বসেছিল।

হযরত সায়াদ (রাঃ) প্রথমে নিজের জাতির কাছে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনারা কি এই অঙ্গীকার করছেন যে, আমি যে রায় দিব, তা আপনারা মেনে নিবেন ?'

তারাও বল্লো, 'হাঁ।'

আবার লজ্জার খাতিরে অন্যদিকে চেয়ে আনত দৃষ্টিতে যেদিকে রসূলে করীম (সাঃ) ছিলেন সেইদিকে ইশারা করে বল্লেন, 'ঐ দিকে যাঁরা বসে আছেন, তাঁরাও কি এই অঙ্গীকার করলেন? হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বল্লেন, 'হাঁ'।

অতঃপর সায়াদ (রাঃ) বাইবেলের হুকুম অনুযায়ী তাঁর রায় প্রদান করলেন। বাইবেলে লিখিত আছেঃ

'যখন তুমি কোন নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে তার নিকটে উপস্থিত হবে, তখন তার কাছে সন্ধির কথা ঘোষণা করবে। তাতে যদি সে সন্ধি করতে সম্মত হয়ে তোমার জন্য দ্বার খুলে দেয়, তাহলে সেই নগরে যে সমস্ত লোক পাওয়া যাবে, তারা তোমাকে কর প্রদান করবে এবং তোমার দাসত্ব বরণ করবে। কিন্তু যদি সে সন্ধি না করে তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করে, তবে তুমি সেই নগর অবরোধ করবে। পরে তোমর ঈশ্বর সদাপ্রভু তা তোমার হস্তগত করলে তুমি তার সমস্ত পরুষকে খড়গ ধার দিয়ে আঘাত করবে, কিন্তু স্ত্রীলোক, বালক-বালিকা ও পশুপাল প্রভৃতি নগরের সর্বস্ব, সমস্ত লুটের মাল, নিজের জন্য লুটরূপে গ্রহণ করবে, আর তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু প্রদত্ত শত্রুদের মাল ভোগ করবে। এই নিকটবর্তী জাতিদের নগর ব্যতিরেকে যে সকল নগর তোমার কাছ থেকে দূরে আছে তাদেরই প্রতি এইরূপ করবে। কিন্তু সেই সব জাতির যে সকল নগর তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু অধিকারার্থে তোমাকে দিবেন, সে সকলের মধ্যে শ্বাসবিশিষ্ট কাউকেও রাখবে না। তুমি আপন ঈশ্বর সদা প্রভুর আজ্ঞানুসারে তাদেরকে যথা, হিত্তীয়, ইমোরীয় কানামীয়, পরিষীয়, হিব্বীয়, বিবুষীয়দেরকে নিঃশেষে ধ্বংস করবে; পাছে তারা আপন আপন দেবতাদের উদ্দেশ্যে যে সকল ঘৃণার্হ কাজ করে, তদ্রূপ করতে তোমদেরকে শিখায় আর পাছে তোমরা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে পাপ কর' - *(দ্বিতীয় বিবরণ - ২০ঃ ১০-১৮)।*

বাইবেলের এই ফায়সালা থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, যদি ইহুদী বিজয়ী হতো এবং মুহাম্মদ (সাঃ) পরাজিত হতেন, তাহলে বাইবেলের উক্ত ফায়সালা অনুযায়ী সকল মুসলমানকে, নরনারী, ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে সকলকেই হত্যা করা হতো এবং ইতিহাস থেকেও জানা যায় যে, ইহুদীদের এটাই রীতি ছিল যে, তারা নারী-পুরুষ, ছেলেমেয়ে সকলকেই একই সঙ্গে হত্যা করতো। ওরা যদি খুব বেশী একটা রেহাই দিত, তাহলেও তারা বাইবেলের উক্ত ফায়সালা অনুযায়ী দুরবর্তী দেশসমূহের গোত্রগুলোর সঙ্গে যে আচরণ করতো তাহলোঃ শত্রুপক্ষের সকল পুরুষকে হত্যা করতো, নারী ও ছেলেমেয়েদেরকে ক্রীতদাস বা দাসী করা হতো এবং সমস্ত মালসম্পদ লুট করে নেওয়া হতো।

সায়াদ (রাঃ) ছিলেন বনু কোরায়যা গোত্রের একজন মিত্র ব্যক্তি। তার গোত্র ছিল তাদের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ। যখন তিনি দেখলেন যে, ইহুদীরা ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক (যাতে অন্ততঃ তারা প্রাণে বেঁচে যেত) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) -এর ফায়সালা মানতে রাজি না, তখন তিনি ঠিক সেই ফায়সালাই ইহুদীদের জন্য দান করলেন বহু পূর্বেই যা দিয়ে রেখেছেন মূসা (আঃ) এইরূপ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার জন্য। সুতরাং, এই ফায়সালার দায়-দায়িত্ব কোনক্রমেই মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং মুসলমানদের উপরে বর্তায় না। বরং তা বর্তায় মূসার (আঃ) উপরে, তৌরাতের উপরে এবং ইহুদীদের উপরে যারা হাজার বছর ধরে অন্যান্য জাতিগুলোর সঙ্গে ঐরূপ আচরণই করে এসেছে এবং যখন তাদেরকে মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দয়ার কথা বলা হয়েছিল, তখন তারা তা প্রত্যাখান করেছিল এবং বলেছিলঃ

'আমরা মুহাম্মদের কথা মানতে প্রস্তুত নই।

আমরা বরং সায়াদের কথাই মানবো।

সায়াদ (রাঃ) তো মূসা (আঃ)-এর ফায়সালা অনুসারেই ফায়সালা দান করেছিল। অথচ, এখন খৃষ্টান জগৎ এই চীৎকার শুরু করেছে যে, মুহাম্মদ (সাঃ) জুলুম করেছেন।

খৃষ্টান লেখকরা এটা লক্ষ্য করে না যে, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তো অনুরূপ কোন ক্ষেত্রেই কোন জুলুম করেন নি। অসংখ্য এমন ঘটনা ঘটে গেছে যখন শত্রুরা মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দয়ার উপরে নিজেদেরকে ছেড়ে দিয়েছে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। এটাই একমাত্র ঘটনা যখন শত্রু এই জিদ ধরেছিল যে, তারা রসূলে করীম (সাঃ)-এর ফায়সালা মানবেই না। বরং, তার পরিবর্তে তারা অন্য অমুক ব্যক্তির ফায়সালাই মানবে। এবং সেই ব্যক্তি মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছেও এই অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, তাঁর ফায়সালা তিনিও মেনে নিবেন। অতঃপর তিনি ফায়সালা দান করেন, কিন্তু এই ফায়সালা তার নিজেরও ছিল না, ছিল মূসা (আঃ)-এর, যার পুনঃ প্রয়োগ তিনি করেছেন মাত্র। এবং যে মূসা (আঃ)-এর উম্মত হওয়ার দাবীদার ছিল ঐ ইহুদীরা। অতএব, কেউ যদি জুলুম করেই থাকে, তবে তা ইহুদীরা নিজেরাই করেছে নিজেদের উপরে যারা মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ফায়সালা মানতে অস্বীকার করেছিল। যদি কেউ জুলুম করেই থাকে, তা মূসা (আঃ)ই করেছেন, যিনি অবরুদ্ধ শত্রুর জন্যে তৌরাতে খোদার হুকুম পেয়েই উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে গেছেন। এটা যদি জুলুম হয়, তাহলে ঐ সব খৃষ্টান লেখকদের উচিত হবে যে, তারা যেন মূসাকেই (আঃ) জালেম

সাব্যস্ত করে। বরং তাদের উচিত, মূসার খোদাকেই জালেম সাব্যস্ত করা, যে খোদা এই শিক্ষা দিয়েছেন তৌরাতে।

খন্দকের যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পর রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন ঃ

'এখন থেকে আর মুশরেকরা আমাদের উপরে আক্রমণ চালাবে না। এখন ইসলাম নিজেই জওয়াব দিবে ঐ সকল জাতির যারা আমাদের উপরে আক্রমণ চালাতো। এখন থেকে আমরাই আক্রমণ চালাব। *

বাস্তবে ঘটেছেও তা-ই। খন্দকের যুদ্ধে কাফেরদের ক্ষতি আর কতটুকুই বা হয়েছিল। তাদের কয়েকজন মাত্র লোক মারা গিয়েছিল। তারা পরের বছরে আবারও প্রস্তুতি গ্রহণ করে আসতে পারতো। বিশ হাজারের জায়গায় তারা চল্লিশ/পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে আসতে পারতো। বরং তারা যদি আরও বেশী চেষ্টা চালাতো তাহলে, এমনকি লাখ/দেড় লাখ পর্যন্ত সৈন্য সংগ্রহ করে নিয়ে আসাটাও তাদের জন্য কোনও কঠিন ব্যাপার হতো না। কিন্তু একুশ বছর ধরে ক্রমাগতভাবে আপ্রাণ চেষ্টা চালাবার পর কাফেরদের মনে এই ধারণাই সৃষ্টি হয়েছিল যে, খোদা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাথেই আছেন। তাদের দেবতাগুলোই মিথ্যা এবং জগতের সৃষ্টিকর্তা খোদা একজনই। তাদের দেহ সহী সালামতেই ছিল বটে, কিন্তু তাদের হৃদয় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। ওদেরকে বাহ্যতঃ ওদের দেবতাগুলোর মূর্তির সামনে সেজদা করতে দেখা গেলেও, আসলে ওদের হৃদয় থেকে যে ধ্বনি তখন উত্থিত হচ্ছিল, তা হচ্ছে-

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'

'আল্লাহ্ ছাড়া উপাস্য নেই।'

মুসলমানদের বিজয়ের সূচনা

খন্দকের যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছিলেন,

'এখন থেকে কাফেররা আর আমাদের উপর আক্রমণ করবে না।'

অর্থাৎ- মুসলমানদের ইবতেলা বা পরীক্ষা তার চূড়ান্ত সীমা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, এখন তাদের বিজয়ের যুগ শুরু হতে যাচ্ছে। এখন পর্যন্ত যতগুলো যুদ্ধ হয়েছে তার সবগুলোই ছিল- হয় কাফেররা মদীনা আক্রমণ করতে এসেছিল,

---

* *বুখারী : কিতাবুল মাগাযী, বাবু গাযওয়াতুল খন্দক।*

নয়তো তাদের আক্রমণের প্রস্তুতিকে প্রতিহত করার জন্য মুসলমানরা মদীনা থেকে বাইরে গিয়েছিল কিন্তু কখনই মুসলমানরা যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেনি। বস্তুতঃ যুদ্ধের নিয়ম কানুন অনুযায়ী যখন কোন যুদ্ধ শেষ হয় তখন তার সমাপ্তি ঘটে যেভাবে তা হচ্ছে -হয় সন্ধি হয়ে যায়, নয়তো একপক্ষ আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু এখন পর্যন্ত একটা ঘটনাও এমন ঘটেনি যখন সন্ধি করা হয়েছে বা কোন পক্ষ আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করবে। কিন্তু মুসলমানরা তা করেনি। বরং বিরতি যখন হতো তখন মুসলমানরা চুপচাপই থাকতো। চুপচাপ থাকতো এই আশায় যে, হয়তো কাফেরদের সঙ্গে শান্তি স্থাপন সম্ভব হবে যার ফলে যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু, যখন দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরও দেখা গেল যে, কাফেরদের পক্ষ থেকে শান্তি স্থাপনের কোন চেষ্টাই করা হচ্ছে না, এবং তাদের আত্মসমর্পণ করারও কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না, বরং তারা বিরোধিতায় আরো বেশী বাড়তেই থাকলো, তখন, যুদ্ধের একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তির সময় এসে গেল। হয় উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হবে, নয়তো কোন এক পক্ষ আত্মসমর্পণ করবে। আর এটা তো জানা কথাই যে, আত্মসমর্পণের প্রশ্ন উঠলে, কাফেরদেরকেই আত্মসমর্পণ করতে হবে।

কেননা, খোদাতায়ালার পক্ষ থেকে ইসলামের বিজয়ের খবর পূর্বেই পাওয়া গিয়েছিল, এবং মক্কীজীবনেই রসূলে করীম (সাঃ)-এর বিজয়ের ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। বাকী থাকলো সন্ধির কথা।

সন্ধির ক্ষেত্রে, একথা বুঝতে হবে যে, সন্ধিচুক্তির প্রস্তাব করা হয় বিজয়ী পক্ষ থেকে, নাকি বিজিত পক্ষ থেকে? বিজিত পক্ষ যখন সন্ধির জন্য আবেদন জানায় তখন তার অর্থ এই হয় যে, তারা দেশের ভূখণ্ডের কিয়দংশ অথবা খাজানার কিয়দংশ স্থায়ীভাবে কিংবা সাময়িকভাবে বিজয়ী পক্ষকে দিয়ে দিবে। এছাড়া বিজয়ী পক্ষের অন্যান্য শর্তাবলীও মেনে নিবে। পক্ষান্তরে, বিজয়ী পক্ষ থেকে যখন সন্ধির প্রস্তাব করা করা, তখন তার তাৎপর্য এটাই হয় যে, তারা বলতে চায়, আমরা তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপ ধ্বংস করে দিতে চাই না, যদি তোমরা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আমাদের আনুগত্য মেনে নেও, কিংবা আমাদের কথা মত কাজ কর, তাহলে আমরা তোমাদের স্বাধীনতার অধিকার সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে মেনে নিব।

মক্কার কাফের ও মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মধ্যে যে সব সংঘর্ষ চলছিল, তাতে বার বার কাফেরদেরকে পরাজায় মেনে নিতে হচ্ছিল। কিন্তু, এই পরাজয়ের অর্থ মাত্র এই ছিল যে, তাদের আক্রমণ বার বার ব্যর্থ হচ্ছিল। সত্যিকার অর্থে পরাজয় তাকেই বলা যায় যখন প্রতিহত করার শক্তি নিঃশেষ

হয়ে যায়। আক্রমণ ব্যর্থ হওয়ার অর্থ এই নয় যে, সত্যিকার অর্থে পরাজয় হয়েছে। এর অর্থ শুধু এতটুকুই হতে পারে যে, আক্রমণকারীর আক্রমণ ব্যর্থ হয়ে গেছে। কিন্তু পুনরায় আক্রমণ চালিয়ে সে তার এই উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারে। সুতরাং যুদ্ধনীতি অনুযায়ী মক্কাবাসীরা পরাজিত হয়নি। বরং তাদের অবস্থা এই দাঁড়িয়েছি যে, তার আক্রমণাত্মক কাজকর্ম দ্বারা তাদের উদ্দেশ্যকে তখনও পর্যন্ত অর্জন করতে পারেনি। অপরপক্ষে, মুসলমানদের, যুদ্ধের নিয়মানুসারে প্রতিরক্ষা শক্তি নিঃশেষ না হলেও তাদেরকে দুর্বল বলতেই হবে। কারণ -

প্রথমতঃ তারা ছিল খুব ছোট একটা জামা'ত বা দল;

দ্বিতীয়তঃ তারা তখনও পর্যন্ত কোন আক্রমণাত্মক কার্যব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়নি; অর্থাৎ কোন আক্রমণই তারা তাদের পক্ষ থেকে করতে পারেনি।

এথেকে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এখন তারা কাফেরদের প্রভাব থেকে নিজেদেরকে মুক্ত মনে করতে পারছে। এই অবস্থায় মুসলমানদের পক্ষ থেকে সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপিত হলে, এটাই বুঝা যেত যে, এখন তাদের প্রতিরক্ষা শক্তি ভেঙ্গে পড়ছে। এখন তারা কিছু দিয়ে থুয়ে হলেও নিস্তার পেতে চাচ্ছে। যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝতে পারবে যে, এই অবস্থায় মুসলমানরা যদি সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপন করতো, তাহলে তার পরিণাম হতো দারুণ বিপর্যয়কর। এবং তাদের এই কাজ হতো তাদের অস্তিত্ব বিলীন করে দেওয়ার নামান্তর। নিজেদের যাবতীয় আক্রমণাত্মক কলাকৌশল ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার দরুন আরবের কাফেরদের মধ্যে যে হতাশার সৃষ্টি হয়েছিল, তা অনুরূপ কোন সন্ধির প্রস্তাব পেলে দ্রুত নতুন উদ্দীপনা আশা ও নতুন উৎসাহে রূপান্তরিত হয়ে যেত। এবং তারা মনে করতো যে, মুসলমানরা মদীনাকে ধ্বংসের হাত থেকে আপাততঃ রক্ষা করতে সক্ষম হলেও শেষ পর্যন্ত সফলতা লাভের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়েছে। কাজেই, মুসলমানদের পক্ষ থেকে সন্ধির প্রস্তাব কোন অবস্থাতেই করা সম্ভব ছিল না। যদি কোন সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপন করা যেত, তবে তা করা যেত মক্কাবাসীর পক্ষ থেকেই। অথবা তৃতীয় কোন সালিশী পক্ষ তা উত্থাপন করতে পারতো। কিন্তু আরবে তেমন কোন তৃতীয় পক্ষই ছিল না। যারা সালিশী করতে পারতো। একদিকে ছিল মদীনা এবং অপরদিকে সমগ্র আরব। কাজেই, কার্যতঃ কেবল আরবরাই করতে পারতো সন্ধির প্রস্তাব। কিন্তু, তাদের পক্ষ থেকে কোনও সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপিত হয়নি। এই অবস্থায় যদি শতবর্ষ পর্যন্ত অব্যাহত থাকতো তাহলে যুদ্ধের নীতি কৌশলের কারণে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যেত। কাজেই মক্কাবাসীদের পক্ষ থেকে যেহেতু সন্ধির প্রস্তাব পেশ করা হয়নি এবং মদীনার

মুসলমানরাও আরবের কাফেরদের প্রভাব প্রতিপত্তি মানতে প্রস্তুত ছিল না, সেহেতু একটি মাত্র রাস্তাই খোলা ছিল এবং তাহলো আরবদের সম্মিলিত বাহিনীর হামলা ব্যর্থ করে দেওয়ার পর মদীনাবাসীদের পক্ষ থেকে প্রতিআক্রমণ পরিচালনা করা এবং আরবের কাফেরদেরকে বাধ্য করা যে, হয় তারা তাদের প্রভুত্ব স্বীকার করে নিবে, নয়তো সন্ধি করতে রাজি হবে। এবং এই পথই অবলম্বন করলেন রসূলে করীম (সাঃ)।

যদিও দৃশ্যতঃ এই পন্থাটা ছিল যুদ্ধের, তবু প্রকৃত প্রস্তাবে শান্তি স্থাপনের জন্য এছাড়া অন্য আর কোন পথই খোলা ছিল না। রসূলে করীম (সাঃ) যদি এটা না করতেন, তাহলে আশঙ্কা ছিল যে, যুদ্ধ শতবর্ষ ব্যাপী চলতেই থাকবে। যেমন, অনুরূপ পরিস্থিতিতে প্রাচীনকালে শতবর্ষ ব্যাপী যুদ্ধ-বিগ্রহ চলতো। খোদ আরবেরই কয়েকটি যুদ্ধ তিরিশ/চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ঐ সব যুদ্ধ অব্যাহতভাবে চলার কারণ এটাই ছিল যে, যুদ্ধ শেষ করার জন্য কোন প্রকার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। যেমন, আমি বলে এসেছি যে, যুদ্ধ শেষ করার উপায় হচ্ছে দু'টি,- হয় যুদ্ধে চূড়ান্ত ফায়সালা হয়ে যাবে, অর্থাৎ দুই পক্ষের এক পক্ষ আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে, নয়তো প্রকাশ্যে সন্ধি স্থাপিত হবে।

রসূলে করীম (সাঃ) নিঃসন্দেহে এটা করতে পারতেন যে, তিনি মদীনাতে বসে থাকতেন, এবং নিজের পক্ষ থেকে কোন আক্রমণ না চালাতেন কিন্তু, যেহেতু আরবের কাফেররা যুদ্ধাবস্থা সাময়িকভাবে বন্ধ রেখেছিল, সেহেতু তাঁর (সাঃ) পক্ষে চুপচাপ বসে থাকাটাকে মনে করা হতো যে, যুদ্ধ হয়তো শেষ হয়েই গেছে। অথচ, প্রকৃত প্রস্তাবে, যুদ্ধের সম্ভাবনা সব সময়ের জন্যই ছিল। আরবের কাফেররা যদি চাইতো, তাহলে তারা কোন কারণ ছাড়াই মদীনার উপরে আক্রমণ চালাতে পারতো। এবং সেকালের রীতিনীতি অনুযায়ী সেটাকে ন্যায্যই মনে করা হতো। কেননা, তখনকার দিনে যুদ্ধ বিরতি হওয়ার অর্থ এই ছিল না যে, যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। বরং বিরতিকেও তখন কৌশলগত কারণে যুদ্ধের অংশ হিসাবেই গণ্য করা হতো। এখানে অনেকের মনে এই প্রশ্নের উদয় হতে পারে যে, সত্য ধর্মের জন্য যুদ্ধ করা কি বৈধ ?

ইহুদী ও খৃষ্টান ধর্মে যুদ্ধনীতি

এক্ষেত্রে আমি উল্লিখিত প্রশ্নটিরও জওয়াব দেওয়া জরুরী মনে করছি। যুদ্ধ সম্পর্কিত শিক্ষা ও নীতি নিয়মের ব্যাপারে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে মত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যুদ্ধ সম্পর্কে মূসা (আঃ)-এর শিক্ষার কথা ইতোপূর্বেই

আলোচনা করা হয়েছে। তৌরাতের মতে মূসা (আঃ)-কে হুকুম দেওয়া হয়েছিল যে, তিনি যেন জোর করে কানানে প্রবেশ করেন এবং সেখানকার গোত্রগুলোকে রাজি করে সেই অঞ্চলে নিজের কওম বা জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করেন। (দ্বিঃ বিঃ ২০ঃ ১০-১৮)। কিন্তু, মূসার (আঃ) এইরূপ শিক্ষা দেওয়া সত্ত্বেও, এবং এই শিক্ষা বরাবর ইউশা, দাউদ এবং অন্যান্য নবীগণ (আঃ) মেনে চলা সত্ত্বেও, ইহুদী এবং খৃষ্টানরা তাঁদেরকে খোদার নবী এবং তৌরাতকে খোদার কিতাব হিসাবেই তো মান্য করে। মূসায়ী সিলসিলার শেষ পর্যায়ে ঈসা (আঃ)-এর আবির্ভাব ঘটে, তাঁর যুদ্ধ সম্পর্কে শিক্ষা হচ্ছে, জালেমের মোকাবেলা করো না; বরং কেউ তোমার ডান গালে থাপ্পড় মারলে তাকে তুমি বাম গাল পেতে দাও। (মথি : ৫ ঃ ৩৯)। খৃষ্টানরা মসীহ (আঃ)-এর জাতিসমূহকে যুদ্ধ করতে নিষেধ করে গেছেন। কিন্তু, আমরা দেখতে পাচ্ছি, ইঞ্জিলের এই শিক্ষার পরিপন্থী অন্য শিক্ষাও আছে। যেমন বলা আছেঃ

'মনে করিও না যে, আমি পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে এসেছি। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নয়, বরং তরবারি চালানোর জন্য এসেছি।' (মথি ১০ : ৩৪)

একইভাবে লিখিত আছে ঃ

'অতঃপর সে তাদেরকে বললো, কিন্তু এখন যার থলী আছে সে তা গ্রহণ করুক, সেইভাবে ঝুলিও গ্রহণ করুক; এবং যার নেই সে আপন চোগা বিক্রী করে তরবারি ক্রয় করুক।' (লুক ২২ঃ৩)/ শেষের এই শিক্ষা দু'টি প্রথমটির সম্পূর্ণ বিপরীত। মসীহ (আঃ) যদি যুদ্ধ কারণের জন্যই এসে থাকেন, তাহলে এক গালে থাপ্পড় মারলে অপর গাল পেতে দেওয়ার কি অর্থ? কাজেই এই উভয় শিক্ষা হয় পরস্পর বিরোধী বলে গণ্য হবে, নয়তো এই উভয় প্রকারে শিক্ষার কোন বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ না করে, তার অন্য কোন তাৎপর্য রয়েছে বলে মনে করতে হবে। আমি এই বিতর্কে যেতে চাই না যে, এক গালে থাপ্পর খেয়ে আর এক গাল পেতে দেওয়া ঠিক হবে কি-না। আমি এখানে শুধু এতটুকু বলতে চাই যে, প্রথমতঃ খৃষ্টান জগত তো তাদের সারাটি ইতিহাসে যুদ্ধ থেকে কখনই বিরত থাকেনি। যখন খৃষ্ট ধর্ম প্রথম প্রথম রোমানদের উপর বিজয় লাভ করেছিল। তখন তারা অন্যান্য জাতিগুলোর সঙ্গে আত্মরক্ষা ও আক্রমণাত্মক উভয় প্রকারের যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। আর বর্তমানে যখন খৃষ্টানরা দুনিয়াতে বিজয় লাভ করেছে, তখন তারা যুদ্ধ করছে আত্মরক্ষার্থে নয়, বরং আক্রমণার্থে। পার্থক্য শুধু এটুকু যে, যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী পক্ষগুলোর মধ্যে যে পক্ষ জয়লাভ করছে, তার সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে, সে তো খৃষ্টান সভ্যতারই রক্ষাকারী। এই যুগে খৃষ্টান সভ্যতা হচ্ছে প্রভাব বিস্তার ও বিজয় অর্জনেরই অন্য নাম এবং এ কথার প্রকৃত অর্থ এটাই যে,

যখন কোন দু'টি খৃষ্টান জাতি যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তখন উভয়েই এই দাবীটাই করে যে, তারা খৃষ্টান সভ্যতা রক্ষার্থেই যুদ্ধ করছে। এবং যখন এক পক্ষ বিজয় লাভ করে, তখন বলা হয় যে, এই বিজয়ী জাতিই হচ্ছে প্রকৃত খৃষ্টান সভ্যতার প্রতিভূ। যাহোক, এটা ঠিক যে, যীশু খৃষ্টের যামানা থেকে শুরু করে অদ্যাবধি খৃষ্টান জাতিগুলো যুদ্ধ বিগ্রহ করেই চলেছে। এবং অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে যে, তারা সবাই এই যুদ্ধ চালিয়েই যাবে। সুতরাং খৃষ্টান জগত সম্পর্কে যতটুকু বলা যায়, তা হচ্ছে, 'তুমি নিজের চোগা বা ওভারকোট বিক্রী করে তরবারি কিনে নাও।' এবং 'আমি শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য নয়, বরং তলোয়ার চালাতেই এসেছি।' এবং এটাই হচ্ছে তাদের আইন কানুন। 'তুমি এক গালে থাপ্পড় খেলে আর এক গাল পেতে দাও, এই যে, আইন তা করা হয়েছিল সুবিধার্থে প্রাথমিক যুগের জন্য অবস্থার প্রেক্ষিতে। কেননা, তখন খৃষ্টান জগৎ ছিল দুর্বল। তাছাড়া এটাতো সীমাবদ্ধ শুধু খৃষ্টানদের মধ্যেই ব্যক্তিগত পর্যায়ে, রাষ্ট্রীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে এই কানুন তো চালাতে বলা হয়নি। দ্বিতীয়তঃ যদি এটাও ধরে নেওয়া যায় যে, মসীহ (আঃ)-এর আসল শিক্ষা যুদ্ধের জন্য ছিল না, ছিল শান্তির জন্য। তথাপি, এই শিক্ষা থেকে এটা বুঝা যায় না যে, যে ব্যক্তি এই শিক্ষানুযায়ী কাজ করবে না, সে খোদার মনোনয়ন লাভ করতে পারবে না। কেননা, খৃষ্টান জগৎ আজও পর্যন্ত মূসা, ইউশা, এবং দাউদ (আঃ)-কে খোদার মনোনীত বলেই স্বীকার করে থাকে। বরং খোদ খৃষ্টধর্মের আমলেই বহু জাতীয় বীর যারা নিজেদের জাতির জন্য নিজের জীবনকে বিপদাপন্ন করে শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন, তারাও বিভিন্ন যুগে পোপদের ফতোয়া অনুযায়ী পরে সেন্ট (Saint) হয়ে গেছেন।

যুদ্ধ সম্পর্কে ইসলামের শিক্ষা

ইসলাম উপযুক্ত শিক্ষাদ্বয়ের (ইহুদী ও খৃষ্টান) মধ্যবর্তী শিক্ষা দান করে। অর্থাৎ ইসলামের শিক্ষা না মূসা (আঃ)-এর শিক্ষার মত বলে যে, তোমরা জোরপূর্বক অপর দেশে ঢুকে পড় এবং সেই জাতিকে পরাভূত করো, না বর্তমান যুগের বিকৃত খৃষ্টধর্মের মত বলে যে, যদি কেউ তোমার এক গালে থাপ্পড় মারে তো তুমি তাকে অপর গালও পেতে দাও। আবার নিজের সঙ্গীদের কানে কানে একবার একথাও বলে দেয় যে, তুমি নিজের গায়ের চোগা বিক্রী করে হলেও তারবারি কিনে নাও। ইসলাম বরং সেই শিক্ষাই দান কর যা মানব-প্রকৃতিসম্মত এবং যা শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয়। এবং তা হচ্ছে, তুমি কারো উপরে হামলা করিও না, কিন্তু কেউ যদি তোমার উপরে হামলা চালায় এবং তার মোকাবেলা না করাটা ফিৎনা বা কলহ বৃদ্ধির কারণ হবে বলে

প্রতীয়মাণ হয় এবং ন্যায় ও শান্তি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়, তাহলে তুমি তার আক্রমণের জওয়াব দাও। এবং এটা হচ্ছে সেই শিক্ষা যার অনুসরণে পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব। এই শিক্ষাই অনুসরণ করেছেন রসূলে করীম (সাঃ)। তিনি মক্কাতে সব সময় দুঃখ যাতনা সহ্য করেছেন, কিন্তু তবু তিনি যুদ্ধ করতে চান নি। কিন্তু যখন তিনি হিজরত করে মদীনায় চলে গেলেন, এবং শত্রু সেখানেও তাঁর পিছু নিল, তখন খোদাতায়ালা তাঁকে হুকুম দিলেন, যেহেতু দুশমন আক্রমণাত্মক কাজ করেই চলেছে এবং ইসলামকে শেষ করে দিতে চাচ্ছে, সেহেতু ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার খাতিরে তোমরা ওদের মোকাবেলা করো। কোরআন করীমে যে সকল হুকুম এ ব্যাপারে দেওয়া হয়েছে, তা হচ্ছেঃ

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن
دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ
لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ
اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾

(সূরা হাজ্জঃ আয়াত ৪০-৪২)

এই আয়াতগুলি যা অবতীর্ণ হয়েছিল মুসলমানদেরকে যুদ্ধ করার অনুমতি দানের জন্য, তাতে বলা হয়েছে যে, যুদ্ধ করার অনুমতি ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী তখনই দেওয়া হয়, যখন কোন জাতি অপর কোন জাতির জুলুমের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয় এবং সেই জুলুম দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকে। এবং জালেম জাতি বিনা কারণেই মজলুম জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দেয় এবং ধর্মের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে। এই শ্রেণীর মজলুম জাতির জন্য এটাই কর্তব্য যে, যখন তার শক্তি সঞ্চয় হবে। তখন সে ধর্মীয় স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করবে এবং এই কথার উপরে বিশ্বাস রাখবে যে, খোদাতা'লা যদি তাদেরকে বিজয় দান করে, তাহলে সে সকলের ধর্মীয় নিরাপত্তা বিধান করবে এবং প্রত্যেক ধর্মের পবিত্র স্থানগুলির সম্মানের প্রতি খেয়াল রাখবে। এবং তার এই বিজয়কে সে যেন নিজের শক্তি ও প্রতাপ-প্রতিপত্তি বিস্তারের সুযোগ মনে না করে। বরং সে যেন গরীবের কল্যাণসাধন করে, দেশের অবস্থার উন্নতি বিধান করে, এবং কলহ-বিবাদ অপরাধ ও দুষ্কৃতি দূর করার কাজে নিজের শক্তিকে নিয়োজিত করে।

এই শিক্ষা সংক্ষিপ্ত বটে কিন্তু সম্পূর্ণ। এতে একথাও বলা হয়েছে যে, মুসলমানদেরকে যুদ্ধ করার অধিকার কেন দেওয়া হয়েছে। যদি তারা কোন যুদ্ধ করেও তবে তা বাধ্য হয়েই করবে। কেননা, আক্রমণাত্মক যুদ্ধ ইসলামে নিষিদ্ধ। এবং একথাও প্রথমে বলে দেওয়া হয়েছে যে, মুসলমানদের বিজয় অবশ্যই হবে। কিন্তু তাদেরকে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, তাদের বিজয়ের সময়ে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন যেন কোন ক্রমেই ব্যক্তি স্বার্থে ব্যবহৃত না হয়। বরং তা যেন দেশের দারিদ্র দূর করার কাজে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত থাকে। এবং দেশ ও জাতির উন্নতি বিধান করাই যেন হয় তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য তাই, কোরআন করীমে বলা হয়েছে ঃ

وَ قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَ لَا تَعْتَدُوْا ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۝
وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَ اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ وَ الْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ
الْقَتْلِ ۚ وَ لَا تُقٰتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ ۚ فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ
كَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ ۝ فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ وَ قٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ
وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ۭ فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ۝

(সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১৯১-১৯৪)

অর্থাৎ, সেই সকল লোকেরা যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে, তোমরা যুদ্ধ করো তাদের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র ওয়াস্তেই। এতে যেন তোমাদের ব্যক্তিগত ক্রোধ, তোমাদের নিজেদের স্বার্থ মিশ্রিত না থাকে। এবং মনে রেখো যে, যুদ্ধের মধ্যেও কোন প্রকার অত্যাচারমূলক কাজ করতে পারবে না। কেননা, খোদাতায়ালা কোন অবস্থাতেই অত্যাচারীদেরকে পসন্দ করেন না। আর যে স্থানেই হোক না কেন, তোমাদের সঙ্গে তাদের মোকাবেলা হয়ে গেলে তোমরা যুদ্ধ কর। কিন্তু, একলা দোকলা কাউকে পেয়ে গেলে হামলা করো না। এবং যেহেতু তারা তোমাদেরকে বাধ্য করেছে যুদ্ধ করার জন্য, সেহেতু তোমরাও তাদেরকে যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ দাও। এবং স্মরণ রেখো যে, হত্যাকাণ্ড ও যুদ্ধের অজুহাত দেখায়ে কাউকে তার ধর্মের জন্য কষ্ট দেওয়া ভয়ানক পাপের কাজ। কাজেই, তোমরা এই ধরনের কাজ করবে না। কেননা, এটা হচ্ছে ধর্মহীন লোকের কাজ। তোমাদের কর্তব্য হবে, মসজিদুল হারামের নিকটে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ না করা, যতক্ষণ না তারা সেখানে যুদ্ধ শুরু করে। কেননা, এতে হজ্জ ও ওমরাহ্ পালনের রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে। তবে, হ্যাঁ, যদি তারা নিজেরাই

সেখানে এইরূপ যুদ্ধ শুরু করে দেয়, তখন তোমাদের উপরে বাধ্যবাধকতা চেপে যাবে, বিধায় তোমরা তখন তাদেরকে প্রতিহত করার জন্য যুদ্ধ করতে পারবে। যারা বিবেক-বুদ্ধি ও ইনসাফের নির্দেশ লংঘন করে, তাদের সঙ্গে অনুরূপ আচরণ করাই বিধেয়। কিন্তু, যদি তারা তাদের অন্যায় বুঝতে পারে, এবং ঐ জাতীয় কাজ থেকে বিরত হয়, তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ্তায়ালা অতীব ক্ষমাশীল ও দয়ালু। অতএব তোমাদের উচিত হবে অনুরূপ অবস্থায় নিজেদের হস্তকে সম্বরণ করা। এবং এই চিন্তাও পরিহার করতে হবে যে, ওরা প্রথমে যুদ্ধ শুরু করেছিল সেজন্য যুদ্ধ চালিয়ে যেতেই হবে। তারা প্রথমে যুদ্ধের সূচনা করেছে এ জন্য সেই সময় পর্যন্ত তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারবে, যে সময় পর্যন্ত তারা ধর্মের উপরে হস্তক্ষেপ করা বন্ধ না করে এবং স্বীকার না করবে যে, ধর্মীয় বিষয়াদির সম্পর্ক শুধু আল্লাহ্র সঙ্গেই। এবং এ ব্যাপারে জবরদস্তি করা কোন মানুষের জন্যই বৈধ নয়। তারা যদি এই পথ অবলম্বন করে এবং ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত হয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে। কেননা, শাস্তি কেবল জালিমদেরকে দেওয়া হয়। যদি তারা ঐরূপ অত্যাচারমূলক কাজ থেকে বিরত হয়ে যায়, তাহলে সেক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা জায়েয হবে না।

এই আয়াতগুলিতে বলা হয়েছে যে,-

প্রথমতঃ যুদ্ধ হতে হবে শুধুমাত্র আল্লাহ্র ওয়াস্তেই। অর্থাৎ ব্যক্তিগত লোভ-লালসা, ব্যক্তিগত স্বার্থ, দেশজয়ের বাসনা, নিজের প্রভাব-পতিপত্তি বৃদ্ধির আকাংখা ইত্যাদি কারণে যুদ্ধ করা যাবে না;

দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধ কেবল তারই বিরুদ্ধে করা যাবে যে আক্রমণ করে প্রথমে ;

তৃতীয়তঃ তাদেরই বিরুদ্ধে তোমাদের যুদ্ধ করা বৈধ হবে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে;

কিন্তু যারা-রীতিমাফিক বা নিয়মিত সৈন্য নয়, এবং কার্যতঃ যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী নয়, তাদেরকে হত্যা করা বা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বৈধ নয়।

চতুর্থতঃ শত্রু প্রথমে আক্রমণ করলেও যুদ্ধকে সেই সীমার মধ্যেই রাখতে হবে, যে সীমা পর্যন্ত শত্রু যুদ্ধ করে। সেই সীমাকে বৃদ্ধি করার চেষ্টা চালানো যাবে না, না এলাকার দিক থেকে না অস্ত্রশস্ত্রের দিকে থেকে;

পঞ্চমতঃ যুদ্ধ হতে হবে কেবল নিয়মিত সৈনিকদের সঙ্গেই। শত্রুর এক বা দু'জন লোকের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া যাবে না;

ষষ্ঠতঃ যুদ্ধে এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে যে, ধর্মীয় উপাসনা, এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালনে যেন কোন প্রকারের বাধা-বিপত্তির সৃষ্টি না হয়। শত্রু যদি এইরূপ কোন স্থানে যুদ্ধাবস্থার সৃষ্টি না করে যেখানে যুদ্ধ করলে তাদের ধর্মীয় উপাসনার বাধার সৃষ্টি হয়, তাহলে মুসলমানরাও সেখানে যুদ্ধ করতে পারবে না;

সপ্তমতঃ শত্রু যদি নিজেরাই ধর্মীয় উপাসনালয়গুলিকে যুদ্ধের জন্য ব্যবহার করে, তাহলে বাধ্য হয়ে তোমরাও তদ্রূপ করতে পারবে, অন্যথায় পারবে না। এই আয়াতে এই ইংগিত করা হয়েছে যে, উপাসনার স্থানসমূহের আশে পাশেও যুদ্ধ করা চলবে না। ধর্মীয় স্থানে আক্রমণ করা, সেগুলোকে ধ্বংস করা বা সেগুলোর কোন ক্ষতিসাধন করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। শত্রু যদি ধর্মীয় স্থানকে যুদ্ধের জন্য ব্যবহার করে, তবে তার অর্থ হবে সেগুলোর উপরে প্রতি আক্রমণের সুযোগ করে দেওয়া। সেক্ষেত্রে ধর্মীয় স্থানের অনুরূপ কোন ক্ষয়ক্ষতির দায়দায়িত্ব বর্তাবে শত্রুর উপরেই, মুসলমানদের উপরে নয়।

অষ্টমতঃ শত্রু যদি ধর্মীয় স্থান বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যুদ্ধ শুরু করার পরে তার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারে, এবং ঐ সব ধর্মীয় স্থান বা প্রতিষ্ঠান থেকে সরে গিয়ে অন্যত্র যুদ্ধ ক্ষেত্র তৈরী করে, তখন মুসলমানরা তাদের ঐ সকল ধর্মীয় স্থানে বা প্রতিষ্ঠানের কোন ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। এমনকি শত্রু সেখান থেকেই আগে যুদ্ধ শুরু করেছে-এই অজুহাত দেখায়েও না। বরং তৎক্ষণাৎ তাদেরকেও ঐ সকল স্থানের মর্যাদার খাতিরে -যুদ্ধের স্থল পরিবর্তন করতে হবে।

নবমতঃ যুদ্ধ ততক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহত রাখতে হবে, যতক্ষণ না ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা বন্ধ হয়, এবং ধর্মীয় বিষয়াদিকে শুধু হৃদয়ের বিষয়রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এবং সেইসঙ্গে রাজনৈতিক বিষয়াদির ন্যায় ধর্মের ব্যাপারে নাক গলানো বন্ধ করা হয়। শত্রু যদি এ সব বিষয়ের পক্ষে ঘোষণা দেয়, তাহলে সে প্রথমে যুদ্ধ শুরু করলেও, তখন তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে।

(৩) আল্লাহ্তায়ালা বলেছেনঃ

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ ۚ وَاِنْ يَّعُوْدُوْا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ
الْاَوَّلِيْنَ ۝ وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ۚ فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا
يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰىكُمْ ۚ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ۝

(সূরা আনফাল, আয়াত ৩৯-৪১)

অর্থাৎ- হে মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)! শত্রু যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে। এবং তোমাকে আল্লাহ্তায়ালার আদেশ অনুযায়ী ওদের মোকাবেলা করতে হবে। কিন্তু তুমি ঘোষণা করে দাও যে, যদি তারা এখনও যুদ্ধ থেকে বিরত হয়, তাহলে যা কিছু তারা ইতোমধ্যে করেছে তজ্জন্য তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। কিন্তু তারা যদি তা থেকে বিরত না হয়, এবং বার বার হামলা চালায়, তাহলে পূর্ববর্তী নবীদের শত্রুদের পরিণতি তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। পরিণতি তাদের অদ্রূপই হবে। এবং হে মুসলমানগণ! তোমরা ঐ সময় পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাও, যে পর্যন্ত না ধর্মের জন্য কষ্ট দেওয়া বন্ধ হয় এবং ধর্মকে সম্পূর্ণরূপে খোদাতায়ালার উপরে সোপর্দ করা হয়, এবং লোকেরা ধর্মের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা ছেড়ে দেয়। যদি ঐ সব লোক এই সকল বিষয়ে বিরত হয়ে যায়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে শুধু এই কারণে যুদ্ধ করা যাবে না যে, তারা একটা ভ্রান্ত ধর্মের অনুসারী। কেননা, আল্লাহ্তায়ালা তো জানেন তাদের আমল (ধর্মীয় কাজকর্ম) কি। তিনি যেভাবে চাইবেন সেইভাবে তাদের সঙ্গে ব্যবহার করবেন। তাদের ভ্রান্ত ধর্মের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার অধিকার তোমাদের দেওয়া হয়নি। যদি তোমাদের এইরূপ শাস্তির ঘোষণার পরেও কেউ যুদ্ধ থেকে বিরত না হয়, এবং যুদ্ধ অব্যাহত রাখে, তাহলে সত্যি সত্যিই জেনে রাখ যে, তোমাদের শক্তি কম হওয়া সত্ত্বেও, তোমরাই জয়ী হবে।

কেননা, আল্লাহ্ তখন তোমাদের সঙ্গী হবেন। এবং আল্লাহ্র চাইতে উত্তম সঙ্গী ও সাহায্যকারী আর কে হতে পারে? এই আয়াত কোরআন করীমে বদরের যুদ্ধ সম্পর্কে উল্লেখিত হয়েছে, যে যুদ্ধ ছিল আরবের কাফেরদের এবং মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম নিয়মিত যুদ্ধ। তখন আরবের কাফেররা বিনা কারণে, মুসলমানদের উপরে আক্রমণ করা সত্ত্বেও, মদীনার আশে পাশে ফাসাদ ও উত্তেজনা সৃষ্টি করা সত্ত্বেও, এবং মুসলমানরা জয়লাভ করা সত্ত্বেও, এবং কাফেরদের বড় বড় নেতারা নিহত হওয়া সত্ত্বেও, কোরআন করীম মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মাধ্যমে এই ঘোষণা দিয়েছে যে, এখনও তোমরা যদি ক্ষান্ত হও, তাহলে আমরা যুদ্ধ বন্ধ করে দেব। আমরা তো শুধু এতটুকুই চাচ্ছিলাম যে, জোর করে ধর্মান্তরিত করা যাবে না। এবং ধর্মের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা যাবে না।

(৪) আল্লাহ্তায়ালা বলেন ঃ

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦١﴾

وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ ۚ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ

وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٢﴾

(সূরা আনফালঃ আয়াত ৬২, ৬৩)

অর্থাৎ- কখনও যদি কাফেররা সন্ধির দিকে ঝুঁকে, তাহলে তৎক্ষণাৎ তাদের কথা মেনে নিও। এবং সন্ধি স্থাপন করিও। এবং এই ধারণা করিও না যে, ওরা ধোকাও তো দিতে পারে। বরং আল্লাহ্‌র উপরে নির্ভর কর। আল্লাহ্ প্রার্থনা শ্রবণকারী এবং তিনি সর্বজ্ঞ। যদি, তোমাদের এই ধারণা ঠিকও হয় যে, ওরা ধোকা দিতে চাচ্ছে, এবং ধোকা দেওয়াই যদি তাদের উদ্দেশ্য হয়, তাহলেও মনে রেখো যে, তাদের ধোকাতে তোমাদের কিছু আসে যায় না। তোমরা তো সাফল্য লাভ করছ কেবল খোদাতায়ালার সাহায্যের জন্যই। তার সাহায্যই তোমাদের জন্য যথেষ্ট। অতীতেও তিনি সরাসরি সাহায্য করেছেন এবং মুমিনদের মাধ্যমেও তোমাকে সঙ্গ-সহায়তা দিয়ে এসেছেন।

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, যখন দুশমন সন্ধি করতে আগ্রহী হয়, তখন মুসলমানদের উচিত তাদের সঙ্গে সন্ধি করে ফেলা। যদি তারা সন্ধির শর্তাবলী প্রকাশ্যে পালন করতে রাজি হয়, তাহলে শুধু এই অজুহাতে সন্ধির প্রস্তাব নস্যাৎ করা যাবে না যে, শত্রুর উদ্দেশ্যে হয়ত ভাল নয়, এবং তারা সম্ভবতঃ পুনরায় আক্রমণ করার জন্য পাঁয়তারা করছে।

এই আয়াতগুলিতে, প্রকৃত প্রস্তাবে, হুদায়বিয়ার সন্ধির ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। এবং বলা হয়েছে যে, এখন এক সময় আসবে, যখন দুশমন সন্ধি করতে চাইবে। সে সময়ে তোমরা, শত্রু বাড়াবাড়ি করতে পারে বা পরে তারা এই চুক্তি ভঙ্গ করতে পারে এই অজুহাতে সন্ধি করতে অস্বীকার করো না। কেননা, এটাই পুণ্যকাজের দাবী, এবং এর মধ্যেই নিহিত তোমাদের মঙ্গল। কাজেই, সন্ধির প্রস্তাব এলে তোমরা তা গ্রহণ করবে।

(৫) আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُوا۟ وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَنْ أَلْقَىٰٓ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ۚ تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ ۚ كَذَٰلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٩٤﴾

(সূরা নিসাঃ আয়াত ৯৫)

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! তোমরা যখন খেদাতায়ালার খাতিরে যুদ্ধের জন্য বের হও, তখন একটা ব্যাপারে তোমাদেরকে নিশ্চিত হতে হবে যে, যুদ্ধ না করার পক্ষে সকল যৌক্তিকতা তোমরা তোমাদের শত্রুর নিকটে সম্পূর্ণরূপে পেশ করেছ, তথাপি তারা যুদ্ধ করতে চাচ্ছে। কিন্তু, যদি কোন ব্যক্তি বা দল কখনও

বলে, 'আমি বা আমরা সন্ধি করতে চাই', তখন তাদেরকে বলবে না 'তোমরা তো ধোকা দিতে চাচ্ছ। আমরা এটা আশা করতে পারি না যে, তোমাদের থেকে আমরা কোন নিরাপত্তা পাব।' তোমরা যদি এইরূপ কথা বল, তাহলে বুঝতে হবে যে, তোমরা খোদার রাস্তায় যুদ্ধ করার লোক নও, তোমরা বরং দুনিয়ার প্রত্যাশী। কাজেই, এরূপ করবে না। কেননা, যেভাবে খোদাতায়ালার কাছে দীন (ধর্ম) আছে, তেমনিভাবে তাঁর কাছে দুনিয়ারও সব মাল-সামান আছে, তোমাদের মনে রাখা উচিত যে, কোন লোককে হত্যা করাটা আসল উদ্দেশ্য নয়। তুমি এটা জান যে, সে হয়তো আগামীকালই হেদায়াত পেয়ে যাবে। তুমিও তো নিজে এর আগে ইসলামের বাইরে ছিলে। পরে আল্লাহ্তায়ালা কৃপা করে তোমাকে এই ধর্ম গ্রহণের তৌফীক দিয়েছেন। কাজেই, হত্যা করার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবে না। বরং প্রকৃত অবস্থা জানবার চেষ্টা করবে। মনে রাখবে যে, তুমি যা করছো তা আল্লাহ্ ভালভাবেই জানেন।

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, যখন যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে, তখন এ বিষয়ে ভালভাবে জানার চেষ্টা করবে যে, শত্রু আসলে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ করছে কি-না। কেননা, এমনও হতে পারে যে, শত্রু আক্রমণাত্মক যুদ্ধ করতে চাইছে না। বরং সে কোন কারণে ভয় পেয়ে গেছে বলেই সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। কাজেই প্রথমে নিশ্চিত রূপে জেনে নিতে হবে যে, শত্রু আসলেই আক্রমণাত্মক যুদ্ধ করতে চাচ্ছে কি-না। যদি তাই হয়, তা হল তুমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ অবতীর্ণ হতে পারবে। আর যদি সে বলে, 'যুদ্ধ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, আমরা শুধু ভয় পেয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম।' তাহলে তোমরা একথা বলতে পারবে না, 'না, তোমাদের প্রস্তুতিই বলে দিচ্ছে যে, তোমরা আমাদের উপরে আক্রমণ করতে চাচ্ছ। আমরা কি করে বুঝবো যে, আমরা তোমাদের কাছ থেকে নিরাপদে থাকবো, রক্ষা পাবো ? বরং তোমরা তাদের কথা বিশ্বাস করো এবং মনে কর যে, প্রথমে তাদের আক্রমণের ইচ্ছা থাকলেও এখন সে ইচ্ছার পরিবর্তন ঘটে গেছে। কেননা, তোমরা নিজেরাই সাক্ষী যে হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটে থাকে। তোমরা অনেকেই আগে ইসলামের দুশমন ছিলে, কিন্তু এখন তোমরা ইসলামের সৈনিক।

(৬) আবার, কোরআন করীমে দুশমনের সঙ্গে অঙ্গীকার করা সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝

(সূরা তওবাঃ আয়াত ৪)

অর্থাৎ মুশরেকদের মধ্য থেকে যারা তোমাদের সঙ্গে কোন অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছিল, এবং তারা সেই অঙ্গীকার ভঙ্গও করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে তোমাদের শত্রুকে সাহায্যও করেনি। তাহলে অঙ্গীকারের মেয়াদ কাল পর্যন্ত তোমরাও তা পালন করো, এবং অঙ্গীকারের যুক্তিকে কায়েম রাখো। এটাই হচ্ছে,তাকওয়ার (খেদা-ভীরুতার) লক্ষণ; আল্লহ্তায়ালা মুত্তাকীগণকে (খোদা-ভীরুগণকে) ভালবাসেন।

(৭) সেই শ্রেণীর শত্রুরা যারা যুদ্ধরত আছে তাদের মধ্যে কেউ যদি ইসলামের সত্যতা জানতে চায় তার সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ

(সূরা তওবাঃ আয়াত ৬)

অর্থাৎ যদি যুদ্ধরত মুশরেকদের মধ্য থেকে কেউ এই উদ্দেশ্যে আশ্রয় প্রার্থনা করে যে, সে তোমাদের কাছে এসে ইসলামের সত্যতা জানতে চায়, যাচাই করতে চায়, তাহলে তাকে অবশ্যই আশ্রয় দিতে হবে। ততদিন পর্যন্ত যতদিন না সে ভালভাবে ইসলামের সত্যতা যাচাই করে দেখতে পারে, এবং কোরআন করীমের বাণী ও বিষয়াদি সম্পর্কে অবগত হতে পারে। পরে তাকে নিজ দায়িত্বে সেই স্থান পর্যন্ত পৌছিয়ে দিতে হবে, যে স্থানে সে যেতে চায় এবং যেখানে সে নিজেকে নিরাপদ মনে করে।

(৮) যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে কোরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ

সূরা আনফালঃ আয়াত ৬৮

অর্থাৎ, কোন নবীর মর্যাদার পক্ষে এটা যথাযোগ্য নয় যে, সে তার শত্রুকে যুদ্ধ বন্দী করে রাখে, একমাত্র তাকে ছাড়া যে নিয়মিত যুদ্ধে যোগ দিয়ে বন্দী হয়েছে। অর্থাৎ, ঐ যুগে এ প্রথা প্রচলিত ছিল এবং তার পরেও কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত পৃথিবীতে প্রচলিত ছিল যে, শত্রুপক্ষের লোককে যুদ্ধ ছাড়াও গ্রেফতার করে বন্দী করা বৈধ ছিল। কিন্তু ইসলাম তা পসন্দ করে না। সেই সকল লোককেই কেবল যুদ্ধবন্দী বলা যাবে যারা নিয়মিত যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল এবং যুদ্ধের সময়েই বন্দী হয়েছিল।

(৯) আবার ঐ সকল বন্দী সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا *(সূরা মোহাম্মদ ঃ আয়াত ৫)*

অর্থাৎ, যুদ্ধবন্দীদেরকে যখন গ্রেফতার করা হবে, তখন হয় তাদেরকে দয়া করে ছেড়ে দাও, নয়তো মুক্তিপণ নিয়ে মুক্ত করে দাও।

(১০) যদি কোন যুদ্ধ বন্দী এমন থাকে যে, তার পক্ষে মুক্তিপণ দেওয়ার মত কেউ নেই, কিংবা তার আত্মীয়স্বজনেরা তার মালসম্পত্তি আত্মসাৎ করার মানসে এটাই হয় যে, সে বন্দী অবস্থাতেই থাকুক, তাহলে তার সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا ۖ وَّاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اٰتٰىكُمْ

(সূরা নূর ঃ আয়াত ৩৪)

অর্থাৎ তোমাদের যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে যাদেরকে তোমরা দয়া প্রদর্শন করে ছাড়তে পার না, এবং যাদের পক্ষে মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত করে নেওয়ার মত কেউ নেই, তারা যদি তোমাদের কাছে এই দাবী করে যে, তাকে ছেড়ে দিলে সে তার পেশায় নিয়োজিত হয়ে টাকা-পয়সা উপার্জন করে তার মুক্তিপণের টাকা পরিশোধ করে দিবে, এবং সে যদি কামাই রোজগারের যোগ্যতা রাখে, তাহলে তাকে অবশ্যই মুক্ত করে দিতে হবে। বরং নিজেও তাকে তার কাজে সহায়তা করবে। এবং খোদা তোমাকে যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে তাকে কিছু অংশ দিয়ে দিতে হবে, কিংবা যুদ্ধের খরচা বাবদ তার কাছে যে প্রাপ্য ধার্য করা হয়েছে তা থেকে তার মালিক তাকে কিছু মাফ করে দিবে অথবা অন্যান্য মুসলমানদের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে হলেও তাকে সাহায্য করবে। এবং পরিশেষে তাকে মুক্তি দিয়ে দিবে।

এসব হচ্ছে সেই সকল অবস্থা, যে যে অবস্থায় ইসলাম যুদ্ধের অনুমতি দান করে। এবং এই হচ্ছে সেই নীতি-মালা যার আওতায় ইসলাম যুদ্ধের অনুমতি দান করে। সুতরাং কোরআন করীমের এই সকল আয়াতের আলোকে রসূলে করীম (সাঃ) যে সব অবশ্য পালনীয় শিক্ষা মুসলমানদেরকে দান করে গেছেন তা হচ্ছেঃ

(১) মুসলমানরা কোন অবস্থাতেই মৃতদেহ বিকৃত করতে পারবে না অর্থাৎ যুদ্ধে মুসলমানদের দ্বারা নিহত ব্যক্তির লাশ লাঞ্ছিত করতে পারবে না। লাশের অংগ প্রত্যংগ কাটতে পারবে না। *

(২) মুসলমানরা যুদ্ধে ধোকাবাজির আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবে না।

(৩) শিশু ও নারী হত্যা করতে পারবে না।**

---

* *মুসলিম মিসরী ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা -৬২, কিতাবুল জিহাদ*

** *মুসলিম মিসরী ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা -৬৫, কিতাবুল জিহাদ*

(৪) পাদ্রী, পুরোহিত, প্রভৃতি ধর্মের সেবায় নিয়োজিত কোন ব্যক্তিকে হত্যা করতে পারবে না। *(তাহাবী)*

(৫) বৃদ্ধ ব্যক্তিকে হত্যা করতে পারবে না। নারী হত্যা করতে পারবে না এবং সব সময়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও দয়া প্রদর্শনের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে।*

(৬) মুসলমানরা যখন যুদ্ধের উদ্দেশ্যে শত্রুর দেশে প্রবেশ করবে, তখন ভীতি ও সন্ত্রাসের সৃষ্টি করতে পারবে না। সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার করতে পারবে না।**

(৭) যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে এমন স্থানে শিবির স্থাপন করতে পারবে না, যেখানে লোকজনের অসুবিধা হবে। এবং এমনভাবে কুচকাওয়াজ বা মার্চ করে অগ্রসর হতে পারবে না, যাতে সাধারণ মানুষের চলাচলের অসুবিধা হবে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বিষয়টা কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন যে, যে ব্যক্তি এই সব হুকুম অমান্য করবে তার যুদ্ধ হবে তার নিজের প্রবৃত্তি বা নফ্সের জন্য খোদার জন্য নয়।***

(৮) যুদ্ধের সময় শত্রুর মুখমণ্ডলে আঘাত করতে পারবে না।

(বুখারী ও মুসলিম,)

(৯) যুদ্ধের সময় চেষ্টা করতে হবে যাতে শত্রুর যথাসম্ভব কম ক্ষতি হয়।

(আবু দাউদ)

(১০) যারা গ্রেফতার হবে অর্থাৎ যুদ্ধ-বন্দী হবে তাদের মধ্যে নিকট আত্মীয় থাকলে তাদেরকে অন্যদের থেকে পৃথক করা যাবে না।****

(১১) যুদ্ধবন্দীদের আরামের প্রতি নিজেদের আরামের চাইতে বেশী খেয়াল রাখতে হবে। *(তিরমীযি)*

(১২) ভিন দেশী দূত ও প্রতিনিধিদের প্রতি সম্মান ও শিষ্টাচার বজায় রাখতে হবে; তারা ভুল বা শিষ্টাচার বিরোধী আচরণ করলেও তা উপেক্ষা করতে হবে।

-(আবু দাউদ ঃ কিতাবুল জিহাদ)।

(১৩) যদি কেউ যুদ্ধ-বন্দীর প্রতি অত্যাচার করে, তাহলে সেই যুদ্ধ-বন্দীকে বিনা মুক্তিপণে মুক্ত করে দিতে হবে।

---

* *আবু দাউদ ঃ প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ২৫২, কিতাবুল জিহাদ*
** *মুসলিম মিসরী ঃ ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৬২, কিতাবুল জিহাদ*
*** *আবু দাউদ ঃ প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৫৩, কিতাবুল জিহাদ*
**** *আবু দাউদ ঃ ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ২৯৭, কিতাবুল জিহাদ*

(১৪) যে ব্যক্তির কাছে কোন যুদ্ধ-বন্দীকে রাখা হবে, তাকে সে তা-ই খেতে দিবে যা সে নিজে খায়; তাকে সেই কাপড় পরতে দিবে যা সে নিজে পরে- (বুখারী)। হযরত আবুবকর (রাঃ) এই আদেশাবলীর আলোকে এই সম্পূরক আদেশটিও দিয়ে গেলেন যে, দালান কোঠা ভাঙ্গতে পারবে না, ফলবান বৃক্ষ কাটতে পারবে না। *(মুয়াত্তা ইমাম মালেক মুজাতাবাঈ,কিতাবুল জিহাদ, পৃষ্ঠা-৩৬৭)*

(১৫) এই সকল আদেশ নিষেধ থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, ইসলাম যুদ্ধ রহিত করার জন্য কত উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এবং রসূলে করীম (সাঃ) কত প্রকৃষ্টরূপে এই সকল শিক্ষা অনুসরণ করার জন্য নির্দেশ ও তাকিদ দিয়ে গেছেন। প্রত্যেকেই উপলব্ধি করতে পারবেন যে, এই যুগে না মূসার (আঃ) শিক্ষাকে সুবিচারের শিক্ষা হিসেবে গ্রহণ করা যাবে, না সেই শিক্ষা অনুসরণ করে চলা যাবে এবং এই যুগে না মসীহ (আঃ)-এর শিক্ষাকে অনুসরণ করা যাবে। না কখনও তা অনুসরণ করেছে খৃষ্টান জগৎ। একমাত্র ইসলামের শিক্ষাই অনুসরণযোগ্য, যা পালন করে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

সন্দেহ নেই যে, এই যুগে মিঃ গান্ধী দুনিয়ার সামনে, দৃশ্যতঃ এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চেয়েছেন যে, যুদ্ধের সময়েও, অর্থাৎ যুদ্ধ চাপিয়ে দিলেও, যুদ্ধ করা অনুচিত। কিন্তু, যে শিক্ষাকে মিঃ গান্ধী পেশ করতে চেয়েছেন, তার অনুসরণ পৃথিবীতে কখনই হয়নি। যার দরুন, এর ভাল বা মন্দ কোন কিছুই উপলব্ধি করা সম্ভব হয়নি। মিঃ গান্ধীর জীবদ্দশাতেই কংগ্রেস রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করেছিল, এবং কংগ্রেসী সরকার দেশের সেনাবাহিনী বিলোপ করে দেয়নি। বরং তারা এই প্রস্তাব করেছিল যে, ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির সেই সকল অফিসার যাদেরকে বৃটিশ সরকার বরখাস্ত করেছিল, তাদেরকে পুনরায় সেনা বাহিনীতে নিয়োগ করা হোক। বরং হিন্দুস্থানে কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় আসার সাত দিনের মধ্যে উড়োজাহাজে করে বোমাবর্ষণ করেছে। গান্ধীজি স্বয়ং ঐ সব যুদ্ধাপরাধীকে সাহায়তা দান করার জন্য এবং তাদেরকে মুক্তি দেওয়ার জন্য সরকারের উপরে চাপসৃষ্টি করেছিলেন। এথেকে প্রমাণিত হয় যে, না গান্ধীজির, না তাঁর অহিংস আন্দোলনের (NonViolence) অনুসরণ করা সম্ভব। এবং তা দুনিয়ার সামনে এমন কোন বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেনি, যা থেকে বুঝা যাবে যে, বিভিন্ন জাতি ও দেশের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহে ঐ সব শিক্ষার অনুসরণ করা সম্ভব। বরং এই শিক্ষা প্রচার করার সময়েও, একথাও বলা হতো যে, বাস্তবে এই শিক্ষা (অহিংস আন্দোলন) অনুসরণ করা সম্ভব নয়।

সুতরাং আজও পর্যন্ত পৃথিবীর যা লক্ষ্য করা গেছে এবং মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনায় যা যথার্থ বলে প্রতিভাত হয়েছে, তাতে এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রদত্ত শিক্ষা এবং প্রদর্শিত পদ্ধতি ও পন্থাই সঠিক ও সর্বোত্তম।

(আল্লাহুম্মা সাল্লে 'আলা মুহাম্মাদেঁও ওয়া আলে মুহাম্মদ ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ)

পরিখার যুদ্ধের পর
মুসলমানদের উপরে কাফেরদের আক্রমণ

পরিখার যুদ্ধে যদিও কাফেরদের শক্তি বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং তারা দারুণভাবে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েছিল, তবু যুদ্ধ থেকে ফেরার পর তাদের এই ধারণাটা থেকেই গিয়েছিল যে, তারা সংখ্যার দিক থেকে অনেক বেশী এবং সেই তুলনায় মুসলমানরা নিতান্তই কম। কাজেই তারা মনে করলো যে, তারা মুসলমানদেরকে যেখানে যেখানে একলা দোকলা পাবে সেখানে সেখানেই তাদেরকে হত্যা করতে পারবে। এবং এভাবেই যুদ্ধের বিপর্যয়ের কিছুদিন পরেই আশেপাশের কবিলাগুলো মুসলমানদের উপর চোরাগোপ্তা হামলা চালাতে শুরু করলো। এই পর্যায়ে ফাযরা গোত্রের কিছু সংখ্যক লোক উটে চড়ে একবার মদীনার নিকটে মুসলমানদের উপরে আক্রমণ করলো, এবং মুসলমানদের উটের রাখালকে হত্যা করে, তার স্ত্রীকে বন্দী করে এবং তাদের সবগুলো উট ধরে নিয়ে যায়। পরে বন্দীনি স্ত্রীলোকটি কোনক্রমে পালিয়ে আসে। কিন্তু হামলাকারীরা বহুসংখ্যক উট নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এর একমাস পরে উত্তর দিক থেকে গোৎফান গোত্রের লোকেরাও মুসলমানদের উটের পাল লুট করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মুহাম্মাদ বিন মুসল্লামাকে (রাঃ) দশজন আরোহীসহ ঘটনা তদন্তের জন্য এবং সেই সঙ্গে মুসলমানদের পশুর পালগুলো পাহারা দেওয়ার জন্য প্রেরণ করন। কিন্তু শত্রুরা সযোগ পেয়ে তাঁদেরকে হত্যা করে। আহত ও অজ্ঞান মুহাম্মদ বিন মুসাল্লামা (রাঃ) কেও তারা মৃত মনে করে ফেলে রেখে যায়। শত্রুরা চলে গেলে তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে এবং তিনি মদীনায় ফিরে আসেন ও ঘটনার কথা বলেন। তিনি বলেন যে, তাঁর সকল সঙ্গীকে হত্যা করা হয়েছে। একমাত্র তিনিই প্রাণে বেঁচে গেছেন। কিছুদিন পর রসূলে করীম (সাঃ)-এর একজন দূতের উপরে (যাঁকে রোমান সরকারের নিকটে প্রেরণ করা হয়েছিল) যুরহাম গোত্রের লোকেরা হামলা চালায় এবং তাঁর সবকিছু লুট করে নিয়ে যায়। এর মাস খানেক পরে বনু কোরায়যার লোকেরা মুসলমানদের একটি কাফেলার উপরে আক্রমণ চালায় এবং লুট করে। এই হামলা সম্ভবতঃ কোন

ধর্মীয় শত্রুতার কারণে করা হয়নি। কেননা, বনু কোরায়যা গোত্রটি ছিল এক ডাকাত গোত্র। যারা সব গোত্রের লোকদেরকেই আক্রমণ করে লুট করতো, হত্যা করতো।

এই সময়ে খায়বারের ইহুদীরা, যারা পরিখার যুদ্ধের আসল কারণ ছিল, তারাও তাদের শোচনীয় পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে আশেপাশের কবিলাগুলোকে উস্কানী দিয়ে যাচ্ছিল। তারা রোমান সাম্রাজ্যের সীমান্তে বসবাসকারী উপজাতীয় লোকদেরকে এবং রোমান কর্মকতাদেরকেও মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলছিল। যেহেতু, আবার নেতাদের পক্ষে মদীনার উপরে আক্রমণ চালাবার ক্ষমতা ছিল না, সেহেতু তারা ইহুদীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো, এবং সারাটা আরব জুড়ে মুসলমানদেরকে দুঃখ-যাতনা দেওয়ার জন্য, তাদেরকে জব্দ ও লুণ্ঠন করা জন্য পাঁয়তারা শুরু করে দিল। কিন্তু তখনও পর্যন্ত মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কোন প্রকারের কোন সিদ্ধান্তই ছিল না কাফেরদের সঙ্গে চূড়ান্ত যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার। তিনি তখনও পর্যন্ত এই আশাই পোষণ করছিলো এবং প্রতীক্ষা করছিলেন যে, আরব নেতারা হয়ত বা সন্ধির প্রস্তাব দিবে, যার ফলে এই গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটবে।

পনের শত সাহাবীসহ রসূলে পাক (সাঃ)-এর মক্কা যাত্রা

এই সময়টাতে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম একটি রূইয়া (সত্যস্বপ্ন) দেখেন। যে রূইয়ার বর্ণনা এসেছে কোরাআন করীমে এইভাবে ঃ

لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ
لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿٢٧﴾

অর্থাৎ, নিশ্চয় তুমি আল্লাহ্তায়ালার সাহায্যে মসজিদুল হারাম-এ নিরাপত্তার সাথে প্রবেশ করবে। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ মাথা ন্যাড়া করে ফেলবে এবং অনেকেই মাথার চুল কেটে ফেলবে। (হজ্জের সময় রীতি হিসেবে মাথা মুন্ডন করা হয় বা মাথার চুল কেটে ফেলা হয়)। তুমি কাউকে ভয়ও পাবে না। আল্লাহ্তায়ালা জানেন যা তুমি জান না। এ জন্য তিনি এই রূইয়া পূর্ণ হওয়ার পূর্বে আর এক বিজয় নির্ধারিত করে রেখেছিলেন যা অর্জিত হওয়ার কথা রূইয়াতে দেখানো বিজয়ের পূর্ব, অগ্রবর্তী বিজয়রূপে। *(সূরা ফাতাহ্ঃ আয়াত ২৮)*

ঐ রূইয়াতে প্রকৃত প্রস্তাবে, বিনা যুদ্ধে শান্তি ও নিরাপত্তার সহিত মক্কা বিজয়ের খবর দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) রূইয়াটির তা'বির বা ব্যাখ্যা করেছিলেন যে, আল্লাহ্তায়ালা অবিলম্বে তাঁকে এবং মুসলমানদেরকে কাবা ঘর তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করার নির্দেশ দান করেছেন। এবং যেহেতু এই ব্যাখ্যা ভুল হওয়া সত্ত্বেও তার মধ্যে আসন্ন অগ্রবর্তী বিজয়ের বিষয়টি বিধৃত ছিল, সেহেতু আল্লাহ্তায়ালা রসূলে করীম (সাঃ)-কে এ ব্যাপারে পূর্ব থেকে আর কিছু অবহিত করতে চাননি। সুতরাং, তিনি বিষয়টি তাঁর সাহাবীগণের মধ্যে ঘোষণা করেই দিলেন এবং তাঁদেরকে (রাঃ) তাঁর সঙ্গে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। কিন্তু, তিনি বলেছিলেন, আমরা শুধু তওয়াফ করার উদ্দেশ্যেই যাব। আমরা কোন সংঘর্ষ বা এমন কিছুই করবো না, যা শত্রু পক্ষের অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে।

অতএব, ৬২৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে পনের শ' সঙ্গীসহ তিনি (সঃ) মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেলেন। (স্মর্তব্য যে, খন্দকের যুদ্ধের এক বৎসর পরে পনের শ' লোকসহ যাত্রা করা থেকে বুঝা যায় যে, ঐ যুদ্ধে মুসলিম সৈনিকদের সংখ্যা যাত্রীদের এই সংখ্যার চাইতে কম ছিল। কেননা, এক বছরের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে ছিল, কমেনি। কাজেই পরিখা বা খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুসলিম সৈন্যের যে সকল ঐতিহাসিক তিন হাজার বলে উল্লেখ করেছেন, তারা ভুল করেছেন। আসলে, ঐ সংখ্যা ছিল বার শ' এবং এটাই সঠিক সংখ্যা)। হজ্জের কাফেলার কিছু দূর আগে আগে অগ্রবর্তী দল হিসেবে কুড়ি জনের একটি আরোহী দল যাচ্ছিল। উদ্দেশ্য, শত্রুরা মুসলমানদের কোন ক্ষতি সাধন করতে চাইলে, তা সময় মত পূর্বেই জ্ঞাত হওয়া। যখন মক্কাবাসীরা আঁ হযরত (সঃ)-এর এই যাত্রার কথা জানতে পেল, তখন তারা মক্কা শহরকে একটা কেল্লায় পরিণত করে ফেল্লো এবং আশে পাশের কবিলাগুলোকেও তাদের সাহায্যার্থে আহ্বান জানালো। যদিও, তারা এই ধর্ম বিশ্বাস পোষণ করতো যে, কাবা ঘরে তওয়াফ করার সময় কাউকে বাধা দেওয়া যাবে না। এবং মুসলমানরাও এই ঘোষণা দিয়েছিল যে, তারা শুধু তওয়াফ করার উদ্দেশ্যেই মক্কায় আসছে, কোন প্রকার ঝগড়া-বিবাদ করার উদ্দেশ্য নয়। যখন আঁ হযরত (সাঃ) মক্কার কাছাকাছি পৌঁছে গেলেন, তখন তিনি জানতে পারলেন যে, কোরেশরা চিতা বাঘের চামড়া পরিধান করেছে, এবং নিজেদের বিবি ও বাচ্চাদেরকেও সঙ্গে নিয়েছে, এবং এই কসম খেয়েছে যে, তারা কিছুতেই আঁ হযরত (সাঃ)-কে মক্কায় প্রবেশ করতে দিবে না। এটা আরবদের একটা প্রথা ছিল যে, যখন কোন গোত্র মৃত্যুকে বরণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়, তখন তাদের নেতারা চিতা বাঘের চামড়া পরে। যার অর্থ এটাই যে, এখন আর বুদ্ধি-

বিবেচনার বা ছলা-কলার কোন অবকাশ নেই, এখন আমরা সাহসিকতা ও বীরত্বের সঙ্গে জীবন বিসর্জন দিব। এই খবর প্রচারিত হওয়ার কিছু পরেই মক্কার সেনাবাহিনীর একটি অগ্রবর্তী দল মুসলমানদেরকে বাধা দান করার জন্য মুখোমুখী এসে দাঁড়ালো। এমতাবস্থায়, মুসলমানদের পক্ষে সামনে অগ্রসর হওয়ার একটি মাত্র রাস্তাই খোলা রইলো এবং তা হলো যুদ্ধ করে শত্রুকে পরাজিত করে অগ্রসর হওয়া। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যেহেতু এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এসেছিলেন যে, আর যাই হোক তিনি যুদ্ধ করবেন না, সেহেতু তিনি মরুভূমির পথ সম্পর্কে ওয়াকেবহাল একজন পথ প্রদর্শক বা গাইডকে দায়িত্ব দিলেন যে, সে যেন মরুভূমির মধ্য দিয়ে ভিন্ন পথে মুসলমানদের কাফেলাকে মক্কা পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। সেই গাইড আঁ হযরত (সাঃ) এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে নিয়ে মক্কার নিকটবর্তী হোদায়বিয়া নামক স্থানে গিয়ে উপনীত হলো। এই স্থানে আঁ হযরত (সাঃ)-এর উটনী দাঁড়িয়ে গেল এবং আর অগ্রসর হতে চাইলো না। সাহাবীগণ (রাঃ) বললেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্! আপনার উটনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে আপনি আর একটাতে আরোহণ করুন।' কিন্তু তিনি (সাঃ) বললেন, 'না, না, এ ক্লান্ত হয়নি, বরং মনে হচ্ছে, খোদাতায়ালার এটাই ইচ্ছা যে, আমরা এখানেই থেমে যাই। কাজেই, আমি এখান থেকেই মক্কাবাসীদের কাছে সকল উপায়ে আমার অভিপ্রায় জানাব, যেন তারা আমাদেরকে হজ্জ করার সুযোগ দেয়। এ ব্যাপারে আমি তাদের যে কোন শর্ত মানতে প্রস্তুত। ইতোমধ্যে মক্কার সেনাবাহিনী মক্কা থেকে অনেক দূরে অবস্থান গ্রহণ করে মুসলমানদের আগমনের প্রতীক্ষা করছিল। সুতরাং মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বিনা বাধায় মক্কায় প্রবেশ করতে পারতেন। কিন্তু, যেহেতু তিনি (সাঃ) এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যে, তিনি প্রথমে এই প্রচেষ্টা চালাবেন যে, মক্কাবাসীরা প্রথমেই যুদ্ধ শুরু করে দেয়, এবং তাকে যুদ্ধ করতে বাধ্য করে, তাহলে তিনিও বাধ্য হয়ে যুদ্ধই করবেন। অতএব, মক্কায় প্রবেশের পথ উন্মুক্ত থাকা সত্ত্বেও, তিনি হোদায়বিয়াতেই তাঁর শিবির স্থাপন করলেন। হোদায়বিয়াতে তাঁর এই অবস্থান গ্রহণের সংবাদ অবিলম্বেই মক্কার সেনাবাহিনীর কাছে পৌঁছে গেল। এবং তারা দ্রুত সেখান থেকে পিছু হটে এসে মক্কার নিকটে অবস্থান গ্রহণ করলো। তারা রসূলে পাক (সাঃ)-এর সঙ্গে আলোচনার জন্য প্রথমে বুদাইল নামক একজন সর্দারকে প্রেরণ করলো। সে যখন তাঁর (সাঃ) কাছে এলো, তখন তিনি বললেন, 'আমি তো এসেছি শুধু তওয়াফ করার জন্য। তবে মক্কাবাসীরা যদি বাধ্য করে, তাহলে আমাদেরকে যুদ্ধই করতে হবে।' এরপর এলো মক্কার সেনাবাহিনীর কমাণ্ডার আবু সুফিয়ানের জামাতা উরওয়া। সে রসূলে করীম (সাঃ)-এর সাথে অত্যন্ত গর্হিত আচরণ করলো এবং বললো, 'আপনি এইসব ইতর ছোটলোকের বাচ্চাদের নিয়ে এসেছেন, এদেরকে মক্কাবাসীরা কখনই তাদের শহরে প্রবেশ করতে দিবে না।'

এইভাবে একের পর এক বার্তাবাহক আসতে থাকলো। অবশেষে, মক্কাবাসীরা বলে পাঠাল, 'আর যাই হোক এ বছর আপনাকে আমরা তওয়াফ করতে দেব না। কেননা, এতে আমরা অপদস্থ হবো। তবে, আপনি যদি আগামী বছরে আসেন তাহলে আমরা আপনাকে অনুমতি দেব।'

পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোর লোকেরা মক্কাবাসীদের কাছে বলতে লাগলো, 'এরা তো এসেছে শুধু তওয়াফ করার জন্য। আপনারা এদেরকে বাধা দিচ্ছেন কেন?' কিন্তু মক্কাবাসীরা তাদের জিদ ছাড়লো না। এতে বাইরের গোত্রগুলোর লোকেরা মক্কাবাসীদেরকে বলতে থাকলো, 'আপনাদের ব্যাপার দেখে মনে হচ্ছে যে, কলহ-সংঘর্ষই আপনাদের কাম্য, শান্তি আপনাদের কাম্য নয়। এমতাবস্থায়, আমরা আপনাদের সাথে থাকতে প্রস্তুত নই।' এতে মক্কাবাসীরা ঘাবড়ে গেল। এবং তারা এই অভিমত প্রকাশ করলো যে, তারা মুসলমানদের সঙ্গে সমঝোতা করার চেষ্টা করবে। বিষয়টা যখন রসূলে করীম (সাঃ) জানতে পারলেন, তখন তিনি হযরত ওসমান (রাঃ)-কে যিনি পরবর্তীকালে তাঁর তৃতীয় খলীফা হয়েছিলেন, তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন মক্কাবাসীদের সঙ্গে আলোচনার জন্য। হযরত ওসমান (রাঃ) যখন মক্কায় পৌঁছে গেলেন, তখন মক্কায় তাঁর যে বড় বড় আত্মীয় স্বজনরা ছিল তারা একত্রিত হলো এবং তাঁকে বললো, 'আপনি তওয়াফ করে নিন।' কিন্তু হযরত ওসমান (রাঃ) বললেন, 'আমি আমার নেতাকে বাদ দিয়ে তওয়াফ করতে পারবো না।' যেহেতু মক্কার নেতাদের সঙ্গে তাঁর আলোচনা দীর্ঘ হচ্ছিল, সেহেতু সেই সুযোগ মক্কার অন্যান্য লোকেরা শয়তানী করে এই গুজব ছড়িয়ে দিল যে, ওসমানকে কতল করা হয়েছে। এবং সেই গুজব ছড়াতে ছড়াতে রসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ)-এর কাছ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সাহাবীদেরকে ডেকে সমবেত করলেন এবং বল্‌লেন, 'দূতের জীবন প্রত্যেক জাতির কাছে নিরাপদ, তোমরা শুনে থাকবে যে, ওসমানকে মক্কাবাসী হত্যা করেছে। যদি এই খবর সঠিক হয়, তাহলে আমরা জোর করে মক্কায় প্রবেশ করব। (অর্থাৎ যে পরিস্থিতিতে আমরা শপথ নিয়েছিলাম যে, আমরা শান্তির সঙ্গে মক্কায় প্রবেশ করবো, সেই পরিস্থিতি যদি বদলে যায়, তাহলে পরবর্তী অবস্থায় আমাদের জন্য আর সেই শপথ পালন করা বাধ্যকর থাকবে না।) যারা এই প্রতিজ্ঞা করতে প্রস্তুত রয়েছে যে, যদি আমাদেরকে অগ্রসর হতেই হয় তাহলে হয় আমরা বিজয় অর্জন করবো, নয় তো যুদ্ধক্ষেত্রে এক এক করে মৃত্যুবরণ করবো। এবং এই প্রতিজ্ঞার জন্য তাদেরকে আমরা হাতে বয়াত গ্রহণ করতে হবে।' আঁ হযরত (সাঃ) এই ঘোষণা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সাথে আগমনকারী পনের শত তীর্থযাত্রী পনের শত সৈনিকে রূপান্তরিত হয়ে গেল। এবং পাগলপারা হয়ে একে অপরের আগে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর হাতে বয়াত করার জন্য হুড়াহুড়ি শুরু করে

দিলেন। এই বয়াত সমগ্র ইতিহাসে এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, এবং তা 'বৃক্ষের বয়াত' নামে প্রসিদ্ধ। কারণ যখন রসূলে করীম (সাঃ) এই বয়াত গ্রহণ করেছিলেন, তখন তিনি একটি বৃক্ষের নীচে বসা ছিলেন। এই বয়াতে অংশগ্রহণকারীদের শেষ ব্যক্তিটি পর্যন্ত যতদিন পৃথিবীতে বেঁচে ছিলেন ততদিন তারা এই বয়াতের কথা গর্বের সাথে বলে বেড়াতেন। কেননা, পনের শ' লোকের মধ্যে একজনও এই বয়াত গ্রহণ করতে কোন প্রকার দ্বিধা করেননি। তাঁরা শপথ নিলেন যে, যদি শত্রু ইসলামী দূতকে হত্যা করেই থাকে, তাহলে হয় তারা সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বেই মক্কা জয় করবে, নয় তো সন্ধ্যার পূর্বেই যুদ্ধ ক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করবে। কিন্তু এই বয়াত গ্রহণ শেষ হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই হযরত ওসমান (রাঃ) ফিরে এলেন। এবং তিনি বল্‌লেন যে, মক্কাবাসীরা এ বছর ওমরাহ করতে দিতে পারবে না, তবে তারা আগামী বছরে অনুমতি দিতে রাজি আছে। কাজেই, এ ব্যাপারে একটা চুক্তি সম্পাদন করার জন্য তারা প্রতিনিধিও প্রেরণ করছে। হযরত ওসমান (রাঃ) ফিরে আসার অল্পক্ষণ পরেই সুহায়েল নামক মক্কার একজন নেতা আঁ হযরত (সাঃ)-এর নিকটে উপস্থিত হলে একটি অঙ্গীকারনামা লিখা হলো।

হোদায়াবিয়ার সন্ধির শর্তাবলী

আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে শুরু করছি।

মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ্ (সাঃ) এবং সোহায়েল ইবনে আমর (মক্কা প্রশাসনের প্রতিনিধি)-এর মধ্যে সম্পাদিত এই শান্তি চুক্তির শর্তাবলী হচ্ছেঃ

দশ বছরের জন্য যুদ্ধ বন্ধ করা হলো।

কোন ব্যক্তি মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সঙ্গে যোগ দিতে চাইলে, কিংবা তাঁর সাথে কোন চুক্তি করতে চাইলে করতে পারবে।

অপরপক্ষে,

কোন ব্যক্তি কোরেশদের সঙ্গে যোগ দিতে চাইলে, কিংবা তাদের সঙ্গে কোন চুক্তি করতে চাইলে করতে পারবে।

যদি কোন নাবালক বা তরুণ ছেলে, যার পিতা জীবিত আছে, তার পিতা বা অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সঙ্গে যোগ দেয়, তবে তাকে তার পিতা বা অভিভাবকের কাছে ফেরৎ পাঠাতে হবে।

পক্ষান্তরে,

মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কোন সঙ্গী যদি কোরেশদের সঙ্গে যোগ দেয় তবে তাকে ফেরৎ পাঠাতে হবে না।

মুহাম্মদ (সাঃ) এ বছর মক্কায় প্রবেশ না করেই ফিরে যাবেন। তবে আগামী বছর মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর সঙ্গীরা মক্কায় আসতে পারবেন। এবং তিনদিন মক্কায় থেকে কাবা তওয়াফ করতে পারবেন। এই সময়ে কোরেশরা শহর ছেড়ে পাহাড়ের উপরে গিয়ে অবস্থান করবে। মক্কায় অবস্থান কালে মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীরা খাপবদ্ধ তরবারি, যা কিনা আরবের প্রথা অনুযায়ী সফরকারীরা সঙ্গে রাখতে পারে, তা ছাড়া অন্য আর কোন অস্ত্র সঙ্গে রাখতে পারবে না। *

এই চুক্তি সম্পাদনের সময়ে দু'টো অদ্ভূত ঘটনা ঘটে গেল। সন্ধি চুক্তির শর্তাবলী আলোচনার মাধ্যমে ঠিক হয়ে যাওয়ার পর মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন চুক্তিনামা লিখাতে শুরু করলেন, তখন তিনি বললেন, 'বিস্‌মিল্লাহির রহমানীর রাহীম।' (আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে শুরু করছি যিনি অযাচিত-অসীম দাতা এবং বারবার দয়াকারী) তখন সুহায়েল এতে আপতি জানালো এবং বললো, 'আল্লাহকে তো আমরা জানি, কিন্তু এই অযাচিত-অসীম দাতা এবং বারবার রহমকারী কে ? তাকে তো আমরা জানি না। এই চুক্তিনামা সম্পাদিত হচ্ছে আমাদের ও আপনাদের মধ্যে। কাজেই, এর মধ্যে উভয়ের ধর্মবিশ্বাসের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে হবে।' এতে আঁ হযরত (সাঃ) সম্মত হলেন এবং শুধু এতোটুকুই লিখালেন যে, 'আল্লাহ্‌র নামে আমরা এই চুক্তি সম্পাদন করছি।'

অতঃপর, তিনি লিখালেন, 'এই সন্ধির শর্তাবলী নির্ধারিত হচ্ছে মক্কাবাসীদের এবং মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মধ্যে। এতেও সুহায়েল আপত্তি জানালো এবং বললো, 'আমরা যদি আপনাকে আল্লাহ্‌র রসূল বলেই স্বীকার করতাম, তাহলে তো আপনার সঙ্গে লড়াই করতাম না।' আঁ হযরত (সাঃ) তাঁর এই আপত্তিও মেনে নিলেন। এবং 'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্' (সাঃ)-এর স্থলে লিখলেন 'মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ্।' তিনি যেহেতু মক্কাবাসীদের সব কথাই মেনে নিচ্ছিলেন সেহেতু সাহাবীদের (রাঃ) মনে দারুণ ক্ষোভের সৃষ্টি হলো এবং ক্রোধে তাদের রক্ত টগবগ করতে লাগলো। এমনকি হযরত উমর (রাঃ) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে গেলেন এবং তাঁকে বললেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমরা কি সত্য নই ?' আঁ হযরত (সাঃ) বললেন, 'হ্যা, অবশ্যই।' তিনি (রাঃ) আবার বললেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্! আল্লাহ কি আপনাকে একথা বলেননি যে, আমরা কাবাঘর

---

* *ইবনে হিশাম : ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৮০, বুখারী কিতাবুশ্ শরূত*

তওয়াফ করবো ?' তিনি (সাঃ) বললেন, 'হ্যাঁ বলেছেন।' এতে উমর (রাঃ) বল্‌লেন, 'তাহলে, আপনি কেন এই চুক্তি করলেন ?' রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বল্‌লেন, 'উমর, আল্লাহ্ তো আমাকে একথা ঠিকই বলেছেন যে, আমরা শান্তির সঙ্গে কাবাঘর তওয়াফ করবো, কিন্তু তিনি তো একথা বলেননি যে, আমরা তওয়াফ এ বছরই করবো। এটা তো ছিল আমার নিজের ধারণা।' একইভাবে, কোন কোন সাহাবী (রাঃ) এই আপত্তিও উত্থাপন করলেন যে, কেন এই অঙ্গীকার করা হলো যে, মক্কার কোন তরুণ যদি মুসলমান হয়ে চলে আসে তবে তাকে তার পিতা বা অভিভাবকের কাছে ফেরৎ পাঠাতে হবে, অথচ কোন মুসলমান যদি মক্কাবাসীদের কাছে চলে যায়, তবে তাকে ফেরৎ পাঠাতে হবে না ?' রসূলে করীম (সাঃ) বললেন, 'এতে সন্দেহের কি অবকাশ রয়েছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি যে মুসলমান হয়ে যায় সে ইসালামকে সত্য জেনেই মুসলমান হয়। প্রথা বা সংস্কারের কারণে মুসলমান হয় না। এরা যেখানেই থাকুক না কেন, ইসলামের তবলীগ করবেই। এবং সে তখন ইসলাম প্রচারের মাধ্যম হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি ইসলাম ছেড়ে মুরতাদ হয়ে যাবে, তাকে আমাদের মধ্যে রেখেই বা আমরা কি করবো। যে ব্যক্তি আমাদের ধর্মকে মিথ্যা মনে করবে, সে আমাদের কোন্ কাজে আসবে ?'

আঁ হযরত (সাঃ) প্রদত্ত এই উত্তরের মধ্যে ঐ সমস্ত ভ্রান্ত মতাবলম্বী মুসলমানদেরও জওয়াব নিহিত রয়েছে, যারা মনে করে যে, ইসলামে মুরতাদ বা ধর্মত্যাগীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। ইসলামে মুরতাদের শাস্তি যদি মৃত্যুদণ্ডই হতো তাহলে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এই কথার উপরে জোর দিতেন যে, প্রত্যেক মুরতাদকে ফেরৎ আনতে হবে যাতে তাকে তার এই অপরাধের শাস্তি দেওয়া যায়।

যখন এই চুক্তিপত্র লেখা হলো, এবং তার উপর দস্তখত করা হলো, ঠিক তখনই আল্লাহ্‌তায়ালা এই চুক্তিপত্রের সত্যতা যাচাই করার এক উপলক্ষ্য সৃষ্টি করলেন। সুহায়েল, যে মক্কাবাসীদের পক্ষ থেকে চুক্তি সম্পাদন করছিল, তার নিজের ছেলে রশি দিয়ে বাঁধা অবস্থায় এবং জখমে জখমে জর্জরিত অবস্থায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সামনে এসে আছড়ে পড়ে গেল এবং বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমি মনে প্রাণে মুসলমান হয়েছি। ইসলাম গ্রহণ করার জন্য আমার বাপ আমার উপরে এই অত্যাচার চালাচ্ছেন। আমার বাপ এখানে আসায় আমি সুযোগ পেয়ে আপনার কাছে আসতে পেরেছি।' রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কিছু বলার আগেই তার পিতা সুহায়েল বল্‌লো, 'এখনই এই চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। সুতরাং এই নওজোয়ানকে আমার সঙ্গেই ফিরে যেতে হবে।' ঐ সময়ে মুসলমানরা তাদের চোখের সামনে আবু জন্দলের করুণ অবস্থা দেখছিল। তারা তাদের এক ভাই-যাকে তার পিতার হাতেই এই অবর্ণনীয় অত্যাচারে জর্জরিত হতে হচ্ছিল-

তাকে ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়াটা সহ্য করতে পারছিল না, তারা তাদের তরবারি নিষ্কোষিত করলো এবং এই শপথ গ্রহণ করলো যে, তারা বরং মৃত্যুবরণ করবে, তবু তারা তাদের এই ভাইকে পুনরায় জুলুমের মধ্যে ফিরে যেতে দিবে না। স্বয়ং আবু জন্দলও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে প্রার্থনা করতে থাকলো, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্! আপনি তো আমার অবস্থা দেখতে পাচ্ছেন। আপনি স্বয়ং আমার এই অবস্থার সাক্ষী তবু কি আপনি আমাকে পুনরায় ঐ জালেমদের হাতে তুলে দিবেন? তাহলে তো তারা আমার উপর আগের চাইতে আরও বেশী করে অত্যাচার চালাবে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বল্লেন, 'আল্লাহ্র রসূল তো কখনও কোন চুক্তি ভঙ্গ করে না। আবু জন্দল! আমি চুক্তি করেছি। তুমি সবর করো এবং আল্লাহ্র উপরে নির্ভর করো তিনি তোমার এবং তোমার মত অন্যান্য নওজোয়ানদের রক্ষার জন্য কোন না কোন উপায় সৃষ্টি করবেন।

এই চুক্তি সম্পাদনের পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মদীনায় ফিরে এলেন। যখন তিনি মদীনায় পৌঁছলেন তখন আবু বসীর নামক মক্কার এক নওজোয়ান তাঁর পিছনে দৌড়াতে দৌড়াতে মদীনায় এসে পৌঁছলো। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর চুক্তি মোতাবেক তাকেও ফেরৎ যেতে বাধ্য করলেন। কিন্তু রাস্তার মধ্যে তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া লোকদের সঙ্গে তার লড়াই হয় এবং সে তাদের একজনকে হত্যা করে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। মক্কাবাসীরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে এসে তার সম্পর্কে অভিযোগ পেশ করলো। তিনি (সাঃ) বল্লেন, আমি তো তোমাদের লোক তোমাদের কাছে ফেরৎ দিয়ে দিয়েছি। আমরা তো এই দায়িত্ব নেই নি যে, সে যেখানেই যাবে সেখান থেকেই তাকে ধরে এনে পুনরায় তোমাদের হাতে তুলে দিতে হবে।' এর কিছু দিন পরে, একজন স্ত্রীলোক পালিয়ে এসে মদিনায় পৌঁছলো। তার আত্মীয় স্বজনরা মদীনায় এসে তাকে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবী জানাল। কিন্তু রসূলে করীম (সাঃ) তাদেরকে বললেন, 'চুক্তির মধ্যে পুরুষদের শর্ত আছে নারীদের শর্ত নেই। কাজেই, আমরা কোন নারীকে ফেরৎ পাঠাতে বাধ্য নই।'

রাজা-বাদশাহ্দের নামে পত্র প্রেরণ

মদীনায় ফিরে আসার পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, তিনি এখন তার তবলীগকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দেবেন। তিনি যখন তার সাহাবীগণের (রাঃ) কাছে তাঁর এই সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ করলেন, তখন কোন কোন সাহাবী যাঁরা বাদশাহী দরবারের রীতিনীতি সম্পর্কে ওয়াকেবহাল ছিলেন, তারা বললেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্! (সাঃ) রাজা বাদশাহ্রা মোহর ছাড়া চিঠিপত্র

গ্রহণ করেন না। তাই তিনি (সাঃ) একটি মোহর তৈরী করালেন, যার মধ্যে তিনি খোদাই করে লিখালেন, 'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্' এবং আল্লাহ্তায়ালার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা ও আদবের খেয়াল রেখে তিনি সব চেয়ে উপরে লিখালেন 'আল্লাহ্' তার নীচে 'রসূল' এবং তারও নীচে 'মুহাম্মদ'।

৬২৮ খৃষ্টাব্দে, মহরম মাসে, রসূলে করীম (সাঃ)-এর পত্র নিয়ে বিভিন্ন সাহাবী বিভিন্ন দেশে রওয়ানা হয়ে গেলেন। এর মধ্যে একটি পত্র ছিল রোমান সম্রাট কায়সারের নামে। একটি ছিল পারস্য সম্রাটের নামে। একটি ছিল মিসরের রাজার নামে (মিসর ছিল তখন কায়সারের আশ্রিত রাজ্য)। একটি পত্র ছিল আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাশীর নামে। এবং এছাড়াও, তিনি অন্যান্য আরও অনেক রাজা বাদশাহ্র নামে পত্র প্রেরণ করলেন।

কায়সার-এ-রোম হিরাক্লিয়াস-এর নামে পত্র

কায়সার-এ-রোম-এর নিকটে পত্র নিয়ে গেলেন সাহাবী দেহ্ইয়া কলবী (রাঃ)। আঁ হযরত (সাঃ) কলবীকে নির্দেশ দিলেন, তিনি (রাঃ) যেন প্রথমে বসরার গভর্ণরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ঐ গভর্ণর ছিলেন আরব বংশোদ্ভূত। তাঁর মাধ্যমেই পত্র পৌছাবার নির্দেশ দিলেন তিনি (সাঃ) কলবীকে। যখন কলবী (রাঃ) পত্র নিয়ে বসরার গভর্ণরের নিকটে পৌছলেন, কায়সার তখন সিরিয়া সফর করছিলেন। সুতরাং, বসরার গভর্ণর দেহ্ইয়া কলবীকে (রাঃ) সম্রাটের দরবারে পাঠালেন। দেহ্ইয়া (রাঃ) যখন গভর্ণরের মাধ্যমে কায়সারের দরবারে উপস্থিত হলেন, তখন তাঁকে দরবারের কর্মকর্তারা জানালো যে, কায়সারের সম্মুখে হাজির হলে সাক্ষাৎপ্রার্থী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য এটা বাধ্যকর যে, সে কায়সারকে সিজদা করবে। কিন্তু, দেহ্ইয়া (রাঃ) সিজদা করতে অস্বীকার করলেন, এবং বল্লেন, 'আমরা মুসলমান, আমরা কোন মানুষকে সিজদা করি না'। সুতরাং সিজদা না করেই তিনি (রাঃ) কায়সারের সামনে উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে আঁ হযরত (সাঃ)-এর পত্র দিলেন। সম্রাট অনুবাদকারীর দ্বারা পত্র পাঠ করালেন এবং হুকুম দিলেন, 'কোন আরব কাফেলা এসে থাকলে তাদেরকে দরবারে হাজির কর, যাতে আমি তাদের কাছ থেকে ঐ ব্যক্তির অবস্থা জানতে পারি। ঘটনাক্রমে আবু সুফিয়ান সেই সময় একটি বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে সিরিয়ায় গিয়েছিলেন। দরবারের কর্মকর্তারা আবু সুফিয়ানকে সম্রাটের সামনে হাজির করলেন। সম্রাট হুকুম দিলেন যে, আবু সুফিয়ানকে সকলের অগ্রভাগে খাড়া করা হোক এবং তার সঙ্গীদেরকে তার পিছনে খাড়া করা হোক। এবং তিনি এই নির্দেশও দিলেন যে, আবু সুফিয়ান যদি কোন কথা মিথ্যা বলে, তাহলে তার

সঙ্গীরা যেন তা সঙ্গে সঙ্গেই সংশোধন করে। অতঃপর সম্রাট আবু সুফিয়ানকে প্রশ্ন করা শুরু করলেনঃ-

প্রশ্ন ঃ যে ব্যক্তি নবুওয়তের দাবী করেছে এবং আমার কাছে পত্র পাঠিয়েছে তাকে কি তুমি জান ? তুমি কি বলতে পার তার বংশ কেমন ?

উত্তর ঃ সে একটি সম্ভ্রান্ত বংশের লোক এবং সে আমার আত্মীয়।

প্রশ্ন ঃ আরবে কি ইতোপূর্বে এই রকম দাবী আর কেউ করেছিল ?

উত্তর ঃ না।

প্রশ্ন ঃ তার দাবীর পূর্বে তোমরা কি কখনও তার বিরুদ্ধে মিথ্যাচারিতার কোন অভিযোগে উত্থাপন করেছিলে ?

উত্তর ঃ না।

প্রশ্ন ঃ তার বাপ-দাদাদের মধ্যে কি কেউ রাজা বাদশাহ্ ছিল ?

উত্তর ঃ না।

প্রশ্ন ঃ তার বুদ্ধি-বিবেচনা কেমন, তার বিচার-ক্ষমতা কেমন ?

উত্তর ঃ আমরা তার বুদ্ধি-বিবেচনায় এবং তার বিচার-ক্ষমতায় কখনও কোন ত্রুটি দেখিনি।

প্রশ্ন ঃ তার জামাতে কি বড় বড় ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরা যোগ দেয়, না গরীব-দুঃখীরা ?

উত্তর ঃ গরীব, মিস্‌কীন ও নওজোয়ানরা।

প্রশ্ন ঃ তার জামাত কমছে না বাড়ছে ?

উত্তর ঃ ক্রমাগত বেড়ে চলেছে।

প্রশ্ন ঃ এমন কোন লোক কি আছে যে তার ধর্মকে খারাপ জেনে তা পরিত্যাগ করেছে ?

উত্তর ঃ না।

প্রশ্ন ঃ সে কি কখনও অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে ?

উত্তর ঃ আজও পর্যন্ত করেনি। তবে, আমরা তার সাথে একটা চুক্তি করেছি এখন দেখা যাক সে কি করে।

প্রশ্ন ঃ তার সঙ্গে তোমাদের কি কখনও যুদ্ধ হয়েছে ?

উত্তর ঃ হাঁ।

প্রশ্ন ঃ ঐ সব যুদ্ধের ফলাফল কি ?

উত্তর ঃ চাকার উপরে ডোলের মত। কখনো ডোল আমাদের হাতে এসেছে, আবার কখনো তার হাতে যেমন, বলা যায় বদরের যুদ্ধের কথা। ঐ যুদ্ধে আমি ছিলাম না, কাজেই সে জয়লাভ করেছিল । দ্বিতীয় বারে যুদ্ধ হয়েছে ওহোদে। এই যুদ্ধে কমান্ডার ছিলাম আমি, আমরা তাদের পেট কেটেছি, তাদের কান কেটেছি, তাদের নাক কেটেছি।

প্রশ্ন ঃ সে তোমাদেরকে কি করতে বলে ?

উত্তর ঃ সে বলে যে, আল্লাহ্‌র এবাদত কর এবং কাউকেই তাঁর অংশীদার করো না এবং আমাদের বাপ-দাদারা যে সকল মূর্তির পূজা করত সে তাদের পূজা করতে নিষেধ করে। আমাদেরকে এই হুকুম দেয় যে, আমরা যেন আল্লাহ্‌র এবাদত করি, সত্যকথা বলি। ঘৃণ্য ফাহেশা কাজকর্ম ও দুর্নীতি ইত্যাদি থেকে যেন মুক্ত থাকি। তাছাড়া সে এও বলে যে, আমরা যেন পরস্পরের প্রতি সৎ ব্যবহার করি, প্রতিজ্ঞা বা চুক্তি ভঙ্গ না করি, এবং আমানত রক্ষা করি।*

রোমান সম্রাট কায়সারের সিদ্ধান্তঃ

মুহাম্মদ (সাঃ) সত্য নবী

অতঃপর কায়সার বললেন,

শোন ! আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, তার বংশ কেমন! তার উত্তরে তুমি বলেছিলে যে, সে বংশের দিক থেকে উত্তম। এবং নবীরা সব সময় এমনই হয়ে থাকেন। আমি আবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, তার পূর্বে অন্য কেউ অনুরূপ দাবী করেছিল কি না। উত্তরে তুমি বলেছিলে যে, না। এই প্রশ্ন আমি এজন্যই করেছিলাম যে, যদি কেউ এরূপ কোন দাবী করে থাকতো তাহলে আমি মনে করতাম যে, সে তারই অনুকরণ করছে। আবার আমি প্রশ্ন করেছিলাম যে, দাবী করার পূর্বে তার প্রতি মিথ্যার কোন অভিযোগ উঠেছিল কি না। তুমি

---

* *বুখারী : মুজতাবায়ী ছাপাখানা, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪ বাব কায়ফা কানা বা'দাল ওহী*

বলেছিলে, না। এতে আমি বুঝতে পারলাম যে, যে ব্যক্তি মানুষের সম্বন্ধে মিথ্যা বলে না, সে খোদাতায়ালার সম্পর্কে মিথ্যা বলতে পারে না। আমি আবার তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, তার বাপ-দাদাদের মধ্যে কেউ রাজা বাদশাহ্ ছিল কি না। তুমি বলেছিলে, না। এথেকে আমি বুঝলাম যে, সে তার দাবী এই উদ্দেশ্যে করেনি যে, সে কোন বাহানা বা ভাওতাবাজি করে তার বাপ-দাদার রাজ্য পুনরুদ্ধার করতে চাচ্ছে। আমি আবার তোমাকে প্রশ্ন করেছিলাম যে, বিত্তশালী ও ক্ষমতাবান লোকেরা তার জামাতে যোগ দেয় নাকি গরীব-দুঃখীরা। তুমি বলেছিলে, দুর্বল ও গরীব-দুঃখীরা। এথেকে আমি বুঝতে পারলাম যে, প্রত্যেক নবীর জামাতে বিশেষ করে গরীব মিসকীনরাই যোগ দেয়, বিত্তবান ও ক্ষমতাবানরা নয়। আমি তোমার কাছে জানতে চেয়েছিলাম যে, তার জামাত বাড়ছে না কমছে। তুমি বলেছিল, বাড়ছে, এবং এটাই হচ্ছে নবীদের জামাতের লক্ষণ, যা কিনা বৃদ্ধি পেতেই থাকে, তাদের চুড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত। আবার আমি জানতে চেয়েছিলাম যে, কোন ব্যক্তি তার ধর্মকে মন্দ জেনে তা পরিত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে গেছে কি না। তুমি বলেছিলে, না এবং এটাই হচ্ছে নবীদের জামাতের বৈশিষ্ট্য। কেউ তাঁদের জামাত অন্য কোন কারণে ত্যাগ করলেও এই কারণে ত্যাগ করে না যে, তার ধর্ম খারাপ। আমি আবার তোমাকে প্রশ্ন করেছিলাম যে, তোমাদের মধ্যে কোন যুদ্ধ হয়েছিল কি না, হলে তার ফলাফল কি হয়েছিল। উত্তরে তুমি বলেছিলে, হাঁ হয়েছিল, কখনও সে জিতেছে, কখনও তোমরা জিতেছ। এবং নবীদের ক্ষেত্রে এমনটিই হয়ে থাকে। প্রথমে প্রথমে তাদের জামাতের উপরে নানা বিপদ মুসিবত আসতে থাকে। কিন্তু পরিণামে তাঁদেরই বিজয় হয়। পুনরায় আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সে তোমাদের কি শিক্ষা দেয়। তুমি জবাবে বলেছিলে, সে নামায পড়তে বা এক খোদার এবাদত করতে, সত্যকথা বলতে শিক্ষা দেয়, পবিত্র জীবনযাপনের শিক্ষা দেয়, এবং চুক্তি ও অঙ্গীকার পালনের এবং আমানতদার হওয়ার শিক্ষা দেয়। একইভাবে আমি তোমাকে এও জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, সে কোন ধোকাবাজি করে কিনা। তুমি বলেছিলে, না। এবং এটাই তো হচ্ছে সৎলোকদের পথ ও পদ্ধতি। কাজেই, আমি বুঝতে পারছি যে, সে তার নবুওয়তের দাবীতে সত্য এবং আমার নিজেরও এই বিশ্বাস ছিল যে, এই যামানায় 'সেই নবী' আগমন করবেন কিন্তু আমার এ ধারণা ছিল না যে, তিনি আরবদের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করবেন এবং যেসব উত্তর তুমি আমাকে দিয়েছ, তা যদি সব সত্য হয়ে থাকে, তাহলে আমি বলে দিতে পারি যে, এই সব রাজ্য নিশ্চয় তাঁর অধিকারে চলে যাবে (বুখারী)। কায়সারের এই সকল কথা বার্তায় দরবারের লোকদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হল। তারা বললো, 'আপনি একজন খৃষ্টান হওয়া সত্ত্বেও,

একজন অপর জাতির লোকের সত্যতার ঘোষণা দিচ্ছেন!' এবং দরবারের মধ্যে প্রতিবাদের জোর আওয়াজ উঠতে থাকলো। এতে দরবারের কর্মকর্তারা তড়িঘড়ি করে আবু সুফিয়ান ও তার সঙ্গীদেরকে দরবার থেকে বের করে দিল।

হিরাক্লিয়াসের নামে প্রেরিত আঁ হযরত (সাঃ)-এর উক্ত পত্রটি ছিল এই ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم - من محمد عبد الله ورسوله
الى هرقل عظيم الروم - سلام على من اتبع الهدى
اما بعد فانى ادعوك بدعاية الاسلام اسلم تسلم
يوتك الله اجرك مرتين فان توليت فان عليك اثم
اليريسيين يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء
بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به
شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله
فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون

*

অর্থাৎ এই পত্র আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রসূল মুহাম্মদ-এর পক্ষ থেকে রোমানদের প্রধান হিরাক্লিয়াসের নিকটে লিখিত হলো। যে ব্যক্তি খোদাতায়ালার হেদায়াত অনুসরণ করে তার উপরে খোদাতায়ালার সালাম বর্ষিত হোক, অতঃপর,

হে বাদশাহ্! আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি (অর্থাৎ দাওয়াত দিচ্ছি, এক খোদা ও তাঁর রসূল মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপরে ঈমান আনার জন্য)।

হে সম্রাট মুসলমান হয়ে যান তাহলে খোদা আপনাকে সকল প্রকারের ফেৎনা থেকে বাঁচাবেন এবং আপনাকে ডবল পুরস্কার দিবেন (অর্থাৎ ঈসা-আঃ-এর উপরে ঈমান আনার জন্য পুরস্কার দিবেন এবং মুহাম্মদ-সাঃ-এর উপরে ঈমান আনার জন্যেও পুরস্কার দিবেন)। কিন্তু আপনি যদি এই কথা মানতে অস্বীকার করেন, তাহলে কেবল আপনার নিজের পাপটি আপনার উপরে বর্তাবে না, বরং আপনার প্রজাদের

---

* *বুখারী : বাবু কায়ফা কানা বা'দাল ওহী, যুরকানী ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৩৬*

ঈমান না আনার পাপও আপনার উপর বর্তাবে। পত্রের শেষে কোরআন শরীফের আয়াত উদ্ধৃত ছিল। যার অর্থ হলোঃ

'হে আহ্‌লে কিতাব! এসো এই কথার উপরে আমরা একত্র হয়ে যাই, যা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে অভিন্ন অর্থাৎ আমরা সবাই খোদাতায়ালা ছাড়া অন্য কারো এবাদত করবো না। এবং কোন কিছুকেই তাঁর সঙ্গে শরীক করবো না। এবং আল্লাহ্ ছাড়া আমরা কোন মানুষকেই এত বেশী মর্যাদা দিব না যাতে তাঁকে খোদায়ী গুণের পূর্ব অধিকারী বলে মনে হবে। আহ্‌লে কিতাব যদি ঐক্যের এই দাওয়াত গ্রহণ না করে, তাহলে, হে মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্ ও তাঁর সাহাবীরা! তোমরা ওদেরকে বলে দাও যে, আমরা আল্লাহ্‌র নিকটে আত্মসমর্পণকারী।

কোন কোন ইতিহাসে লিখা আছে যে, যখন এই পত্রখানি সম্রাটের সামনে পেশ করা হয়েছিল, তখন দরবারের ব্যক্তিদের মধ্য থেকে কেউ কেউ বলেছিলেন যে, এই পত্রটিকে ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া উচিত। কেননা, এতে সম্রাটকে অপদস্থ করা হয়েছে, এবং প্রত্রের উপরে রোমান সম্রাট লেখা হয়নি। বরং লেখা হয়েছে 'সাহেব-এ-রোম'-রোমের অভিভাবক। কিন্তু বাদশাহ্ বলেছিলেন, এটা নির্বুদ্ধিতার কথা যে, পত্র পাঠ করার পূর্বেই তা ছিঁড়ে ফেলতে হবে। এবং আমাকে যে লেখা হয়েছে রোমের অভিভাবক, তা ঠিকই আছে। আসল মালিক তো আল্লাহ্। আমি তো মাত্র অভিভাবকই। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন এই ঘটনার কথা জানতে পারলেন, তখন তিনি বললেন যে, রোমান সম্রাট যে পন্থা অবলম্বন করেছেন, সে জন্য তার রাজত্ব বেঁচে যাবে। এবং তার সন্তানরা বহুদিন যাবৎ রাজত্ব চালিয়ে যাবে। বস্তুতঃ হয়েছিলও তা-ই। পরবর্তী কালের যুদ্ধ-বিগ্রহে যদিও অনেক দেশ রসূলে করীম (সাঃ) এবং একের পর এক ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী রোমান সম্রাটের হাত ছাড়া হয়ে গিয়েছিল, তবু উক্ত ঘটনার পর ছয় শত বৎসর পর্যন্ত তার বংশধরগণ কন্‌স্টান্টিনোপলের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। রোমান শাসনামলে বহুকাল ধরে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পত্রটি সংরক্ষিত ছিল। বাদশাহ্ মনসুর কালাউনের কোনও কোনও রাষ্ট্রদূত রোমান সম্রাটের দরবারে গিয়েছিল। একবার সম্রাট তাদের একজনকে দেখানোর জন্য একটি সিন্দুক চেয়ে পাঠালেন। এবং বল্‌লেন আমার এক দাদার নামে তোমাদের রসূলের একখানি পত্র এসেছিলে যা এই সিন্দুকের মধ্যে আজও পর্যন্ত আমাদের নিকটে সংরক্ষিত রয়েছে।

পারস্য সম্রাটের নামে পত্র

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম পারস্য সম্রাটের নামে নিম্নলিখিত পত্রখানি পাঠিয়েছিলেন আব্দুল্লাহ্ বিন হোযাফার (রাঃ) মারফতে ঃ

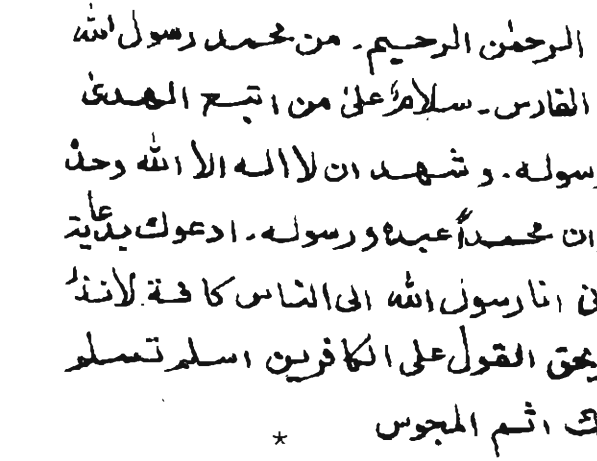
بسم الله الرحمٰن الرحيم. من محمد رسول الله
الى كسرىٰ عظيم الفارس. سلامٌ على من اتبع الهدىٰ
وآمن بالله ورسوله. و شهد ان لا اله الا الله وحدهُ
لا شريك له. وان محمداً عبده و رسوله. ادعوك بدعاية
الله عزوجل فانى انا رسول الله الى الناس كافة لانذر
من كان حيّاً ويحق القول على الكافرين اسلم تسلم
فان ابيت فعليك اثم المجوس *

অর্থাৎ- আল্লাহ্র নামে শুরু করছি যিনি অযাচিত-অসীম দাতা ও বারবার রহমকারী। এই পত্র লিখছেন মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ পারস্য সম্রাট খস্রুর নিকটে। যে ব্যক্তি পূর্ণ হেদায়াতের অনুসরণ করে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের উপরে ঈমান আনে, এবং সাক্ষ্যদান করে যে, আল্লাহ এক, তার কোন শরীক নেই, এবং মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রসূল, তার উপরে শান্তি বর্ষিত হোক। হে বাদশাহ্। আমি আপনাকে আল্লাহ্র আদেশে ইসলামের প্রতি আহ্বান করছি। কেননা, আমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রসূল করে পাঠানো হয়েছে, যেন আমি প্রত্যেক জীবিত মানুষকে সতর্ক করি এবং অবিশ্বাসীদের কাছে দলীল প্রমাণ সম্পূর্ণরূপে তুলে ধরি। আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন, যাতে আপনি প্রত্যেক ফেৎনা থেকে রক্ষা পান। যদি আপনি এই আহ্বান অস্বীকার করেন, তাহলে সকল মাজুসীর (যারা আপনার প্রজা) পাপ আপনার মাথার উপরে বর্তিবে।

আব্দুল্লাহ্ বিন হোযাফা বলেছেন, আমি খসরুর দরবারে পৌঁছে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলাম। আমাকে অনুমতি দেওয়া হলো। যখন আমি এগিয়ে গিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পত্র খানি খসরুর হাতে দিলাম তখন সে অনুবাদকারীকে তা পড়ে শোনাতে বললো। অনুবাদকারী যখন পত্র পাঠ করে শোনাল, তখন খসরু রাগান্বিত হয়ে পত্রখানি ছিঁড়ে ফেলে দিল। আব্দুল্লাহ্ বিন

---

* *যুরকানী ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৪০ ও তারিখুল খামিস : ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৮*

হোযাফা ফিরে এসে যখন এই খবর রসূলুল্লাহ্‌কে (সাঃ) দিলেন, তখন তিনি (সাঃ) বল্‌লেন, 'খস্‌রু আমাদের পত্রের প্রতি যে আচরণ করেছে আল্লাহ্‌তায়ালা তার বাদশাহীর প্রতিও তেমনি আচরণ করবেন'। খসরুর ঔদ্ধত্যের কারণ এই ছিল যে, যে ইহুদীরা রোমান সাম্রাজ্য থেকে পালিয়ে গিয়ে পারস্য সাম্রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল, এবং রোমান সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থেকে ইরানী দরবারে প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিল, তাদের মাধ্যমেই আরবের ইহুদীরা খসরুকে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলেছিল। তারা যে সব অভিযোগ করতো এই পত্র পেয়ে খসরু সেগুলোকে সঠিক বলে ধরে নিলো। এবং সে মনে করলো যে, এই ব্যক্তি আমার রাজ্যের উপরে কুদৃষ্টি ফেলেছে। সুতরাং খসরু সঙ্গে সঙ্গেই ইয়েমেনের গভর্ণরের কাছে এক পত্র প্রেরণ করলো যাতে বলা হলোঃ

> কোরেশদের একব্যক্তি নবুওয়তের দাবী করেছে, এবং সে তার দাবীতে খুব বাড়াবাড়ি শুরু করেছে। তুমি অবিলম্বে তার কাছে দু'জন লোক পাঠাও তারা তাকে গ্রেফতার করে এনে আমার সামনে হাযির করবে। ঐ সময়ে খসরুর অধীনস্থ ইয়েমেনের গভর্ণর ছিল বাযান। সে একজন সামরিক অফিসারকে একজন আরোহী সঙ্গী সহ রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর কাছে পাঠিয়ে দিল। সে তার নিজের তরফ থেকেও একটি পত্রে আঁ হযরত (সাঃ)-এর কাছে বলে পাঠালো যে, তিনি (সাঃ) যেন এই পত্র পাওয়া মাত্র প্রেরিত লোক দু'জনের সঙ্গে যথাশীঘ্র খসরুর দরবারে গিয়ে হাযির হন। সেই সামরিক অফিসার মক্কা অভিমুখে যাত্রা করলো, কিন্তু তায়েফের নিকটে পৌঁছে সে জানতে পারলো যে, তিনি (সাঃ) মদীনায় থাকেন। সুতরাং সে মদীনায় গেল। সেখানে পৌঁছে সে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-কে বললো, খসরু ইয়েমেনের গভর্ণর বাযানকে হুকুম দিয়েছেন, আপনাকে গ্রেফতার করে নিয়ে তাঁর সম্মুখে হাযির করতে। আপনি যদি এই হুকুম অমান্য করেন, তাহলে সে আপনাকেও ধ্বংস করে দিবে, আপনার জাতিকেও ধ্বংস করে দিবে। এবং আপনার দেশকে বিরান করে ছাড়বে। কাজেই, আপনি আমাদের সাথে চলুন।'

তার এই কথা শুনে রসূলে করীম (সাঃ) বল্‌লেন,

'আচ্ছা, আগামীকাল তোমরা আমার সাথে আবার দেখা করো।' রাত্রিতে তিনি (সাঃ) আল্লাহ্‌তায়ালার কাছে প্রার্থনা করলেন, এবং আল্লাহ্‌ জুল্‌ জালাল তাঁকে জানালেন যে, 'খসরুর অপরাধের কারণে আমি তার বিরুদ্ধে তার পুত্রকে খাড়া করে দিয়েছি। সেই পুত্র তাকে ১০ই জমাদিউল উলা, সোমবারে হত্যা করবে।' কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, আঁ হযরত (সাঃ) বলেছেন, আজ রাতেই

সে তার পিতাকে হত্যা করবে। হতে পারে ঐ রাতই ছিল জমাদিউল উলার ১০ই রাত। সকাল বেলা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) লোক দু'জনকে ডেকে পাঠালেন এবং তাদেরকে এই ভবিষ্যদ্বাণীর কথা জানালেন। অতঃপর, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বাযানের নামে একখানি পত্র লিখে পাঠালেন। তাতে তিনি বললেন, 'আল্লাহ্ আমাকে খবর দিয়েছে যে, কিসরাকে অমুক সালের অমুক তারিখে নিহত করা হবে।' পত্রখানি যখন ইয়েমেনের গভর্ণরের কাছে পৌঁছল, তখন সে বললো, 'এই ব্যক্তি যদি সত্যনবী হয়, তাহলে এই ঘটনা ঘটে যাবে। অন্যথায়, তার এবং তার দেশের মঙ্গল নেই।' দিন কয়েক পরেই ইরানের একটি জাহাজ ইয়েমেনের বন্দরে এসে ভিড়লো। এই জাহাজে নিয়ে আসা ইরানের বাদশাহর একটি পত্র ইয়েমেনের গভর্ণরকে দেওয়া হলো। পত্রটির সীলমোহর দেখেই ইয়েমেনের গভর্ণর বললো, 'মদীনার নবী সত্য বলেছেন। ইরানের বাদশাহী বদলে গেছে। কেননা, এই পত্রে অন্য এক বাদশাহ্র মোহর মারা হয়েছে'। সে পত্রটি খুললো এবং দেখতে পেলো তাতে লেখা আছে, 'ইয়েমেনের গভর্ণর বাযানের নিকটে লিখিত খসরু সিরোসের পত্র। আমি আমার পিতা সাবেক খসরুকে হত্যা করেছি, কারণ সে দেশে রক্তপাতের রাস্তা খুলে দিয়েছিল। দেশের সম্ভ্রান্ত লোকদেরকে হত্যা করছিল। এবং প্রজাদের উপরে জুলুম চালাচ্ছিল। আমার এই পত্র তোমার কাছে পৌঁছা মাত্র তুমি সকল অফিসারকে আমার আনুগত্যের শপথ করাবে। এবং ইতোপূর্বে, আমার পিতা আরবের এক নবীর বিরুদ্ধে যে গ্রেফতারী পরওয়ানা প্রেরণ করেছিল, তা বাতিল বলে গণ্য করবে।' *

এই পত্র পাঠকরে বাযান এতবেশী প্রভাবিত হয়ে পড়লো যে, সে এবং তার কিছু সংখ্যক সঙ্গী তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করলো। এবং সে এই খবর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামের কাছে পাঠিয়ে দিলো।

আবিসিনিয়ার বাদশাহ্ নাজ্জাশীর নামে পত্র

হযরত রসূলে পাক (সাঃ) তৃতীয় পত্র প্রেরণ করেছিলেন আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশীর নামে। এই পত্রটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

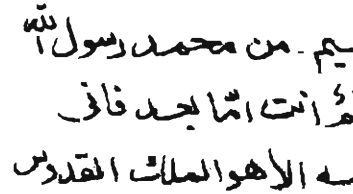

* *তাবাকী : ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫৭২ - ১৫৭৪, সীরাতুন নবী : ইবনে হিশাম;*

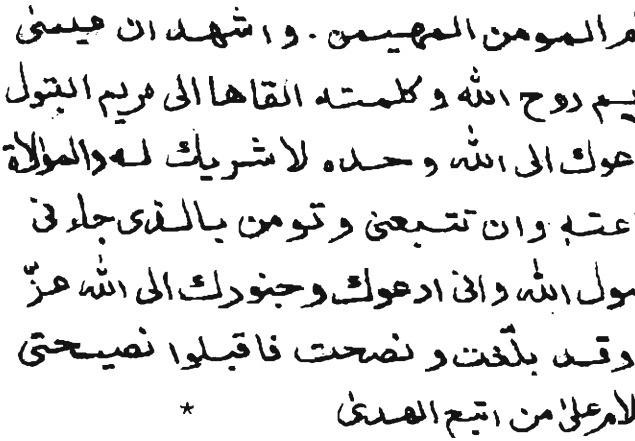

السلام المومن المهيمن . و اشهد ان عيسى
ابن مريم روح الله و كلمته القاها الى مريم البتول
واني ادعوك الى الله وحده لاشريك له والموالاة
على طاعته وان تتبعني و تومن بالذي جاءني
فاني رسول الله واني ادعوك وجنودك الى الله عز
وجل وقد بلغت و نصحت فاقبلوا نصيحتي
والسلام على من اتبع الهدى *

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি যিনি অযাচিত-অসীম দাতা এবং বারবার রহমকারী। মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্‌ এই পত্র লিখে পাঠাচ্ছেন আবিসিনিয়ার বাদশা নাজ্জাশীর নিকটে। হে বাদশাহ! আপনার উপর আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হয়ে চলেছে। (কেননা, এই হচ্ছে সেই বাদশাহ যিনি মুসলমানদেরকে আশ্রয় দান করেছিলেন। সেই জন্য তিনি (সাঃ) তাঁদের খবর দিয়েছিলেন যে, আপনার এই কাজ খোদার কাছে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়েছে এবং আপনি খোদার হেফাযতের মধ্যে আছেন।) আমি সেই আল্লাহ্‌র প্রশংসা আপনার কাছে বর্ণনা করছি যিনি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই। যিনি সকল বাদশাহের বাদশাহ্‌। যিনি সকল পবিত্র গুণাবলীর অধিকারী। যিনি সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত। যিনি সকল প্রকার ক্ষতি হতে রক্ষাকারী ও পরিত্রাণকারী। যিনি তাঁর বান্দাদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তা দানকারী এবং যিনি তাঁর সৃষ্টিকে রক্ষাকারী। আমি সাক্ষ্য দান করছি যে, ঈসা ইব্‌নে মরিয়ম ছিলেন পৃথিবীতে আল্লাহ্‌তায়ালার বাণী প্রচারকারী এবং আল্লাহ্‌তায়ালার সেই সকল ওয়াদা পূর্ণকারী যা আল্লাহ্‌তায়ালা করেছিলেন মরিয়ম (আঃ)-এর সঙ্গে, যিনি প্রথম থেকেই নিজের জীবন ওয়াক্‌ফ্‌ করেছিলেন আল্লাহ্‌র জন্য আমি আপনাকে আহ্বান জানাচ্ছি, এক ও অদ্বিতীয় খোদার সঙ্গে সম্বন্ধ সৃষ্টি করার জন্য এবং তাঁর আনুগত্যের সুদৃঢ় অঙ্গীকার করার জন্য। এবং আপনাকে আমি এই আহ্বানও জানাচ্ছি যে, আপনি আমার আনুগত্য করুন এবং সেই খোদার উপরে ঈমান আনুন যিনি আমাকে প্রকাশিত করে দিয়েছেন। কেননা, আমি তাঁর রসূল এবং আমি আপনাকেও আহ্বান জানাচ্ছি এবং আপনার সৈন্যবাহিনীকেও আহ্বান জানাচ্ছি সর্বশক্তিমান

* *যুরকানী : ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪২, আস্‌ সিরাতুল হালবিয়া : ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭৩*

খোদাতায়ালার মনোনীত ধর্মে শামিল হওয়ার জন্য। আমি আমার দায়িত্ব পালন করলাম। আল্লাহ্‌র পয়গাম আপনার কাছে পৌঁছে দিলাম। এবং আন্তরিকতার সঙ্গে আপনার নিকটে সত্য প্রকাশ করলাম। অতএব, আমার আন্তরিকতার মর্যাদা রাখুন। প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যে খোদাতায়ালার হেদায়াতের আনুগত্য করে তার উপরে খোদাতায়ালার শান্তি বর্ষিত হয়।'

এই পত্র যখন নাজ্জাশীর হাতে পৌঁছল তখন তিনি খুব আদবের সঙ্গে পত্রখানিতে তাঁর চোখ বুলালেন, এবং সিংহাসন থেকে নেমে নীচে এসে দাঁড়ালেন এবং বল্‌লেন, 'হাতীর দাঁতের একটি বাক্স আন।' তাঁর নির্দেশ মত একটি বাক্স আনা হলো। তিনি তখন পত্রখানি আদবের সঙ্গে সেই বাক্সের মধ্যে রেখে দিলেন এবং বল্‌লেন, যতদিন এই পত্রখানি সুরক্ষিত থাকবে আবিসিনিয়ার রাজত্ব ততদিন সুরক্ষিত থাকবে। বস্তুতঃ, নাজ্জাশীর এই কথা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। এক হাজার বছর পর্যন্ত ইসলাম সারা পৃথিবীতে সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় উত্থিত হয়ে বিস্তারিত হয়ে চলেছিল। আবিসিনিয়ার ডান দিক দিয়ে ইসলামী সেনাবাহিনী ছুটে গেছে, আবিসিনিয়ার বাম দিক দিয়ে ইসলামী সেনাবাহিনী ছুটে গেছে, কিন্তু যে উপকার আবিসিনিয়ার বাদশাহ্ প্রাথমিক যুগের ইসলামী মুহাজেরদের প্রতি করেছিলেন, সেই উপকারের জন্য এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পত্রের প্রতি যে সম্মান নাজ্জাশী প্রদর্শন করেছিলেন সে সম্মানের জন্যেও, ইসলামী সেনাবাহিনী আবিসিনিয়ার উপরে দৃষ্টি ফেলেও তাদের দৃষ্টি ফেরায়ে নিয়েছে। রোমান সম্রাটের সাম্রাজ্য খণ্ড বিখণ্ড হয়ে গেছে। খসরুর সুবিশাল সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হয়ে গেছে। চীন ও হিন্দুস্থানের শাহান শাহী ওলট-পালট হয়ে গেছে, কিন্তু আবিসিনিয়ার বাদশাহ্‌র সেই রাজ্য সুরক্ষিত রাখা হয়েছে। এবং তা রাখা হয়েছে এজন্যই যে, তিনি মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রথম সাহাবীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করেছিলেন এবং মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পত্রের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন। এতো ছিল সেই প্রতিদান যা দিয়েছিল মুসলমানরা আবিসিনিয়ার অধিবাসীদেরকে তাদের এক উপকারের বিনিময়ে। কিন্তু, খৃষ্টান জাতিগুলো যারা এক গালে থাপ্পড় খেলে আর এক গাল পেতে দেওয়ার নীতি প্রচার করে থাকে, তারা তাদের স্বধর্মী সেই আবিসিনিয়ার বাদশাহ্ এবং তাঁর জাতির প্রতি যে ব্যবহার করেছিল সে সময়, তাও দুনিয়াবাসীর অজানা নেই। এটাও তো পৃথিবীর অজানা নেই যে, কীভাবে আবিসিনিয়ার শহরগুলোকে তারা বোমা বর্ষণ করে উড়িয়ে দিয়েছিল। স্বয়ং বাদশাহ্‌কে, তাঁর সম্মানিতা সম্রাজ্ঞীকে এবং তাঁদের সন্তানদেরকে নিজেদের দেশ ছেড়ে গিয়ে অপর দেশের আশ্রয়ে কত বছর ধরে থাকতে বাধ্য করেছিল। আবিসিনিয়ার প্রতি এই প্রকারের আচরণ থেকে একজন মুসলমান ও একজন খৃষ্টানের মধ্যকার সেই পবিত্রকরণ শক্তির

পার্থক্য কি ফুটে ওঠে না, যা মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছ থেকে লাভ করা যায়, এবং যা আজও পর্যন্ত, ধর্ম থেকে বহুদূরে সরে যাওয়া সত্ত্বেও, মুসলমানদের ধ্যান-ধারণাকে আকৃষ্ট করে চলেছে পুণ্যের প্রতি, কল্যাণকামিতার প্রতি ?

মিসরের শাসনকর্তা মুকাউকিসের নামে পত্র

আঁ হযরত (সাঃ) তাঁর চতুর্থ পত্র প্রেরণ করেন মিশরের রাজা মুকাউকিসের নামে। এই পত্র নিয়ে যান হাতেব ইবনে আবি বালতায়া (রাঃ)। এই পত্রে লেখা হয়েছিলঃ

بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله
الى المقوقس عظيم القبط سلام على من اتبع الهدى
اما بعد فانى ادعوك بدعاية الاسلام اسلم تسلم
يؤتك الله اجرك مرتين فان توليت فانما عليك اثم
القبط ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا و
بينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ
بعضنا بعضا ارباباً من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا
بانا مسلمون

*

এই পত্রের বিষয়বস্তু ছিল রোমান সম্রাটের নিকটে লিখিত পত্রের অনুরূপ পার্থক্য শুধু এতটুকুই ছিল যে, এতে লেখা হয়েছিল, আপনি যদি অমান্য করেন, তাহলে রোমান প্রজন্মের পাপের বোঝা আপনাকেই বহন করতে হবে। এবং সেই সঙ্গে,কিব্‌তি খৃষ্টানদেরও পাপের বোঝা আপনার উপরেই বর্তিবে। হাতেব (রাঃ) যখন মিশরে পৌছালেন, তখন মুকাউকিস রাজধানীতে ছিলেন না। তিনি গিয়েছিলেন আলেকজান্দ্রিয়ায়। হাতেব (রাঃ) আলেকজান্দ্রিয়ায় গেলেন। রাজা সেখানে সমুদ্রের উপরে একটি জাহাজে তাঁর দরবার বসিয়েছিলেন। হাতেব একটি নৌকোয় করে তাঁর জাহাজের কাছাকাছি পৌছলেন। কিন্তু সেখানে যেহেতু আশেপাশে পাহারা দেওয়া হচ্ছিল, সেহেতু তিনি (রাঃ) দূরে থেকেই পত্রটি দেখালেন এবং জোরে আওয়াজ দিতে লাগলেন। রাজা আদেশ দিলেন যে, ঐ ব্যক্তিকে আনা হউক। এবং তাকে তাঁর সামনে হাযির করা হোক। রাজা

---

* *যুরকানী : ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৪৭ ও সিরাতুল হালবিয়া : ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ২৭৫*

পত্রখানি পাঠ করলেন এবং হাতেব (রাঃ)-কে বললেন, 'এই ব্যক্তি যদি সত্য নবী হয়, তাহলে সে কেন নিজের দুশমনদের বিরুদ্ধে দোয়া করে না?' হাতেব (রাঃ) বললেন, 'আপনি তো ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ)-এর উপরে ঈমান রাখেন, অথচ এ কেমন কথা বলছেন? ঈসাকে তো তাঁর জাতি দুঃখ দিয়েছিল, কিন্তু ঈসা তো এইরূপ দোয়া করেন নি যে, তারা ধ্বংস হয়ে যাক।' একই কথা শুনে রাজা বললেন, তুমি একজন জ্ঞানী মানুষের পক্ষ থেকে একজন জ্ঞানী দূত। এবং তুমি খুব সুন্দর উত্তর দিয়েছ।' তখন হাতেব বললেন, 'হে বাদশাহ্! আপনার পূর্বে এক বাদশাহ্ ছিল। সে বলতো, 'আমিই বড় প্রভু' অর্থাৎ আমি ফেরাউনের কথা বলতে চাচ্ছি। অবশেষে, খোদাতায়ালা তার উপরে শাস্তি অবতীর্ণ করলেন। কাজেই আপনি অহংকার করবেন না এবং আল্লাহ্র ঐ নবীর উপরে ঈমান আনুন। আমি খোদার কসম খেয়ে বলছি যে, মূসা (আঃ) ঈসা (আঃ) সম্পর্কে তত খবর দেননি, যত খবর ঈসা (আঃ) দিয়ে গেছেন মুহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে এবং আমরা ঠিক সেইভাবেই আপনাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি, যেভাবে আপনারা আহ্বান জানিয়ে যান ইহুদীদেরকে ঈসা (আঃ)-এর প্রতি। এবং প্রত্যেক নবীরই উম্মত থাকে, যে উম্মতের কর্তব্য হচ্ছে তাদের নবীর আনুগত্য করা। কাজেই আপনারা যখন এই নবীর যামানা পেয়ে গেছেন, তখন আপনাদের কর্তব্য হচ্ছে তাঁকে গ্রহণ করা। এবং আমাদের ধর্ম আমাদের মসীহ্ (আঃ)-কে মানতে বাধা দেয় না। বরং আমরা তো অন্যদেরকেও বলি যে, তারা যেন মসীহ (আঃ)-কেও মান্য করে।' তখন মুকাউকিস প্রকাশ্যে বললেন, 'আমি ঐ নবীর কথা শুনেছি, এবং আমি বুঝতে পেরেছি যে, তিনি কোন প্রকার মন্দ কাজের আদেশ দেন না এবং কোন ভাল কাজে বাধা দেন না। আমি এও বুঝেছি যে, ঐ ব্যক্তি কোন যাদুকর বা গণক নন। আমি তাঁর অনেক ভবিষ্যদ্বাণীর কথাও শুনেছি যা পূর্ণ হয়েছে।' অতঃপর, তিনি হাতীর দাঁতের একটি বাক্স আনালেন এবং তার মধ্যে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পত্রখানি রাখলেন, এবং তাতে মোহর মেরে তা একজন দাসীর হাতে দিলেন হেফাযতে রেখে দেয়ার জন্য। তারপর তিনি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর কাছে এই পত্র লিখলেন ঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্র কাছে কিব্তী (মিসরী গোত্র) রাজা মুকাউকিস এই পত্র লিখছে যে, তাঁর উপরে শান্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর আমি বলছি যে, আমি আপনার পত্র পাঠ করেছি। পত্রে আপনি যা কিছু উল্লেখ করেছেন, এবং যে সকল বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন, তার উপরে আমি চিন্তা করেছি। আমি বুঝতে পেরেছি যে, ইসরাঈলী ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ অনুযায়ী এক নবীর আগমন

হওয়া বাকী আছে। কিন্তু, আমার ধারণা ছিল যে, তিনি আবির্ভূত হবেন সিরিয়াতে। আমি আপনার দূতকে খুব সম্মানের সাথে রেখেছি। আমি তাঁকে এক হাজার দীনার এবং পাঁচ জোড়া রাজকীয় পোষাক (খেলা'ত) উপঢৌকনস্বরূপ দিয়েছি এবং আপনার নিকট উপঢৌকনস্বরূপ দু'জন মিশরীয় বালিকা প্রেরণ করছি। কিব্‌তী জাতির নিকটে এই বালিকাদ্বয় অতি সম্মানিত। এদের একজনের নাম মারিয়া এবং অপরজনের নাম সীরীন এবং মিসরী লিনেনের উন্নত শ্রেণীর বিশ জোড়া কাপড় গার্মেন্টিস্ আপনার খেদমতে পাঠিয়ে দিচ্ছি। এবং অনুরূপভাবে, আপনার আরোহণের জন্য একটি খচ্চর পাঠিয়ে দিচ্ছি। পরিশেষে আমি প্রার্থনা করছি যে, আপনার উপর আল্লাহ্‌র শান্তি বর্ষিত হোক।* এই পত্র থেকে বুঝা যায় যে, মুকাউকিস যদিও আঁ হযরত (সাঃ)-এর কাছে লিখিতভাবে সম্মান ও শিষ্টাচার প্রদর্শন করেছিলেন কিন্তু, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন নি।

বাহ্‌রাইনের আমীরের নামে পত্র

রসূলে করীম (সাঃ) তাঁর পঞ্চম পত্র লিখে পাঠান বাহ্‌রাইনের আমীর মুনযের তাইমীর নিকটে। এই পত্র নিয়ে যান আলা ইবনে হাযরামী (রাঃ)। এই পত্রের বিষয়-বস্তু সংরক্ষিত নেই। এই পত্র আমীরের নিকটে পৌঁছিলে তিনি ঈমান আনেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিকট লিখে পাঠান ঃ আমি এবং আমার অনেক সঙ্গী আপনার উপরে ঈমান এনেছি। তবে, অনেকে এমনও আছে যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি। আমাদের দেশে কিছু সংখ্যক ইহুদীও আছে, মাজুসীও আছে। তাদের সম্পর্কে আপনি আমাকে নির্দেশ দান করুন যে, আমি তাদের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করবো। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁকে পত্র লিখে পাঠান, পত্রে বলা হয়েছিল ঃ

> "আমি আনন্দিত যে, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করেছ। যেসব প্রতিনিধি আমার পক্ষ থেকে যাবে, তুমি তাদের নির্দেশ পালন করে চলবে। কেননা, যে তাদের আনুগত্য করবে, সে আমার আনুগত্য করবে। আমার যে দূত তোমার কাছে গিয়েছিল, তোমার বহুত প্রশংসা করেছে। সে প্রকাশ করেছে যে, তুমি ইসলাম কবুল করেছ। আমি আল্লাহ্‌র কাছে তোমার জাতির জন্য দোয়া করেছি। অতএব, তুমি মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী নিয়ম-কানুনের প্রচলন কর। তাদের মাল সামানের হেফাযত কর। কাউকেও চারজনের বেশী স্ত্রী রাখতে দিবে না। মুসলমান হওয়ার পূর্বে তারা যে সমস্ত পাপ করেছিল তা মাফ করা

---

* *যুরকানী : ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪৯-৩৫০, তাবারী : ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫৫৯*

হবে। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি পুণ্যকাজের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকবে, ততক্ষণ তোমাকে শাসন ক্ষমতা থেকে অপসারণ করা হবে না এবং যে সকল ইহুদী ও মাজুসী সেখানে আছে তাদের উপর স্রেফ এক প্রকারের কর ধার্য করা যাবে, তার বেশী কিছু দাবী করা যাবে না।' *

এছাড়াও, আঁ হযরত (সাঃ) অন্য যাদের কাছে পত্র লিখেছিলেন, তাদের মধ্যে ছিলেন ঃ ওমানের রাজা, ইয়ামামার আমীর, গাস্‌সামের রাজা, ইয়েমেনের একটি গোত্র বনু নহদের নেতা, ইয়েমেনের আরও একটি গোত্র হামাদানের নেতা, বনু আলীমের আমীর এবং হাদ্রামী গোত্রের নেতা, প্রমুখ। তাদের প্রায় সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

এই সকল পত্র লেখা থেকে বুঝা যায় যে, আঁ হযরত (সাঃ) কত সুদৃঢ়, কত গভীর ঈমান ও আস্থা রাখতেন আল্লাহ্‌তায়ালার উপর এবং কীভাবে প্রথম থেকেই তিনি এই ঈমানও রাখতেন যে, তাঁকে কোনও একটি বিশেষ জাতির জন্য নবী করে প্রেরণ করা হয়নি। বরং তাঁকে নবী করে প্রেরণ করা হয়েছে বিশ্বের সকল জাতির জন্যই। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যে সকল রাজা-বাদশাহ্‌ এবং নেতৃবৃন্দের কাছে পত্র লিখা হয়েছিল তাদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এবং অনেকে সম্মান ও ভক্তির সঙ্গে পত্র গ্রহণ করেছিল বটে, কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করেননি। ইসলাম গ্রহণ না করলেও অনেকেই সাধারণ সম্ভ্রম ও শিষ্টাচার প্রদর্শন করেছিল। কিন্তু অনেকে আবার আত্মগরিমা ও অহংকার প্রকাশ করেছিল। কিন্তু, এতেও কোন সন্দেহ নেই যে, এবং এ ব্যাপারে পৃথিবীর ইতিহাসও সাক্ষী যে, ঐ সকল রাজা-বাদশাহ্‌, আমীর ও নেতাদের প্রত্যেকের সঙ্গে ঠিক তেমনই ব্যবহার করা হয়েছিল, যেমন ব্যবহার তাদের প্রত্যেকে করেছিল রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর পত্রের সহিত।

খায়বারের পতন

ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ইহুদী এবং আরবের কাফেররা মুসলমানদের বিরুদ্ধে আশেপাশের কবিলাগুলোকে উত্তেজিত করে তুলছিল। তারা এটা দেখতে পাচ্ছিল যে, আরবদের আর এমন শক্তি নেই যে, তারা মুসলমানদেরকে ধ্বংস করে দিতে পারে, অথবা মদীনার উপরে হামলা চালাতে পারে। ইহুদীরা একদিকে রোমান সাম্রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্তে বসবাসকারী আরব

---

* *যুরকানী : ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৫০-৩৫২ ও আস্‌ সিরাতুল হালবীয়া : ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭৮*

কবিলাগুলোকে, যারা খৃষ্টধর্মে বিশ্বাসী ছিল, তাদেরকে উস্কানী দিচ্ছিল। অপরদিকে তারা তাদের স্বধর্মাবলম্বীদেরকে, যারা ইরাকের অধিবাসী ছিল, তাদের কাছে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে চিঠিপত্র লেখা শুরু করে দিয়েছিল যেন তারা পারস্য রাজা খসরুকে মুলসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলে। উপরে আমি একথাও বলে এসেছি যে, ঐ সকল চক্রান্তের ফলশ্রুতিতে খসরু মুসলমানদের বিরুদ্ধে দারুণভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। যে কারণে সে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে গ্রেফতার করার জন্যে ইয়েমেনের গভর্ণরকে নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা তাঁর বিশেষ কৃপায় মুহাম্মদ (সাঃ)-কে রক্ষা করেছেন, এবং খসরু ও ইহুদীদের ষড়যন্ত্র ও প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছেন। এতো জানা কথাই যে, যদি খোদাতায়ালার বিশেষ কৃপা না হতো, তাহলে পার্থিব দৃষ্টিতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামের এমন কোন শক্তিই ছিল না যা নিয়ে তিনি একদিকে খসরু ও অপরদিকে কায়সারের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে মোকবেলা করতে পারতেন। তাঁর সাথে তো এক খোদাতায়ালাই ছিলেন যিনি খসরুকে হত্যা করিয়েছেন এবং তার পুত্রের দ্বারা এই নিষেধ জারি করে দিয়েছেন যে, মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ব্যাপারে যেন কোন তৎপরতা গ্রহণ করা না হয়। এবং এই নিদর্শন দেখেই ইয়েমেনের গভর্ণর ও অন্যান্য কর্মকর্তারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং ইয়েমেন কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াই সেচ্ছায় মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। মোদ্দা কথা, ইহুদীরা তাদের চক্রান্তের দ্বারা যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল, তাতে তাদেরকে মদীনা থেকে আরও দূরবর্তী স্থানে সরিয়ে দেওয়াটা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। কেননা, তারা যদি মদীনার কাছাকাছি থেকেই যেতো, তাহলে নিশ্চিতভাবেই, আরও বেশী খুন-খারাবী, সন্ত্রাস ও ষড়যন্ত্র চলতেই থাকতো, কাজেই, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হোদায়বিয়ার সন্ধি থেকে ফিরে আসার প্রায় পাঁচ মাস পর এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, ইহুদীদেরকে খায়বার থেকে বহিষ্কার করে দিতে হবে কেননা, খায়বার ছিল মদীনা থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত এবং সেখান থেকে ইহুদীরা অতি সহজেই মদীনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে চলছিল। সুতরাং আঁ হযরত (সাঃ) ৬২৮ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ষোল শ' সাহাবী সহ খায়বারের দিকে মার্চ করে রওয়ানা হয়ে গেলেন। খায়বার ছিল একটি কেল্লা পরিবেষ্টিত শহর, যার চতুর্দিকে টিলার উপরে কেল্লা নির্মাণ করা হয়েছিল। এরূপ একটি সুরক্ষিত শহরকে মাত্র ষোল শ' সিপাহী নিয়ে দখল করা সহজ কাজ ছিল না। শহরের চতুর্দিকের ছোট ছোট চৌকিগুলো ছোটখাট যুদ্ধে জয় করা সম্ভব হলো বটে, কিন্তু ইহুদীরা যখন শহরের মধ্যে তাদের কেন্দ্রীয় কেল্লায় একত্রিত হলো, তখন তাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত সকল আক্রমণ ব্যর্থ হতে লাগলো।

একদিন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে আল্লাহ্তায়ালা বললেন যে, এই শহরের পতন হবে হযরত আলী (রাঃ)-এর হাতে। আঁ হযরত (সাঃ) সকাল বেলা ঘোষণা করলেন, 'আমি আজ ইসলামের কালো পতাকা এমন এক ব্যক্তির হাতে দেব যাকে আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মুসলমানেরা ভালবাসে। খোদাতায়ালা তার হাতেই নির্ধারিত রেখেছেন এই কেল্লার পতন। তিনি সেখানে হযরত আলীকে (রাঃ) ডেকে পাঠালেন এবং তাঁর হাতে পতাকা তুলে দিলেন। সাহাবাদেরকে সঙ্গে নিয়ে হযরত আলী কেল্লা আক্রমণ করলেন। ইহুদীরা কেল্লাবন্দ অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও, আল্লাহ্তায়ালা হযরত আলী ও অন্যান্য সাহাবীদের (রাঃ)কে সেদিন এমন শক্তি ও হিম্মত দান করলেন যে, সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বেই তাঁরা কেল্লা দখল করলেন। অতঃপর এই চুক্তি সম্পাদিত হলো যে, ইহুদীরা তাদের স্ত্রীদেরকে ও সন্তান-সন্ততিদেরকে নিয়ে খায়বার ছেড়ে মদীনা থেকে দূরে কোথাও চলে যাবে। এবং তাদের মালসম্পত্তি মুসলমানদের হাতে ছেড়ে যাবে। কোন ব্যক্তি যদি এই চুক্তির অমান্য করে বা মিথ্যা তালিকা পেশ করে তার মালসম্পত্তি বা লোকজনকে লুকাবার চেষ্টা করে তাহলে সে এই চুক্তির নিরাপত্তার আওতায় থাকবে না, তাকে তার বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি পেতে হবে।

তিনটি বিস্ময়কর ঘটনা

খায়বারের এই যুদ্ধে তিনটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছিল। একটি ছিল আল্লাহ্তায়ালার এক নিদর্শন সম্পর্কিত; অপর দু'টি ছিল হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর মহৎ ও উন্নত চরিত্র সম্পর্কিত।

(এক)

ঐশী নিদর্শন ছিল এই যে, এই যুদ্ধের পর খায়বারের নেতা কেনানার স্ত্রী সাফিয়ার সহিত যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নেকাহ্ হয়ে গেল, তখন তিনি দেখতে পেলেন যে, তাঁর (রাঃ) মুখের উপরে লম্বা লম্বা দাগ। আঁ হযরত (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, 'সাফিয়া, তোমার চেহারার উপরে এই দাগ কি করে হলো'? উত্তরে সাফিয়া (রাঃ) বললেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমি একদিন স্বপ্নে দেখি যে, চাঁদ এসে আমার কোলে পড়েছে। পরদিন আমি এই স্বপ্নের কথা আমার স্বামীকে বলি। আমার স্বামী বললো, এ এক আশ্চর্য স্বপ্ন। তোমার পিতা একজন বড় আলেম, তাঁর কাছে এই স্বপ্নের কথা বলা দরকার। সুতরাং আমি আমার পিতার কাছে স্বপ্নের কথা বললাম। শোনা মাত্রই তিনি আমার মুখের উপরে ভীষণ জোরে থাপ্পড় মারলেন এবং বললেন, 'নালায়েক! তুমি কি আরবের বাদশাহ্কে নেকাহ্

করতে চাও ?'* (ইব্নে হিশামের মতে তাঁর গালে থাপ্পড় মেরেছিল তাঁর স্বামী)। তিনি একথা এ জন্যই বলেছিলেন যে, আরবের জাতীয় প্রতীক ছিল চাঁদ। যদি কেউ স্বপ্নে দেখে যে, চাঁদ তার কোলে এসে পড়েছে, তাহলে তার ব্যাখ্যা বা তাবীর হয় এই যে, আরবের বাদশাহ্‌র সঙ্গে তার সম্পর্ক হয়ে গেছে। যদি কেউ স্বপ্নে দেখে চাঁদ ফেটে গেছে কিংবা মাটিতে পড়ে গেছে, তাহলে তার তাবীর হয়, আরবের শাসন ক্ষমতায় বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে কিংবা তা ধ্বংস হয়ে গেছে।

এই স্বপ্ন ছিল রসূলে করীম (সাঃ)-এর সত্যতার এক নিদর্শন। এবং তা এই সত্যেরও নিদর্শন যে, খোদাতায়ালা তাঁর বান্দাদেরকে গায়েবের অজানা খবর দিয়ে থাকেন। অবশ্য, তা বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রেই বেশী এবং অবিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে কম। হযরত সাফিয়া (রাঃ) ছিলেন ইহুদী মহিলা, তথাপি আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁকে গায়েবের ঐ সংবাদ দিয়েছিলেন সুস্পষ্টভাবে। তাঁর স্বামীর মৃত্যু ঘটেছিল খায়বার অবরোধকালে, যে অবরোধ করা হয়েছিল ইহুদীদের চুক্তিভঙ্গের অপরাধের কারণে। এবং সাফিয়া (রাঃ) যুদ্ধবন্দী হিসেবে এক সাহাবীর কয়েদী ছিলেন। কিন্তু, অনেকের জোর অনুরোধে রসূলে করীম (সাঃ)-এর সঙ্গে তাঁর নেকাহ্ হয়ে যায়। কেননা, তিনি ছিলেন নেতার স্ত্রী। অতএব, নেতার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হওয়াই ছিল বাঞ্ছনীয়। এভাবেই পূর্ণ হলো সেই গায়েবের সংবাদ যা কিনা তাঁকে জানিয়ে ছিলেন স্বয়ং খোদাতায়ালা।

(দুই)

দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে, -অবরোধ চলাকালে এক ইহুদী নেতার রাখাল, যে তার মালিকের ভেড়া-বকরী চরাতো, সে মুসলমান হয়ে যায়। মুসলমান হওয়ার পর সে বললো, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্! এখন আমি তো আর ওদের গৃহে ফিরে যেতে পারবো না। অথচ, এই ছাগল-ভেড়াগুলো তো আমার কাছে আছে। এখন আমি এগুলো নিয়ে কি করি?' আঁ হযরত (সাঃ) বললেন, 'তুমি ভেড়া বকরীগুলোর মুখ কেল্লার দিকে করে দাও এবং ওগুলোকে তাড়া কর। দেখবে, খোদাতায়ালা ওগুলোকে ওদের মালিকের কাছে পৌছে দিয়েছেন।' অতএব সে তা-ই করলো এবং ভেড়া-ছাগলগুলো কেল্লার কাছে গিয়ে পৌছল। সেখান থেকে কেল্লার লোকেরা সেগুলোকে ভিতরে নিয়ে গেল। *

এই ঘটনা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কত সুক্ষ্ম ও সতর্কভাবে আমানতের নিয়ম-নীতির প্রতি এবং সেই সঙ্গে মালিকানার অধিকারের প্রতি দৃষ্টি

---

* *আস্ সিরাতুল হালবিয়া : ৩য় খণ্ড পৃষ্ঠা ৫০*
* *আস্ সিরাতুল হালবিয়া : ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৪*

রাখতেন এবং তা মেনে চলতেন ও অন্যদেরকেও মেনে চলতে বলতেন। যুদ্ধে অংশগ্রণকারীদের মাল-সম্পত্তি দখলে আনা আজকের দিনেও বৈধ মনে করা হয়। এইরূপ ঘটনা আজকের এই সভ্যতার যুগে কেউ কি দেখাতে পারবে ? কেউ কি দেখাতে পারবেন যে, শত্রুর পশুর পাল হস্তগত হওয়ার পরও সেগুলোকে শত্রুর কাছে ফেরৎ পাঠানো হয়েছে? যে শত্রুর সঙ্গে তখন যুদ্ধ চলছিল এবং এই পশু পাল ফিরে গেলে সেই শত্রুর কয়েক মাসের খাদ্যের সংস্থান হয়ে যাবে, এবং তারা দীর্ঘদিন ধরে অবরোধ উপেক্ষা করতে পারে ? আঁ হযরত (সাঃ)-এর ঐ ভেড়া-ছাগলের পাল কেল্লার দিকে ফেরৎ পাঠিয়ে দিতে বলেছিলেন যাতে এমন না হয়ে যে, ঐ মুসলমানের পক্ষে আমানতের দায়িত্ব পালনের কোন ত্রুটি হয়ে যায়, যার হাতে সোপর্দ করা হয়েছিল ঐ ভেড়া ও বকরীর পাল।

(তিন)

তৃতীয় ঘটনাটি হলোঃ একটি ইহুদী স্ত্রীলোক সাহাবাদের (রাঃ) কাছে জিজ্ঞেস করলো যে, রসূলে করীম (সাঃ) পশুর কোন অংশের মাংস খেতে বেশী পসন্দ করেন। সাহাবা বললেন, তিনি (সাঃ) গর্দানের গোশ্ত বেশী পসন্দ করন। অতঃপর, স্ত্রীলোকটি একটি বকরী যবাই করলো এবং তার গোশ্ত দিয়ে তপ্ত পাথরের উপরে কাবাব তৈরী করলে এবং তাতে তীব্র বিষ মিশায়ে দিল। বিশেষ করে সেই সব কাবাবে যা সে তৈরী করেছিল গর্দানের মাংস দিয়ে, যা রসূলে করীম (সাঃ) পসন্দ করতেন বেশী। সূর্যাস্তের পর মাগরিবের নামায আদায় করে যখন রসূলে করীম (সাঃ) তাঁর তাঁবুতে ফিরে আসছিলেন, তখন তিনি দেখতে পেলেন যে,তাঁর খাবারের পাশে একজন স্ত্রীলোক বসে আছে। তাকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কিসের জন্য বসে আছ ?' সে বললো, 'আবুল কাসেম, আমি আপনার জন্য কিছু উপহার নিয়ে এসেছি।' রসূলে করীম (সাঃ) জনৈক সাহাবীকে বললেন, 'ও যা দিতে চায় নিয়ে নাও।' অতঃপর, তিনি যখন খেতে বসলেন, তখন খাবারের সঙ্গে ঐ কীমা করা মাংসের কাবাবও রাখা হলো। রসূলে করীম (সাঃ) তা থেকে এক লোকমা খেলেন। এর পর সাহাবাদের কেউ কেউ ঐ কাবাব খাওয়ার জন্য হাত বাড়ালেন। তিনি (সাঃ) তৎক্ষণাৎ বললেন, 'খেয়ো না। এই হাত আমাকে বলে দিয়েছে যে, ঐ গোশ্তে বিষ মেশানো আছে।' (এর অর্থ এই নয় যে, এ ব্যাপারে তাঁর প্রতি কোন ইলহাম হয়েছিল। বরং এটা একটা আরবী বাগ্‌ধারা, যার অর্থ হলো, গোশ্ত চেখে দেখেই আমি বুঝেছি যে, এর মধ্যে বিষ মেশানো আছে। যেমন, অনুরূপ অর্থে, কোরআন করীমে হযরত মূসা (আঃ)-এর যুগের এক ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে একটি দেওয়াল সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সেটি পড়ে যেতে চাচ্ছে। যার অর্থ হলো, দেওয়ালটির মধ্যে পড়ে যাওয়ার অবস্থা সৃষ্টি

হয়েছে। কাজেই, এখানেও তাঁর (সাঃ) ঐ কথা বলার উদ্দেশ্য এটা ছিল না যে, আসলে হাত কথা বলছে। বরং এর তাৎপর্য এটাই ছিল যে, গোশ্‌ত চেখে দেখার পর তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, ও তে বিষ আছে। এবং পরবর্তী ঘটনায় সেটা প্রমাণিত হয়েছে।) তখন, বশীর (রাঃ) বল্‌লেন, যে খোদা আপনাকে ইজ্জত দান করেছেন, সেই খোদার কসম খেয়ে বলছি, আমিও এক লোকমা মুখে দিয়ে বুঝতে পেরেছি যে, এতে বিষ আছে। আমি চাচ্ছিলাম যে, আমি এগুলো মুখ থেকে উগ্‌লিয়ে ফেলে দেই। কিন্তু, আমার মনে হলো, তাতে আপনার অসুবিধা হবে, এবং আপনার খাওয়াই নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু, আপনি যখন লোকমা বের করলেন, তখন আপনার দেখাদেখি আমিও লোকমা বের করে ফেল্‌লাম। যেহেতু আমার সন্দেহ হচ্ছিল, এতে বিষ আছে সেহেতু আমি ভয় পাচ্ছিলাম যে, হায়! যদি এমন হয় যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ঐ লোকমা মুখ থেকে বের না করেন। ... এর অল্পক্ষণ পরেই বশীর (রাঃ) অসুস্থ হয়ে পড়েন। কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, তিনি (রাঃ) সেখানে খায়বারেই মারা যান, এবং কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, তিনি কয়েকদিন অসুস্থ থাকার পর মারা যান। এরপর রসূলে করীম (সাঃ) ঐ গোশ্‌তের কিছুটা একটি কুকুরের সামনে ফেলে দিলেন, কুকুরটি গোশ্‌ত খেয়ে মারা গেল। তখন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ঐ মেয়ে লোকটাকে ডেকে আনালেন। সে এলে তাকে বললেন, 'তুমি বকরীর এই গোশ্‌তে বিষ মিশায়েছিলে?' স্ত্রী লোকটি বললো, 'কে বলেছে আপনাকে এ কথা?' তিনি বল্‌লেন, 'এই হাত আমাকে বলেছে এ কথা।' এতে স্ত্রীলোকটি বুঝতে পারলো যে, ব্যাপারটা ধরা পড়েছে তাঁর কাছে। এবং সে স্বীকার করলো যে, সে বিষ মেশায়েছে। তিনি (সাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিসের জন্য তুমি এই জঘন্য কাজ করলে'? উত্তরে সে বললো, 'আমার জাতির সঙ্গে আপনার যুদ্ধ হয়েছে, এবং আমার আত্মীয়-স্বজনরা এই যুদ্ধে নিহত হয়েছে। আমার মনে এই চিন্তার উদয় হলো যে, আমি তাকে বিষ খাওয়াবো। যদি তার কাজকর্ম লৌকিক হয়ে থাকে, তাহলে আমরা মুক্তি লাভ করবো। আর যদি সে সত্যি সত্যি নবী হয়ে থাকে, তাহলে খোদাতায়ালা তাঁকে বাঁচায়ে নিবেন।' তার কথা শুনে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে ক্ষমা করে দিলেন।* এবং এ জন্য তার প্রাপ্য মৃত্যুদন্ড থেকে তাকে রেহাই দিলেন। এই ঘটনা থেকে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁকে এবং তাঁর সাহাবীদেরকে হত্যার চেষ্টার অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিদেরকেও ক্ষেত্রবিশেষে ক্ষমা করে দিতেন। অবশ্য প্রয়োজনে তিনি শাস্তিও দিতেন, যখন দেখতেন যে, এরূপ গুরুতর অপরাধী ব্যক্তিকে জীবিত ছেড়ে দেওয়ার অর্থই হবে আগামী দিনগুলোতে তার দ্বারা আরও বেশী ফেৎনা সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হবে।

---

* *আস্ সিরাতুল হালবিয়া : ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬১*

কাবার তওয়াফ (প্রদক্ষিণ)

হিজরতের সপ্তম বৎসরে (ফেব্রুয়ারী, ৬২৯ খৃঃ) হোদায়বিয়ার সন্ধির শর্তানুসারে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাবা ঘর তওয়াফ করার কথা ছিল। অতএব, সেই সময় যখন এসে গেল তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) দু'হাজার সঙ্গীসহ কাবা তওয়াফের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন। যখন তিনি 'মার আল্-জাহ্রান' নামক স্থানে পৌঁছলেন (এই স্থানটি ছিল মক্কার নিকটবর্তী একটি অবকাশ যাপনের স্থান)। তখন তিনি চুক্তি অনুযায়ী সবাইকেই সমস্ত ভারী অস্ত্রশস্ত্র জমা করতে বললেন এবং তিনি স্বয়ং সাহাবাগণসহ চুক্তি মোতাবেক শুধুমাত্র খাপবদ্ধ তরবারি সঙ্গে নিয়ে হারম শরীফে প্রবেশ করলেন। সাত বৎসর যাবৎ দেশ থেকে বিতাড়িত থাকার পর মুহাজেরদের পক্ষে মক্কায় প্রবেশ করাটা চাট্টিখানি কথা ছিল না। একদিকে, দীর্ঘদিনের সেই সব অত্যাচারের কথা স্মরণ করে তাদের কলিজার রক্ত টগবগ করছিল। অপরদিকে, খোদাতায়ালার এই কৃপা প্রত্যক্ষ অর্থাৎ খোদাতায়ালা তাঁদেরকে কাবা তওয়াফ করার যে সৌভাগ্য দান করেছেন তা দেখে, তাঁদের হৃদয়ও আনন্দে টগবগ করছিল। মক্কার অধিবাসীরা মক্কা থেকে বের হয়ে গিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় খাড়া হয়ে মুসলমানদেরকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। মুসলমানদের প্রাণ চাচ্ছিল যে, আজ তারা ওদেরকে দেখিয়ে দেয় যে, খোদাতায়ালা তাদেরকে পুনরায় মক্কায় প্রবেশ করার সামর্থ্য দান করেছেন কি-না। এমনকি, আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রাঃ) সে সময় যুদ্ধ সংগীত গাইতে শুরু করে দিয়েছিলেন। কিন্তু রসূলে করীম (সাঃ) তাকে থামিয়ে দিলেন, এবং বললেন, এখন এই জাতীয় কবিতা আবৃত্তি করো না। বরং এই কথা বলো যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মাবূদ নেই এবং আল্লাহ্ই স্বয়ং তাঁর রসূলকে সাহায্য করেছেন এবং মুমিনদেরকে তিনি অমর্যাদার স্থান থেকে বের করে এনে মর্যাদার উচুঁ স্থানে উন্নীত করেছেন।* কেবল আল্লাহই তাদের শত্রুদেরকে সামনে থেকে হটিয়ে দিয়েছেন।

কাবার তওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়ার মধ্যস্থানে সয়ী (দৌড়ানো) শেষ করার পর তিনি (সাঃ) সাহাবাদের নিয়ে তিন দিন মক্কায় অবস্থান করলেন। হযরত আব্বাসের এক শ্যালিকা, মায়মুনা, অনেকদিক আগে-বিধবা হয়েছিলেন এবং মক্কাতেই ছিলেন। হযরত আব্বাস রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সঙ্গে মায়মুনার বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁর সে আবেদন মঞ্জুর করলেন। চতুর্থ দিকে মক্কাবাসীরা দাবী জানালো যে, 'আপনি এখন চুক্তি, অনুযায়ী মক্কা

---

* *আস্ সিরাতুল হালবিয়া : ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৬১*

ছেড়ে চলে যান।' তিনি তৎক্ষণাৎ সকল সাহাবীকে মক্কা ছেড়ে মদীনার পথে রওয়ানা হওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। মক্কাবাসীদের ভাবাবেগের প্রতি খেয়াল রেখে তিনি তাঁর নব-পরিণীতা স্ত্রী মায়মুনাকেও মক্কাতেই থাকতে বললেন এবং বললেন যে, তিনি (রাঃ) যেন মাল-পত্রের সওয়ারীদের সঙ্গে পরে আসেন। অতঃপর তিনি তাঁর উটনীকে দাবাড় দিয়ে হারম শরীফের সীমানা থেকে বের হয়ে গেলেন এবং সেখানেই তাঁর কাছে সন্ধ্যার সময় বিবি মায়মুনাকে (রাঃ) পৌঁছে দেওয়া হলো এবং সেখানেই মরুভূমি মধ্যে বিবি মায়মুনা (রাঃ) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে উপনীত হলেন।

আঁ হযরত (সাঃ)-এর বহুবিবাহের বিরুদ্ধে আপত্তির একটি জবাব

এই বিষয়টা এমন নয় যে, এই ধরনের সংক্ষিপ্ত জীবনী গ্রন্থে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যায়। কিন্তু বিষয়টা এমন যে, আমাকে বাধ্য হয়েই এ নিয়ে এখানে কিছু না কিছু লিখতে হচ্ছে। আপত্তি উত্থাপন করা হয় যে, রসূলে করীম (সাঃ) অনেকগুলি বিবাহ করেছিলেন এবং তিনি নাকি যেসব বিবাহ করেছিলেন (নাউযুবিল্লাহ্ মিন যালেক - এথেকে আশ্রয় চাই) ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্যই। কিন্তু আমরা যখন তাঁর বিবিগণের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের প্রতি তাকাই, তখন আমাদের না মেনে উপায় থাকে না যে, তাঁর সেই সম্পর্ক এমন পবিত্র, এমন কামনা-বাসনাশূন্য এবং এমন আধ্যাত্মিক ছিল যে, তা অন্য কোনও পুরুষেরই ছিল না তার স্ত্রীর সঙ্গে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সঙ্গে তার বিবিগণের সম্পর্ক যদি কামনার সম্পর্কই হতো, তাহলে তার অনিবার্য ফল এটাই হতো যে, তাঁর বিবিগণের (রাঃ) হৃদয় কখনও আধ্যাত্মিক প্রেরণার প্রভাবে এত বেশী প্রভাবান্বিত হতো না। কিন্তু তাঁর বিবিগণের হৃদয়ে তাঁর প্রতি যে ভালবাসা ছিল এবং তাঁরা যে পুণ্যময় প্রভাব তাঁর কাছ থেকে অর্জন করেছিলেন, তা এমন বহু ঘটনা থেকে জানা যায়, যা তাঁর মৃত্যুর পরে, তাঁর বিবিদের সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে ইতিহাসে। যেমন এই ঘটনাটি। কত ছোট্ট একটি ঘটনা। মায়মুনা (রাঃ) হারম শরীফের বাইরে একটি তাঁবুর মধ্যে রসূলে করীম (সাঃ)-এর সঙ্গে মিলিত হন। যদি তাঁর সঙ্গে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সম্পর্ক স্রেফ দৈহিকই হতো এবং যদি তিনি তাঁর কোন কোন স্ত্রীকে কোন কোন স্ত্রীর উপরে প্রাধান্য দান করতেন, তাহলে মায়মুনা (রাঃ) এই ঘটনাকে তাঁর জীবনের কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে মনে রাখতেন না। বরং তিনি তা ভুলে যাওয়ারই চেষ্টা করতেন।

মায়মুনা (রাঃ) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ওফাতের পর পঞ্চাশ বছর জীবিত ছিলেন এবং তিনি মারা যান আশি বছর বয়সে। কিন্তু তাঁর সেই আশীষময় ঘটনাটিকে তিনি সারা জীবন ধরে ভুলে যেতে পারেন নি। আশি বছর যখন তাঁর যৌবনের সকল উদ্দীপনা শীতল হয়ে গিয়েছিল তখন রসূলে করীম (সাঃ)-এর মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পর, যে সময়টাকে একটা দীর্ঘ সময় বলতেই হবে, মায়মুনা (রাঃ)-এর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময় তিনি তাঁর মৃত্যুশয্যার পাশে উপস্থিত ব্যক্তিদের কাছে মিনতি করে বললেন, 'মক্কার বাইরে এক মঞ্জিল দূরের যে স্থানে রসূলে করীম (সাঃ) তাঁবু গেড়েছিলেন এবং যে তাঁবুতে আমি বিবাহের পরে প্রথম উপনীত হয়ে ছিলাম রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে, ঠিক সেই স্থানটিতে যেন আমার কবর বানানো হয় এবং সে কবরেই যেন আমার সমাধি হয়।'* পৃথিবীতে সত্য ঘটনাও ঘাটে থাকে, কিস্সা কাহিনীও রচনা করা হয়। কিন্তু সত্য ঘটনা থেকেই হোক, আর কিস্সা কাহিনী থেকেই হোক, এই ঘটনার মত এতো হৃদয়-গ্রাহী এমন গভীর প্রেমের আর কোন কাহিনী কি কেউ শোনাতে পারেন ?

খালেদ বিন্ ওলীদ এবং উমর ইবনুল আস-এর ইসলাম গ্রহণ

কাবার যেয়ারত থেকে ফেরার পর পরই দু'জন এমন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেন, যারা ইসলামী যুদ্ধগুলোর প্রথম থেকে শুরু করে তখনও পর্যন্ত কাফেরদের বড় বড় জেনারেলদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করার পর ইসলামের এমন প্রসিদ্ধ জেনারেল হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন যে, ইসলামের ইতিহাস থেকে কোনক্রমেই তাদের নাম মুছে ফেলা সম্ভব হবে না। এই দু'জনের একজন হলেন খালেদ বিন্ ওলীদ, যিনি পরবর্তীকালে রোমান সাম্রাজ্যের ভিত্তি ওলট-পালট করে দিয়েছিলেন এবং এলাকার পর এলাকা দখল করে সেগুলিকে ইসলামী শাসনের অধীনে নিয়ে এসেছিলেন। অপরজন, উমর ইবনুল আস যিনি মিসর জয় করে সেই দেশকে ইসলামী শাসনের অধীনে এনেছিলেন।

মূতার যুদ্ধ

হযরত রসূলে পাক (সাঃ) কাবার যেয়ারত থেকে ফিরে আসার পর খবর পেতে থাকলেন যে, সিরিয়ার সীমান্তবর্তী অঞ্চলের খৃষ্টান আরব কবিলাগুলো

---

* *আস্ সিরাতুল হালবিয়া : ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৩*

ইহুদী এবং কাফেরদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মদীনার উপরে আক্রমণ চালানোর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। কাজেই, তিনি (সাঃ) পনের জনের একটি দলকে সিরিয়ার সীমান্তে পাঠিয়ে দিলেন এই উদ্দেশ্যে যে, তারা যেন খবরাদি নিয়ে দেখে যে, এই সব গুজব কতখানি সত্য। এই দলটি সিরিয়ার সীমান্তে পৌঁছে দেখতে পেল যে, সেখানে একটি সৈন্যবাহিনী জমায়েত হচ্ছে। ঐ যামানার মুসলমানদের মধ্যে তবলীগের প্রেরণা ছিল অত্যন্ত প্রবল, বিধায় ঐ দলের লোকেরা ফিরে এসে রসূলে করীম (সাঃ)-কে খবর দেওয়ার পরিবর্তে সাহসিকতার সঙ্গে অগ্রসর হয়ে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া শুরু করে দিলেন। যারা শত্রুদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দেশ আক্রমণ করে জয় করার জন্য প্রস্তুত হয়েছে তাদের উপরে তৌহীদের শিক্ষা আর কতটুকুই বা প্রভাব বিস্তার করতে পারে। যেইমাত্র তারা ওদেরকে ইসলামের শিক্ষার কথা শোনাতে শুরু করলেন, আর অমনি শত্রু সৈন্যেরা তাদের ধনুক তুলে তাদের উপরে তীর বর্ষণ শুরু করে দিল। যখন মুসলমানেরা দেখলেন যে, তাদের তবলীগের জওয়াবে ওরা কোন দলীল প্রমাণ পেশ করার পরিবর্তে তীর নিক্ষেপ করা শুরু করে দিয়েছে, তখন তারা পশ্চাদপদ হলেন না, ঐ হাজার হাজার সৈন্যের সুবিশাল বাহিনীর হামলা থেকে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেলেন না। বরং খাঁটি মুসলমান হিসেবেই ঐ পনের জন মানুষ শত সহস্র বিশাল বাহিনীর মোকাবেলা করার জন্য দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হয়ে গেলেন এবং যুদ্ধ করে সকলেই শাহাদৎ বরণ করলেন। এই খবর পেয়ে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একটি সেনাবাহিনী পাঠিয়ে দিয়ে তাদেরকে শাস্তি দান করতে মনস্থির করলেন যারা এমন বর্বতার সহিত মাত্র গুটি কয়েক লোককে হত্যা করেছে কিন্তু এর মধ্যেই তিনি সংবাদ পেলেন যে, ঐ সৈন্যবাহিনী, যারা সেখানে জমায়েত হয়েছিল, তারা এদিক সেদিক চলে গেছে। কাজেই, তিনি কিছুদিনের জন্য তার সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখলেন।

এই সময়ে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) রোমান সম্রাটের অধীনস্থ বসরার কর্মকর্তা গাস্থান কবিলার নেতার কাছে কিংবা স্বয়ং রোমান সম্রাট কায়সারের কাছেই এক পত্র লিখেন। এই পত্রে তিনি (সাঃ) সম্ভবতঃ উল্লিখিত ঘটনার কথা বলে অভিযোগ করেন যে, সিরিয়ার কোন কোন কবিলা ইসলামী এলাকার উপরে হামলা চালানোর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে এবং তারা বিনা কারণে পনের জন মুসলমানকে হত্যা করেছে। এই পত্র প্রেরিত হয় আল্ হারস (রাঃ) নামক একজন সাহাবীর মারফতে। তিনি (রাঃ) সিরিয়া যাওয়ার পথে মূতা নামক স্থানে থাকেন। সেখানে তিনি সুরাহ্বিল নামক গাস্থান কবিলার এক নেতা, যে ছিল কায়সার নিয়োজিত একজন কর্মকর্তা, তার সাথে সাক্ষাৎ করেন। সে তাঁকে

জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কোথায় যাচ্ছ ? মনে হচ্ছে, তুমি মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) একজন দূত ?' তিনি (রাঃ) বললেন, 'হ্যাঁ।' এতে সুরাহবিল তাঁকে গ্রেফতার করলো এবং তাঁকে রশি দিয়ে বেঁধে প্রহার করতে করতে হত্যা করলো। যদিও এই ঘটনা সম্পর্কে ইতিহাসে কোন সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না, তবু এটা সহজেই অনুমেয় যে, সেনাবাহিনী মাত্র পনের জন সাহাবীর একটি দলের সবইকে হত্যা করতে পারে, তাদেরই একজন নেতার পক্ষে আর একজন সাহাবীকে হত্যা করাটা কোনও ব্যাপারই ছিল না। তাছাড়া তার যে প্রশ্ন- 'মনে হচ্ছে তুমি মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর একজন দূত।' তাথেকেও বুঝা যায় যে, সে ভয় পাচ্ছিল যে, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) কায়সারের কাছে এই বলে হয়ত অভিযোগ করবেন, 'তোমার এলাকার লোকেরা আমাদের এলাকার লোকদের উপরে আক্রমণ চালাচ্ছে'। হয়তো, তার এ ভয়ও ছিল যে, এই কারণে সম্রাট তাকে জবাবদিহি করতে বলবেন। কাজেই, সে মনে করেছিল যে, ঐ দূতকে হত্যা করলেই সম্রাটের কাছে আর কোন খবর পৌঁছতে পারবে না। অতএব, আর কিছুই হবে না। কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালা তার এই প্রত্যাশা পূর্ণ হতে দেননি। রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর কাছে হারস (রাঃ)-এর মৃত্যুর খবর কোন না কোন ভাবে পৌঁছে গেল। তিন (সাঃ) তখন পূর্ববর্তী ঘটনা এবং এই দ্বিতীয় ঘটনার শাস্তি দেওয়ার জন্য তিনি হাজার সৈন্যের এক বাহিনী গঠন করে যায়েদ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা করে দিলেন। (যায়েদ ছিলেন আঁ হযরত (সাঃ)-এর মুক্তি-দেওয়া ক্রীতদাস, যাঁর কথা বলা হয়েছে তাঁর (সাঃ) মক্কী জীবনের আলোচনা প্রসঙ্গে)। তিনি (সাঃ) হুকুম দিলেন, 'যায়েদ হবে এই বাহিনীর কমান্ডার। তবে যায়েদ যদি মারা যায়, তাহলে তার স্থলে কমান্ডার হবে জাফর বিন আবূ তালিব এবং সেও যদি মারা যায়, তাহলে আব্দুল্লাহ্‌ বিন রওয়াহা কমান্ডার হবে। আর সেও যদি মারা যায়, তাহলে মুসলমানরা নিজেদের মধ্য থেকে তাদের পসন্দ মত একজন কমান্ডার মনোনীত করে নিবে।' এই সময়ে এক ইহুদী তাঁর (সাঃ) মজলিসে বসা ছিল। সে বললো, 'আবুল কাসেম, আপনি যদি সত্য নবী হয়ে থাকেন, এই তিনজনই নিশ্চিত মৃত্যুবরণ করবে কেননা, আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর নবীগণের মুখ থেকে নি:সৃত কথাকে পূর্ণ করে থাকেন।' এই কথা বলে সেই ইহুদী যায়েদকে সম্বোধন করে বললো, 'আমি তোমাকে সত্য সত্যই বলছি যে, যদি মুহাম্মদ (সাঃ) সত্য নবী হয়ে থাকেন, তাহলে কখনই তুমি জিন্দা ফিরে আসতে পারবে না।' উত্তরে যায়েদ (রাঃ) বললেন, 'আমি ফিরে আসি আর না আসি, কিন্তু মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্‌তায়ালার সত্য নবী।'

পরদিন সকালে এই সৈন্যবাহিনী রওয়ানা হয়ে গেল। রসূলে করীম (সাঃ) এবং সাহাবাগণ (রাঃ) তাদেরকে বিদায় জানালেন। রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর জীবনে

এতবড় সেনাবাহিনী তাঁর নেতৃত্ব ছাড়া অন্য কোন জেনারেলের নেতৃত্বে কখনই কোন গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে যায়নি। রসূলে করীম (সাঃ) এই সেনাবাহিনীর সাথে সাথে হাঁটছিলেন এবং তাদেরকে উপদেশ দিচ্ছিলেন। মদীনার বাইরে সেই জায়গায় গিয়ে তিনি দাঁড়ালেন যেখান থেকে তিনি মদীনায় প্রবেশ করেছিলেন এবং যেখান থেকে সাধারণতঃ মদীনাবাসীরা তাদের অতিথিদেরকে বিদায় দিয়ে থাকে। তিনি যায়েদকে (রাঃ) বললেন, 'আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন করতে এবং তোমার সঙ্গে যত মুসলমান আছে তাদের প্রত্যেকের সাথে সদ্ব্যবহার করতে বলছি। তুমি আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে যুদ্ধে যাও এবং সিরিয়াতে তোমার এবং আল্লাহ্‌র যে শত্রুরা আছে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো। যখন তুমি সিরিয়াতে পৌঁছবে, তখন সেখানে এমন কিছু লোককে দেখতে পাবে যারা উপাসনালয়ে বসে আল্লাহ্‌র নাম জপ করছে। তুমি তাদের সঙ্গে কোন প্রকার বিরোধ সৃষ্টি করবে না। তাদের কোনভাবে কষ্ট দিবে না এবং শত্রুদের দেশে কোন নারীকে হত্যা করবে না। কোন ছোট ছেলেমেয়েকে হত্যা করবে না। কোন অন্ধ ব্যক্তিকে মারবে না। কোন বৃদ্ধকে মারবে না। কোন গাছ কাটবে না। কোন দালান-কোঠা ভাঙবে না।' এইসব নির্দেশ দান করে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সেখান থেকে ফিরে এলেন এবং ইসলামী সেনাবাহিনী সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেল। এটা ছিল প্রথম সেনাবাহিনী যা ইসলামের পক্ষ থেকে খৃষ্টানদের মোকাবেলার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিল। এই সেনাবাহিনী যখন সিরিয়া সীমান্তে পৌঁছল তখন তারা জানতে পারলো যে, কায়সারও এদিকেই এসেছে এবং তাঁর সঙ্গে এসেছে এক লক্ষ রোমান সৈন্য। এছাড়াও আরবের খৃষ্টান কবিলাগুলোর প্রায় এক লক্ষ সৈন্যও তাদের সঙ্গে আছে। এতে মুসলমানরা মনস্থ করলো যে, তারা আর অগ্রসর না হয়েই পথিমধ্যেই তাদের শিবির স্থাপন করবে এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে খবর পাঠাবে যে, তিনি চাইলে, যেন আরও সৈন্য পাঠিয়ে দেন। তাছাড়া, যদি কোন নির্দেশও দিতে চান, তাহলে যেন তাও দিয়ে পাঠান। যখন এই পরামর্শ করা হচ্ছিল, তখন আব্দুল্লাহ্ বিন্ রওয়াহা (রাঃ) জোশের সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন,

'হে (আমার) জাতি! তোমরা তোমাদের ঘরবাড়ী ছেড়ে বের হয়েছ খোদার রাস্তায় শহীদ হওয়ার উদ্দেশ্যে। অথচ যে উদ্দেশ্যে তোমরা বের হয়ে এসেছ, এখন তার জন্যই তোমরা ভয় পাচ্ছ। আমরা তো কখনই আমাদের নিজেদের সংখ্যা, নিজেদের শক্তি, নিজেদের যোগ্যতার বলে যুদ্ধ করি না। আমার তো সেই ধর্মের সাহায্যার্থে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করি যা খোদাতায়ালা দয়া করে অবতীর্ণ করেছেন আমাদের জন্য। শত্রু যদি সংখ্যায় অনেক গুণ বেশী হয় তো হোক না;

পরিণামে দু'টি পুণ্যের একটি তো আমরা অর্জন করবই। হয় আমরা জয়লাভ করবো, নয় তো শহীদ হয়ে যাব।'

অন্য সবাই তাঁর কথা শুনে বললো, 'ইবনে রওয়াহা সম্পূর্ণ সঠিক কথা বলছেন'। অতএব তৎক্ষণাৎ মার্চ করার হুকুম দেওয়া হলো। যখন তারা অগ্রসর হতে লাগলো, তখন দেখতে পেল যে, রোমান সৈন্যবাহিনী তাদের দিকে অগ্রসর হয়ে আসছে। তখন মুসলমানরা ঐ মূতা নামক স্থানেই অবস্থান গ্রহণ করলেন এবং যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই মুসলমানদের সেনাপতি যায়েদ ইবনে হারেসা শহীদ হয়ে গেলেন। তখন ইসলামী সেনাবাহিনীর পতাকা হাতে তুলে নিলে রসূলে করীম (সাঃ)-এর চাচাতো ভাই জাফর ইবনে আবু তালিব এবং সেনাবাহিনী পরিচালনা করতে লাগলেন। তিনি যখন দেখতে পেলেন যে, শত্রু সৈন্যের চাপ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং মুসলমানরা সংখ্যায় অল্প হওয়ার দরুন সেই চাপ প্রতিহত করতে পারছে না তিনি খুব জোশের সঙ্গে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়লেন এবং তাঁর ঘোড়ার পা কেটে ফেললেন, যার অর্থ হলো, 'আমি কোন অবস্থাতেই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পিছু হটে যাব না। আমি বরং মৃত্যুবরণ করবো তবু পশ্চাদপসরণ করবো না।' এটা ছিল একটা আরবী রীতি। তারা ঘোড়ার পা এজন্যই কেটে দিত যে, যাতে সওয়ারীহীন হয়ে এদিক সেদিক পালিয়ে যেতে না পারে যার দরুণ সৈন্যদের মাঝে বিপর্যকর অবস্থায় সৃষ্টি হতে পারে। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁর ডান হাত কাটা পড়লো, তিনি বাম হাতে পতাকা ধারণ করলেন। তাঁর বাম হাতও কাটা পড়লো। তখন তিনি তাঁর উভয় বাহুর দাফনা দিয়ে পতাকা বুকের উপরে জাপটে ধরলেন এবং যুদ্ধের ময়দানে দাঁড়িয়ে রইলেন। শেষপর্যন্ত তিনি শহীদ হয়ে গেলেন। তখন আব্দুল্লাহ্ বিন্ রওয়াহা রসূল করীম (সাঃ)-এর নির্দেশ মোতাবেক পতাকা হাতে নিলেন এবং শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করলেন এবং লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। তখন মুসলমানদের এমন অবস্থা ছিল না যে, তারা পরামর্শ করে তাদের নেতা মনোনীত করে এবং পরিস্থিতি এমন আকার ধারণ করেছিল যে, সংখ্যাধিক্যের কারণে শত্রুসৈন্য মুসলমানদের অবস্থানের এলাকায় ঢুকে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। তখন খালেদ বিন্ ওলীদ তাঁর এক বন্ধুর পরামর্শে পতাকা হাতে তুলে নিলেন এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন।

পরদিন খালেদ তাঁর পরিশ্রান্ত ও আঘাতে আঘাতে জর্জরিত সেনাবাহিনী নিয়ে দুশমনের মোকাবেলার জন্য বেরিয়ে পড়লেন। তিনি এক কৌশল অবলম্বন করলেন এবং সেনাবাহিনীর সামনের সারিকে পিছনে পিছনের সারিকে সামনে এবং ডানের সারিকে বামে, বামের সারিকে ডানে নিয়ে এসে মোতায়েন করে

দিলেন এবং এমনভাবে তকবীর ও শ্লোগান দিতে থাকলেন যে, শত্রু মনে করলো, মুসলমানদের সাহায্যের জন্য নতুন সৈন্যবাহিনী এসে গেছে। সুতরাং তারা পিছু হটে চলে গেল এবং খালেদও ইসলামী সেনাবাহিনীকে বাঁচিয়ে নিয়ে ফিরে এলেন।*

রসূলে করীম (সাঃ)-কে আল্লাহ্তায়ালা এই ঘটনার খবর ঐদিনই ওহীর মাধ্যমে অবহিত করলেন। তিনি এক ঘোষণার দ্বারা সকল মুসলমানকে মসজিদে একত্রিত করলেন। যখন তিনি মিম্বরে উঠে দাঁড়ালেন তখন তাঁর চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিল। তিনি বললেন, 'হে লোক সকল! আমি তোমাদেরকে এই যুদ্ধে গমনকারী সেনাবাহিনী সম্পর্কে খবর দিচ্ছি যে, এই সেনাবাহিনী এখান থেকে গেলে পর শত্রুর সঙ্গে তাদের যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যায়েদ শহীদ হয়ে যায়। কাজেই তোমরা যায়েদের জন্য দোয়া করো। তারপর, জাফর পতাকা গ্রহণ করে এবং শত্রুর উপরে আক্রমণ চালায়। যুদ্ধ করতে করতে সেও শহীদ হয়ে যায়। তোমরা তার জন্যেও দোয়া করো। তারপর আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা পতাকা তুলে নেয় এবং খুব সাহসিকতার সঙ্গে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেও শহীদ হয়ে যায়। তোমরা তার জন্যেও দোয়া করো। এরপর পতাকা গ্রহণ করে খালেদ বিন্ ওলীদ। তবে আমি তাকে কমাণ্ডার নিযুক্ত করিনি, সে নিজে নিজেকে কমাণ্ডার নিযুক্ত করে। কিন্তু সে হচ্ছে খোদাতায়ালার তরবারিসমূহের মধ্যে একটি তরবারি। কাজেই সে খোদাতায়ালার সাহায্যে ইসলামী সেনাবাহিনীকে হেফাযতের সাথে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়। আঁ হযরতে (সাঃ)-এর এই বক্তৃতার পর মুসলমানদের মধ্যে খালেদ 'সাইফুল্লাহ্' (আল্লাহ্র তরবারি)- নামে খ্যাতি লাভ করেন।

খালেদ (রাঃ) যেহেতু ঈমান এনেছিলেন অনেক পরে, সেহেতু অন্যান্য সাহাবীরা মজা করে হোক, বা কোন ঝগড়া-ঝাটির কারণে হোক তাঁকে মাঝে মধ্যে খোঁটা দিত। একবার এই ধরনের একটা ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে হযরত আব্দুর রহমান বিন্ আওফ (রাঃ)-এর কিছু তর্কাতর্কি হয়। তিনি রসূলুল্লাহ্র (সাঃ) কাছে খালেদের (রাঃ) বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, 'খালেদ! তুমি এমন এক ব্যক্তিকে কেন দুঃখ দাও, যে বদরের সময় থেকে ইসলামের খেদমত করে আসছে। তুমি যদি ওহোদ পর্বতের সমানও সোনা (ইসলামের খেদমতে) খরচ করো, তাহলে ওর সমান পুরস্কার তুমি খোদাতায়ালার কাছে পাবে না।' এতে খালেদ বললেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্! ও আমাকে খোঁটা দেয়। কাজেই, আমিও তার জবাব দেই।' রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, 'তোমরা খালেদের

---

* *আস্ সিরাতুল হালবিয়া : ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৫*

মনে কষ্ট দিও না, সে তো আল্লাহ্‌র তরবারিসমূহের মধ্যে একটি তরবারি। যা আল্লাহ্‌তায়ালা উত্তোলন করেছেন কাফেরদেরকে হত্যা করার জন্য।* এই ভবিষ্যদ্বাণী কয়েক বৎসর পরেই পূর্ণ হয়েছিল অক্ষরে অক্ষরে।

খালেদ (রাঃ) যখন তাঁর সোনাবাহিনী নিয়ে ফিরে এলেন, তখন মদীনার সাহাবীরা যারা যুদ্ধে যাননি, তাঁরা ঐ সৈন্যদেরকে পরাজয় বরণকারী বলা শুরু করে দিলেন। অর্থাৎ তাঁরা বলতে চাচ্ছিলেন যে, তোমাদের উচিৎ ছিল, ওখানেই যুদ্ধ করে শাহাদৎ বরণ করা। তোমাদের ফিরে আসা উচিৎ হয়নি। রসূলে করীম (সাঃ) বললেন, 'এরা পরাজয় বরণকারী নয়, বরং এরা শত্রুকে বারবার আক্রমণকারী সিপাহী।' এই কথার মধ্য দিয়ে তিনি (সাঃ) ভবিষ্যতের সেই সব যুদ্ধ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, যা মুসলমানদের করতে হয়েছিল সিরিয়ার বিরুদ্ধে।

মক্কা বিজয়

অষ্টম হিজরীর রমযান মাসে (ডিসেম্বর, ৬২৯ খৃঃ) হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম সেই চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন, যে যুদ্ধ আরবে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করে দিল। এই ঘটনা যেভাবে ঘটেছিল তা হচ্ছে, হোদায়বিয়ার সন্ধিতে এই ফায়সালা হয়েছিল যে, আরব গোত্রগুলোর মধ্য থেকে যারা খুশী মক্কাবাসীদের সঙ্গে যোগ দিতে পারবে এবং যারা খুশী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর সঙ্গে যোগ দিতে পারবে। এছাড়া আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত এই ছিল যে, দশ বছরের মধ্যে উভয় পক্ষের কেউ কারও বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না। তবে কেউ হামলা চালিয়ে যদি সন্ধির চুক্তি ভঙ্গ করে, তাহলে সেক্ষেত্রে উক্ত শর্ত কার্যকর থাকবে না। চুক্তি অনুসারে বনু বকর নামে আরবের একটি গোত্র মক্কাবাসীদের সঙ্গে যোগ দিল এবং খোজাআ নামক গোত্রটি যোগ দিল মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর সঙ্গে। আরবের কাফেররা কোন চুক্তি রক্ষার ব্যাপারে খুব একটা তোয়াক্কা করতো না, বিশেষতঃ সেই চুক্তি যদি মুসলমানদের সঙ্গে হয়। বনু বকর গোত্রের সঙ্গে খোজাআ গোত্রের বিরোধ চলে আসছিল বহুদিন ধরে। হোদায়বিয়ার সন্ধির কিছুদিন পরে তারা মক্কাবাসীদের সঙ্গে পরামর্শ করলো যে, খোজাআ গোত্র তো চুক্তির বদৌলতে খুব নিরাপদেই আছে, এখন তাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিশোধ গ্রহণ করার সময় এসেছে। অতএব মক্কার কোরেশ ও বনু বকর একসাথে জোটবদ্ধ হয়ে বনু খোজাআ গোত্রের উপরে রাত্রি বেলায়

---

* *আস্‌ সিরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৭*

চোরাপোপ্তা হামলা চালিয়ে তাদের বহু সংখ্যক লোককে হত্যা করলো। খোজআ গোত্র যখন জানতে পারলো যে, কোরেশ বনু বকরের সাথে মিলে একত্রে হামলা চালিয়েছে, তখন তারা সেই চুক্তিভঙ্গের খবর জানাবার জন্য তৎক্ষণাৎ চল্লিশজন লোককে দ্রুতগামী উটে তুলে দিয়ে মদীনায় প্রেরণ করলো এবং তারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে এই দাবী করে পাঠাল যে, চুক্তি মোতাবেক এখন আপনার কর্তব্য আমাদের পক্ষে প্রতিশোধ গ্রহণ করা এবং মক্কা আক্রমণ করা। এই দাবী নিয়ে ঐ কাফেলা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি (সাঃ) তাদেরকে বললেন, তোমাদের দুঃখ আমার দুঃখ। আমি আমার অঙ্গীকারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠ। এই যে এখন বৃষ্টি হচ্ছে (ঐ সময় বৃষ্টি হচ্ছিল) এবং যা প্রবল বেগে বর্ষিত হচ্ছে, ঠিক এমনি দ্রুততার সঙ্গে ইসলামী সৈন্যরা তোমাদের সাহায্যের জন্য বর্ষিত হবে। মক্কাবাসীরা যখন খোজাআ প্রতিনিধিদলের এই খবর জানতে পারলো, তখন তারা খুব ভীত হয়ে পড়লো এবং তারা আবু সুফিয়ানকে মদীনায় প্রেরণ করলো যেন সে মুসলমানদেরকে যেকোন ভাবেই হোক আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকতে সম্মত করে। আবু সুফিয়ান মদীনায় পৌঁছে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে এই কথার উপরে জোর দিতে লাগলো যে, যেহেতু সে হোদায়বিয়ার সন্ধির সময়ে উপস্থিত ছিল না, সেহেতু নতুন করে চুক্তি করতে হবে। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তার সেই কথার কোন জওয়াব দিলেন না। কেননা জওয়াব দিলেই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে যাবে। এতে আবু সুফিয়ান হতাশ হলো এবং সে ঘাবড়ে গিয়ে মসজিদের মধ্যে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিল, 'হে লোক সকল! আমি মক্কাবাসীর পক্ষ থেকে আপনাদের জন্য নতুন করে শান্তির ঘোষণা দিচ্ছি।' এতে মুসলমানরা তার নির্বুদ্ধিতা দেখে হেসে উঠলো। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, 'আবু সুফিয়ান! এই কথা তো বলছো তুমি এক তরফা। আমি তো তোমাদের সঙ্গে নতুন কোন চুক্তি করিনি।'

এই সময়ে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) চতুর্দিকের মুসলিম কবিলাগুলোর কাছে বার্তা পাঠিয়ে দিলেন। যখন এই খবরাদি এসে পৌঁছল যে, মুসলিম কবিলাগুলো তৈরী হয়ে গেছে এবং তাদের প্রত্যেকেই মার্চ করতে করতে এসে পথিমধ্যে মিলিত হতে থাকবে, তখন তিনি (সাঃ) মদীনাবাসীদেরকে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে তৈরি হতে বললেন। ৬৩০ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারীতে এই সৈন্যবাহিনী মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেল এবং রাস্তার মধ্যে চতুর্দিক থেকে মুসলিম গোত্রগুলো একের পর এক এসে এসে যোগদান করতে থাকলো। কয়েক মঞ্জিল পথ অতিক্রম করার পর যখন এই সেনাবাহিনী ফারান মরুতে প্রবেশ করলো, তখন তাদের সংখ্যা সোলায়মান নবীর (আঃ) ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী দশ হাজারে উন্নীত হলো। এদিকে তো এই সৈন্যবাহিনী মক্কা অভিমুখে কুচকাওয়াজ করে অগ্রসর হচ্ছিল;

অপরদিকে চারিদিকের বিরাজমান নীরবতা মক্কাবাসীদের মনে উত্তরোত্তর ভীতির সঞ্চার করে চলেছিল। শেষে তারা পরামর্শ করে আবু সুফিয়ানের উপরে এই চাপ সৃষ্টি করলো যে, তার তো উচিত অন্ততঃপক্ষে মক্কার বাইরে গিয়ে কিছু খোঁজ খবর নেওয়া যে, আসলে মুসলমানরা কি করতে চায়। আবু সুফিয়ান তখন মক্কা থেকে এক মঞ্জিল পথ অতিক্রম করে এসে দেখতে পেলো যে, রাত্রিবেলায় মরু ভূমিতে আগুন জ্বলছে। আর সেই আগুনের আলোতে মরুভূমি আলোকিত হয়ে উঠেছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হুকুম দিয়েছিলেন যে, সকল তাঁবুর সম্মুখে যেন আগুন জ্বালিয়ে রাখা হয়। মরুভূমির মধ্যে দশ হাজার মানুষের জন্য তৈরী তাঁবুসমূহের সামনে প্রজ্জ্বলিত আগুন এক ভয়াবহ দৃশ্যের অবতারণা করেছিল। আবু সুফিয়ান তার সঙ্গীদেরকে জিজ্ঞেস করলো, 'ব্যাপার কি? আসমান থেকে সৈন্যবাহিনী নেমে এসেছে নাকি? আরবের কোন কওমের সেনাবাহিনী তো এত বড় হতে পারে না?' তার সঙ্গীরা বিভিন্ন গোত্রের কথা বললো। কিন্তু কে বললো, 'না, না, আরবের কোন গোত্রেরই সেনাবাহিনী এত বড় ও বিশাল হতে পারে না।' তারা যখন এইরূপ কথাবার্তা বলছিল, এমন সময়ে, অন্ধকার বিদীর্ণ করে আওয়াজ এলো, 'আবূ হানজালা! (আবু সুফিয়ানের ডাকনাম)'। আবু সুফিয়ান বললো, 'তুমি আব্বাস, এখানে কোথায়?' আব্বাস বললেন, 'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সৈন্যবাহিনী সামনেই শিবির স্থাপন করেছে। তোমরা যদি এখন শীঘ্র শীঘ্র একটা কিছু না কর, তাহলে তোমাদের জন্য পরাজয় ও অপমান প্রস্তুত হয়ে আছে।' আব্বাস ছিলেন আবু সুফিয়ানের পুরাতন বন্ধু। তাই এই সব কথাবার্তার পর তিনি আবূ সুফিয়ানকে তাঁর সঙ্গে তাঁর উটের পিঠে চড়ে বসতে বললেন বরং তিনি তার হাত ধরে তাকে টেনে তুলে নিজের পাশেই বসালেন এবং উটের গায়ে এড়ী মারলেন এবং দ্রুত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিকটে এসে উপস্থিত হলেন। হযরত আব্বাস (রাঃ) ভয় পাচ্ছিলেন যে, পাছে না উমর আবার তাকে দেখতে পেয়ে কতল করে ফেলে (উমর-রাঃ-ঐ সময় পাহারারত ছিলেন)। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আগেই বলে রেখেছিলেন, 'তোমাদের কারো সঙ্গে যদি আবু সুফিয়ানের সাক্ষাৎ হয়ে যায়, তাহলে তাকে হত্যা করবে না।'

এই সকল ঘটনাবলী আবু সুফিয়ানের মনে এক গভীর ভাবান্তর সৃষ্টি করলো। আবু সুফিয়ান দেখতে পেল যে, মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে তারা আল্লাহ্র রসূলকে মাত্র একজন সঙ্গীসহ মক্কা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করেছিল। কিন্তু আজ, মাত্র সাত বছর পার হতে না হতেই, তিনি দশহাজার পবিত্র সঙ্গীসহ কোন জুলুম, কোন জবরদস্তি ছাড়াই সম্পূর্ণ বৈধভাবে মক্কার দুয়ারে কড়া নাড়ছেন এবং মক্কাবাসীদের কোন শক্তি নেই যে, তাকে প্রতিহত করে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সমীপে আসতে আসতে আবু সুফিয়ান এই জাতীয় চিন্তা ভাবনার কারণে এবং

কিছুটা ভয়ভীতির কারণে কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও হতভম্ব হয়ে পড়েছিল। তার এই অবস্থা লক্ষ্য করে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত আব্বাসকে বললেন, 'তুমি আবু সুফিয়ানকে সঙ্গে নিয়ে যাও এবং রাতে তোমার কাছেই রাখ। কাল ফজরে আমার কাছে নিয়ে আস।' সুতরাং আবু সুফিয়ান রাত্রে আব্বাসের (রাঃ) সঙ্গেই থাকলো। প্রত্যুষে যখন তাকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিকটে হাজির করা হলো, তখন ফজর নামাযের ওয়াক্ত। মক্কার লোকেরা ফজরের নামায পড়া সম্পর্কে কিছুই জানতো না, আবু সুফিয়ান দেখলো যে, ফজরের ওয়াক্তে মুসলমানরা পানির লোটা নিয়ে এদিকে সেদিকে যাওয়া আসা করছে; কেউ অজু করছে, কেউ বা নামাযের জন্য কাতার (লাইন) সোজা করছে। সে মনে করলো যে, তার জন্য বোধ হয় কোন নতুন ধরনের শাস্তির ব্যবস্থা হচ্ছে। কাজেই সে ভীত হয়ে হযরত আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলো, 'এই লোকগুলো এত ভোরে এসব কি করছে?' আব্বাস (রাঃ) বললেন, 'তোমার ভয়ের কোন কারণ নেই, এরা নামায পড়ছে।' আবু সুফিয়ান দেখতে পেল যে, হাজার হাজার মুসলমান রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পিছনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেছে এবং যখন তিনি রুকূ করলেন তখন সকলেই রুকূ করছে, যখন তিনি সিজদা করছেন তখন সকলেই সিজদা করছে। হযরত আব্বাস (রাঃ) যেহেতু পাহারারত ছিলেন সেহেতু তিনি নামাযে শামিল হতে পারেন নি। তাঁকে আবু সুফিয়ান জিজ্ঞেস করলো, 'এখন এরা কি করছে? আমি তো দেখছি, মুহাম্মদ (সাঃ) যা করছে, এরা সবাই তাই করছে।' আব্বাস (রাঃ) বললেন, 'তুমি অযথা কি ভাবছ? এরা তো নামায আদায় করছে। কিন্তু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যদি ওদেরকে হুকুম দেয়, খানাপিনা ছেড়ে দাও, তাহলে ওরা সবাই খনাপিনাও ছেড়ে দেবে।' আবু সুফিয়ান বললো, 'আমি খসরুর দরবার দেখেছি, আমি কায়সারের দরবার দেখেছি। কিন্তু আমি তাদের জন্য তাদের জাতিকে কখনও এত আত্মনিবেদিত দেখিনি, যত আত্মনিবেদিত আমি দেখতেপাচ্ছি মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জাতিকে তার প্রতি'।* সে আবারও আব্বাসকে বললো, 'কেন, এটা কি হতে পারে না যে, তুমি নিজেই তাঁর (সাঃ) কাছে এই আবেদন করো যে, তিনি যেন তাঁর জাতির প্রতি দয়ার সহিত ব্যবহার করেন?' নামায পড়া শেষ হয়ে গেলে হযরত আব্বাস আবু সুফিয়ানকে নিয়ে মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হলেন। আঁ হযরত (সাঃ) বললেন, 'আবু সুফিয়ান! এখনও কি সময় আসেনি তোমার উপরে এই সত্য প্রকাশিত হওয়ার যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবূদ নেই?' আবু সুফিয়ান বললো, 'আমার বাপ-মা তোমার জন্যে কোরবানী হউক, তুমি অতি বিনয়ী, অতি সম্ভ্রান্ত এবং

* *আস্ সিরাতুল হালবিয়া: ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৯১*

অতিশয় শান্তি ও সমঝোতা প্রিয়, দয়াশীল মানুষ। আমি এখন তো এটা বুঝেছি যে, যদি আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন উপাস্য থাকতো, তাহলে সে আমাদের কিছু না কিছু সাহায্য করতো।'

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, 'হে আবু সুফিয়ান ! এখনও কি সময় আসেনি যে, তুমি এটা উপলব্ধি করো যে, আমি আল্লাহ্র রসূল?' আবু সুফিয়ান বললো, 'আমার বাপ-মা তোমার জন্যে কোরবানী হউক এ বিষয়ে এখনও আমার কিছু সন্দেহ আছে।'

কিন্তু আবু সুফিয়ান ইতস্ততঃ করলেও, তার সঙ্গে আসা (মুসলমানদের সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য) দুই ব্যক্তির উভয়েই মুসলমান হয়ে গেলেন। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন হাকিম বিন্ হাযাম। এর পর আবু সুফিয়ানও মুসলমান হয়ে যান। তবে তাঁর হৃদয় সম্পূর্ণরূপে খুলেছিল, সম্ভবতঃ মক্কা বিজয়ের পরে। ঈমান আনার পর হাকিম বিন্ হাযাম বললেন,

'ইয়া রসূলাল্লাহ্! আপনি কি এই সৈন্যবাহিনী গঠন করেছেন নিজের জাতিকেই ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য ?'

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, 'ওরা জুলুম করেছে। ওরা পাপ করেছে । এবং তোমরা হোদায়বিয়ায় সম্পাদিত সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করেছ এবং খোজাআ গোত্রের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ করেছ। তোমরা সেই পবিত্র স্থানে যুদ্ধ করেছ, যে স্থানে আল্লাহ্ শান্তি স্থাপন করেছেন।'

হাকিম বললেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্! ঠিক কথা। আপনার জাতি নিঃসন্দেহে এসব করেছে। কিন্তু আপনার উচিত ছিল, মক্কার উপর আক্রমণ চালানোর পরিবর্তে হাওয়াযিন গোত্রের উপরে হামলা চালানো।'

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, 'ঐ গোত্রটা অত্যাচারী বটে, কিন্তু আমি আল্লাহ্র কাছে এই প্রত্যাশা রাখি যে, মক্কা বিজয়, ইসলামের বিজয় এবং হাওয়াযিনদের পরাজয়, এ সবকিছুই তিনি আমার হাতেই সম্পন্ন করবেন। এরপর আবু সুফিয়ান বললেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্! যদি মক্কার লোকেরা অস্ত্র ধারণ না করে, তাহলে কি ওরা নিরাপত্তা পাবে ?'

আঁ হযরত (সাঃ) বললেন, 'হ্যাঁ, প্রত্যেক ব্যক্তি যে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ রাখবে, তাকে নিরাপত্তা দান করা হবে।'

হযরত আব্বাস বললেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্! আবু সুফিয়ান গৌরব ও সম্ভ্রম পসন্দকারী ব্যক্তি। সে চাচ্ছে যে, তার মান-ইজ্জত রক্ষার ব্যাপারেও যেন একটা কিছু করা হয়।'

আঁ হযরত (সাঃ) বললেন, 'খুব ভাল কথা। যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের ঘরে আশ্রয় নিবে তাকেও নিরাপত্তা দান করা হবে। যে নিজের অস্ত্র পরিত্যাগ করবে তাকেও নিরাপত্তা দান করা হবে। যে ব্যক্তি হাকিম বিন হাযামের ঘরে আশ্রয় নেবে তাকেও নিরাপত্তা দান করা হবে।'

অতঃপর আবু রোয়াইহা (রাঃ) যাঁকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আবিসিনিয়ার দাস বেলাল (রাঃ)-এর ভাই করে দিয়েছিলেন, তাঁর সম্পর্কে বললেন, 'আমি এখন আবু রোয়াইহার হাতে আমার পতাকা দিব এবং যে ব্যক্তি আবু রোয়াইহার ঐ পতাকা তলে আশ্রয় নেবে তাকেও কিছু বলা হবে না।'

এবং তিনি হযরত বেলাল (রাঃ)-কে বললেন, 'তুমি তার সাথে হাঁটতে থাক এবং এই ঘোষণা করতে থাক যে, যে ব্যক্তি আবূ রোয়াইহার পতাকার তলে আশ্রয় নেবে তাকে নিরাপত্তা দেওয়া হবে।' *

এই আদেশের মধ্যে নিহিত ছিল কত সূক্ষ্ম, কত সুন্দর হেকমত! মক্কার লোকেরা বেলালের (রাঃ) পায়ে রশি বেঁধে তাঁকে মক্কার অলিগলিতে টেনে, হ্যাঁচড়ে নিয়ে বেড়াতো। মক্কার অলিতে গলিতে মক্কার মাঠে-প্রান্তরে বেলালের (রাঃ) জন্য কোন নিরাপত্তার ঠাঁই ছিল না। ঠাঁই ছিল শুধু অত্যাচারের, উৎপীড়নের আর অপমানের। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ভাবলেন, আজ তো বেলালের প্রাণ বারবার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠবে। কাজেই আজ এই নিষ্ঠাবান প্রিয় সাথীটির জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু এটাও ঠিক যে, আমাদের প্রতিশোধ হতে হবে ইসলামের মর্যাদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। তাই তিনি বেলালের প্রতিশোধ নিলেন, কিন্তু সে প্রতিশোধ এমনভাবে নিলেন না যে, তরবারী দিয়ে তাঁর (রাঃ) দুশমনদের গর্দান কেটে ফেলা হলো। বরং তিনি তাঁর ভাইয়ের হাতে পতাকা দিয়ে খাড়া করে দিলেন এবং বেলালকে (রাঃ) বল্লেন, তিনি যেন ঘোষণা করতে থাকেন, 'যে কেউ আমার ভাইয়ের পতাকার তলে এসে আশ্রয় নিবে, তাকে নিরাপত্তা দান করা হবে। কত মধুর ও মহীয়ান ছিল এই প্রতিশোধ! যখন বেলাল (রাঃ) উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতে থাকবেন,

'হে মক্কার অধিবাসীরা! তোমরা এসো এবং আমার ভাইয়ের পতাকার তলে আশ্রয় গ্রহণ করো, তোমাদেরকে নিরাপত্তা দান করা হবে।'

তখন তাঁর হৃদয় থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা আপনা আপনি প্রশমিত হয়ে যাবে এবং বেলালও (রাঃ) উপলব্ধি করেছিলেন, 'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)

---

* *আস্ সিরাতুল হালাবিয়া: ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ৯১*

আমার জন্য যে প্রতিশোধ পন্থা ঠিক করেছেন, তার চাইতে মর্যাদাপূর্ণ, তার চাইতে উত্তম প্রতিশোধ আর কিছু হতে পারে না।

সৈন্যবাহিনী যখন মক্কা অভিমুখে যাত্রা শুরু করলো। রসূলে করীম (সাঃ) হযরত আব্বাসকে (রাঃ) নির্দেশ দিলেন, 'তুমি রাস্তার পার্শ্বে আবূ সুফিয়ান ও তার সঙ্গীদেরকে নিয়ে এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকো যেন ওরা ইসলামী সেনাবাহিনীর আনুগত্য ও আন্তরিকতা প্রত্যক্ষ করতে পারে।' হযরত আব্বাস (রাঃ) তাই করলেন। আবূ সুফিয়ান ও তাঁর সঙ্গীদের সম্মুখ দিয়ে আরবের গোত্রগুলো একটার পর একটা অতিক্রম করে যেতে থাকলো। এই গোত্রগুলোর উপরেই মক্কা এক সময় নির্ভর করতো। কিন্তু তারা আজ কুফরীর পতাকা উড়াচ্ছে না। আজ তারা ইসলামের ঝাণ্ডা উড়ায়ে চলছে এবং তাদের মুখ থেকে উচ্চারিত হচ্ছে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র একত্বের ঘোষণা। ওরা আজ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জীবন নেওয়ার জন্য অগ্রসর হচ্ছে না- যেমনটা আশা করতো মক্কাবাসীরা -বরং ওরা আজ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জন্য তাদের রক্তের শেষবিন্দু পর্যন্ত বিসর্জন দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছে। এবং তাদের জীবনের শেষ ইচ্ছা এটাই যে, এক আল্লাহ্‌র তৌহীদ এবং তার প্রচারকে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত করবেই। একটার পর একটা ব্যাটেলিয়ান অতিক্রম করে যাচ্ছিল। এর সঙ্গে আশজাহ্ গোত্রের সেনাবাহিনীও ছিল। ইসলামের প্রতি ভালবাসা এবং তজ্জন্য আত্মবিসর্জন দেওয়ার উদ্দীপনা তাদের চেহারা থেকে এবং তাদের শ্লোগান থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। আবূ সুফিয়ান বললেন, 'আব্বাস, এরা কারা? আব্বাস (রাঃ) বললেন, 'এরা আশজাহ্ কবিলার লোক।' আবূ সুফিয়ান বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বললেন, 'বলো কি! সারা আরবে তো এদের চেয়ে বড় দুশমন মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আর কেউ ছিল না।' আব্বাস (রাঃ) বললেন, 'এটা আল্লাহ্‌র মেহেরবানী। তিনি যখন চাইলেন, তখন ওদের হৃদয় ইসলামের ভালবাসা দিয়ে ভরপুর করে দিলেন'। সবশেষে মুহাজের ও আনসারদের নিয়ে গঠিত সেনাবাহিনী অতিক্রম করে গেলেন মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)। এই বাহিনীতে সৈন্য ছিল দু'হাজার এবং এদের প্রত্যেকের মাথা থেকে পা পর্যন্ত যুদ্ধ সাজে সজ্জিত ছিল। হযরত উমর (রাঃ) এদের কাতার ঠিক করতে করতে অগ্রসর হচ্ছিলেন এবং বলছিলেন, 'ঠিক মত মার্চ করো, লাইন যেন সোজা থাকে।' সেই দীর্ঘদিনের, সেই ইসলামের ভালবাসা, সেই দৃঢ়চিত্ততা, সেই উদ্দীপনা তাদের চেহারা থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। তাদেরকে যখন আবু সুফিয়ান দেখলেন, তখন তার হৃদয় সম্পূর্ণরূপে অভিভূত হয়ে পড়লো। সে জিজ্ঞেস করলো,

'আব্বাস এরা কারা ?'

তিনি (রাঃ) বললেন, 'রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যাচ্ছেন আনসারদের ও মুহাজেরদের সেনাবাহিনী নিয়ে।'

আবু সুফিয়ান বললো, 'আজ পৃথিবীতে এমন শক্তি নেই যা এই সেনাবাহিনীকে প্রতিহত করতে পারে।'

সে হযরত আব্বাসকে সম্বোধন করে বললো, 'আব্বাস! তোমার ভাতিজা আজ পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা বড় বাদ্‌শাহ্।'

আব্বাস বললেন, 'এখনও তোমার হৃদয়ের চোখ খুলেনি। এতো বাদ্‌শাহাত নয়, এতো নবুওয়ত।'

আবু সুফিয়ান বললো, 'আরে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, নবুওয়তই মানলাম।'

এই সৈন্যবাহিনী এখন আবু সুফিয়ানের সামনে দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল, তখন আনসারদের কমান্ডার সায়দ বিন ওবাদা (রাঃ) আবু সুফিয়ানকে দেখতে পেয়ে বলে উঠলেন, 'আল্লাহ্ আজ তরবারির জোরে মক্কায় প্রবেশ করা আমাদের জন্য বৈধ করে দিয়েছেন। আজ কোরেশ জাতিকে লাঞ্ছিত করা হবে।'

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন আবু সুফিয়ানের পাশ দিয়ে অগ্রসর হয়ে যাচ্ছিলেন, তখন সে উচ্চৈঃস্বরে বলতে লাগলো,

> 'ইয়া রসূলাল্লাহ্! আপনি কি আজ আপনার জাতিকে হত্যা করার হুকুম দিয়েছেন? এই কথাই যে বলে গেল একটু আগে আনসার সর্দার সায়দ ও তার সঙ্গীরা। তারা তো জোর গলায় বলে গেল যে, 'আজ লড়াই হবে এবং মক্কার মর্যাদা আজ তাদেরকে যুদ্ধ করা থেকে বিরত রাখতে পারবে না। আজ তারা কোরেশদেরকে লাঞ্ছিত করেই ছাড়বে।'
>
> 'ইয়া রসূলাল্লাহ্। আপনি তো দুনিয়ার বুকে সবার উপরে পুণ্যময়, সব চাইতে বেশী দয়াময়, সর্বপেক্ষা বড় শান্তিস্থাপনকারী মানুষ। আপনি কি আজ আপনার জাতি অত্যাচার ভুলে যেতে পারেন না ?'

আবু সুফিয়ানের এই করুণ আবেদন শুনে মুহাজেরদের মনেও করুণার সঞ্চার হলো, যদিও একদা তাদেরকে মক্কার অলিতে গলিতে নির্মমভাবে প্রহার করা হয়েছিল; অত্যাচার করা হয়েছিল, এবং তাদেরকে তাদের ঘরবাড়ী থেকেও বিতাড়িত করা হয়েছিল, তাদের সহায় সম্পদ সব কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। তবু, তাঁরা বললেন,

'ইয়া রসূলাল্লাহ্! আনসাররা মক্কাবাসীদের অত্যাচারের সে সব কাহিনী শুনেছে, তার দরুন, জানিনা, ওরা আজ কোরেশদের সাথে কী ব্যবহার করে!'

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, 'আবু সুফিয়ান! সায়াদ যা বলেছে, তা ঠিক নয় আজ তো দয়ার দিন। আজ তো আল্লাহ্তায়ালা কোরেশ এবং খানা-এ-কাবাকে সম্মানিত করবেন।'

অতঃপর তিনি সায়াদকে (রাঃ) ডেকে আনালেন এবং তাঁকে বললেন, তোমার পতাকা তোমার ছেলে কায়েসের হাতে দাও। এখন তোমার জায়গায় সেই হবে আনসারদের কমাণ্ডার।* এইভাবে তিনি মক্কাবাসীদের হৃদয়ে স্বস্তিদান করলেন এবং আনসারদের মনে কষ্ট পাওয়া থেকে রক্ষা করলেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পূর্ণ আস্থা কায়েমের উপরে। কায়েস ছিলেন একজন খুব শরীফ নওজোয়ান; এমন শরীফ যে, ইতিহাসে লিখিত আছে, যখন কায়েসের মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হলো, তখন অনেকে তাঁর সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের জন্যে এলেন, বহুলোক এলো না। এতে তিনি তাঁর বন্ধুদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ব্যাপার কি, অনেকে তো আমার সঙ্গে শেষ দেখাটাও করতে এলো না। বন্ধুরা বললেন, 'আপনি তো আসলে খুব উদার হৃদয়ের মানুষ। দুঃখ দৈন্যে পড়ে বহুলোক আপনার কাছে টাকা-পয়সা কর্জ নিয়েছে। বহুলোক আপনার কাছে ঋণী। তারা এজন্যই আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসছে না পাছে আপনি আবার তাদের কাছে আপনার নিজ প্রয়োজনের সময় পাওনা টাকা চেয়ে বসেন।'

কায়েস বললেন, 'তাহলে তো আমি নিজেই আমার বন্ধুদেরকে দূরে রাখার কারণ। আহা! বন্ধুরা আমার! তারা বিনা কারণেই কষ্ট পাচ্ছে। তোমরা আমার পক্ষ থেকে সারা শহরে ঘোষণা করে দাও যে, কায়েস যাদের কাছে টাকা-পয়সা পেতো, সে তাদের প্রত্যেককেই মাফ করে দিয়েছে। এই ঘোষণার পর তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য এত লোক আসতে থাকলো যে, তাঁর ঘরের সিঁড়ি ভেঙ্গে পড়ে গেল।

সমগ্র সৈন্যবাহিনী যখন চলে গেল, তখন আব্বাস (রাঃ) আবু সুফিয়ানকে বললেন, 'এখন তুমি তোমার সওয়ারীতে চেপে মক্কায় ছুটে যাও এবং সেখানে লোকদেরকে বলে দাও যে, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এসে গেছেন এবং তিনি

---

* *আস্ সিরাতুল হালবিয়া: ৩য় খন্ড পৃষ্ঠা-৯৩*

এই এই অবস্থায় মক্কাবাসীদেরকে নিরাপত্তা দান করবেন। আবু সুফিয়ান এই ভেবে আনন্দিত হয়েছিলেন যে, তিনি মক্কাবাসীদের পরিত্রাণের একটা উপায় বের করতে পেরেছেন। কিন্তু স্ত্রী হিন্দা যে প্রথম থেকেই ইসলামের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করার জন্য অন্য সবাইকে বলতো ও উস্কানী দিতো, যে কাফের হওয়া সত্ত্বেও একজন তেজস্বীণি স্ত্রীলোক ছিল, সে এগিয়ে গিয়ে তার স্বামীর দাড়ী টেনে ধরলো এবং মক্কাবাসীদেরকে চীৎকার করে বলতে থাকলো, 'তোমরা সবাই আস, সবাই আস, এই বুড়া আহম্মকটাকে কতল করে ফেলো। সে কোথায় তোমাদেরকে বলবে, নিজেদের শহরের সম্মান রক্ষার জন্য যুদ্ধ করো, প্রয়োজন হলে জীবন দাও। তা না করে তোমাদেরকে শোনাচ্ছে কিনা নিরাপত্তার ঘোষণা।'

আবু সুফিয়ান তাকে বললেন, 'নাদান মেয়েলোক! এই কথা বলার সময় এটা নয়। ভালাই চাও তো, এখন নিজের ঘরে গিয়ে লুকাও। আমি নিজে ঐ সেনাবাহিনীকে দেখে এসেছি, যার মোকাবেলা করার ক্ষমতা সারা আরবের নেই।'

অতঃপর আবু সুফিয়ান উচ্চ আওয়াজে নিরাপত্তার শর্তগুলো প্রচার করতে লাগলেন এবং লোকেরা দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে নিজ নিজ ঘরের দিকে দৌড়াতে লাগলো। যাদের ক্ষেত্রে এই নিরাপত্তা প্রযোজ্য ছিল না, তাদের সংখ্যা ছিল পুরুষ এগার জন এবং নারী চার জন। যাদের বিরুদ্ধে অত্যাচারমূলক হত্যা ও ফ্যাসাদের প্রমাণিত অভিযোগ ছিল এবং তারা যুদ্ধাপরাধীও ছিল। এদের সঙ্গে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) -এর নির্দেশ ছিল যে, এদের মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। কেননা, এরা যে অবিশ্বাসের কারণে লড়াই করার অপরাধে অপরাধী ছিল তা নয় বরং এরা যুদ্ধাপরাধী ছিল।

এই পরিস্থিতিতে রসূলে করীম (সাঃ) খালেদবিন ওলীদ (রাঃ)কে কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'যতক্ষণ না কোন ব্যক্তি যুদ্ধ করে, তুমিও যুদ্ধ করতে পারবে না'। কিন্তু যে দিক দিয়ে খালেদ শহরে প্রবেশ করছিলেন, ঐ এলাকার লোকেরা তখনও পর্যন্ত নিরাপত্তার ঘোষণা শুনেনি। ঐ এলাকার সৈন্যদল খালেদের মোকাবেলা করার জন্য এগিয়ে এলো। সংঘর্ষে চব্বিশজন লোক নিহত হলো। কোন কোন বর্ণনামতে নিহতের সংখ্যা ছিল বার/তেরজন (হিশাম)। যেহেতু খালেদ (রাঃ) এর স্বভাব ছিল দারুণ তেজস্বী, সেহেতু এক ব্যক্তি দৌড়ে গিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)কে খবর দিল এবং এই আবেদন জানালো যে, খালেদকে থামানো হোক। নইলে সে আজ সকল মক্কাবাসীকেই মেরে ফেলবে। আঁ হযরত তৎক্ষণাৎ খলেদকে ডেকে পাঠালেন। খালেদ এলে তিনি তাঁকে বললেন, 'কেন, আমি কি তোমাকে বারণ করিনি যুদ্ধ করতে?'

খালেদ (রাঃ) বললেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্! আপনি বারণ তো করেছিলেন। কিন্তু ওরাই তো প্রথমে আমার উপরে হামলা চাললো। আমি অনেকক্ষণ ধরে নানাভাবে তাদেরকে থামাবার চেষ্টা করেছি এবং আমি তাদেরকে বার বার বলেছি যে, আমরা তোমাদেরকে আক্রমণ করতে আসিনি। তোমরা হামলা বন্ধ করো, তোমরা এমন করো না। কিন্তু যখন দেখলাম যে, তারা কিছুতেই নিরস্ত হচ্ছে না, তখন আমি বাধ্য হয়ে তাদের সঙ্গে লড়াই করেছি এবং আল্লাহ্ ওদেরকে চতুর্দিকে বিফল করে দিয়েছেন।'

যাহোক এই ঘটনাটি ছাড়া এ ধরনের আর কোনও ঘটনা ঘটেনি। মক্কানগরী পূরোপূরি মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দখলে এসে গেল। যখন মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মক্কায় প্রবেশ করলেন তখন শহরের লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলো,

'ইয়া রসূলাল্লাহ্! আপনি কি আপনার ঘরেই থাকবেন ?' তিনি (সাঃ) বললেন,

'আকেল (তাঁর চাচাতো ভাই) কি আমার জন্য কোনও ঘর রেখেছে। হিজরতের পর আমার সহায়-সম্পত্তি তো আমার আত্মীয়-স্বজনরা সব বেচে ছেঁচে শেষ করে দিয়েছে। এখন মক্কায় তো আমার ঠিকানা নেই।'

অতঃপর, তিনি বললেন, 'আমি খায়েফ বনী কেনানাতে থাকবো।' এই স্থান ছিল মক্কার একটি ময়দান। যেখানে কোরেশ এবং কেনানা গোত্র একত্রে মিলিত হয়ে শপথ গ্রহণ করেছিল, 'যতদিন বনু হাশেম ও বনু মুত্তালেব মুহাম্মদ (সাঃ) কে গ্রেফতার করে আমাদের হাতে সোপর্দ করবে না এবং তাকে পরিত্যাগ করবে না, ততদিন পর্যন্ত আমরা তাদের সঙ্গে কোন বিয়ে শাদী করবো না, বেচা-কেনা, লেনদেন করবো না।' এই শপথ গ্রহণের পর, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এবং তাঁর চাচা আবু তালিব এবং তাঁর (সাঃ) জামাতের সকল লোক আবু তালিব উপত্যকায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন এবং তিন বছর ধরে দুঃসহ দুঃখ যাতনা ভোগ করার পর খোদাতায়ালা তাঁদেরকে মুক্ত করেন।

এই স্থানটিকে আশ্রয়ের জন্য নির্ধারণ করাটা ছিল রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পক্ষে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। মক্কাবাসীরা এই স্থানেই শপথ গ্রহণ করেছিল যে, যতক্ষণ না মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্কে (সাঃ) তাদের হাতে সোপর্দ করা হবে, ততক্ষণ তারা তাঁর কবিলার সঙ্গে কোনপ্রকার সমঝোতা করবে না। আজ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সেই ময়দানেই এসে উপস্থিত হয়েছেন এবং যেন মক্কাবাসীদেরকে বলছেন, 'যেখানে তোমরা আমাকে চাচ্ছিলে, আমি সেখানেই এসে হাজির হয়েছি। কিন্তু

বলতো সত্যি করে যে, তোমাদের কি আজ সেই শক্তি আছে যার জোরে তোমরা আমাকে আজ তোমাদের সেইসব জুলুমের নিশানা বানাতে পার ? এই সেই স্থান যেখানে তোমরা আমাকে লঞ্ছিত করে ঘৃণ্য চেহারায় দেখতে চেয়েছিল এবং ইচ্ছা করেছিলে যে, আমার গোত্রের লোকেরা আমাকে গ্রেফতার করে তোমাদের হাতে তুলে দিবে। সেখানে আমি আজ এমন চেহরায় এসেছি যে, শুধু আমার গোত্রই নয়, বরং সারা আরব আজ আমার সাথে রয়েছে এবং আমার কওম তখন আমাকে তোমাদের হাতে সোপর্দ করেনি বরং আমার কওম আজ তোমাদেরকে সোপর্দ করে দিয়েছে আমার হাতে।'

আল্লাহ্তায়ালার কুদরতে ঐদিনটি ছিল সোমবার এবং এক সোমবারেই মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সওর গিরিগুহা থেকে বের হয়ে একমাত্র সঙ্গী আবু বকর (রাঃ) কে নিয়ে মদীনার পথে হিজরত করেছিলেন এবং এই সোমবারেই তিনি (সাঃ) সওর গিরিচূড়া থেকে মক্কার প্রতি তাকিয়ে বলেছিলেনঃ

'হে মক্কা! তুমি আমার কাছে দুনিয়ার সকল স্থানের চাইতে প্রিয়। কিন্তু তোমার অধিবাসীরা আমাকে এখানে থাকতে দিচ্ছে না।'

মক্কায় প্রবেশের সময় হযরত আবুবকর (রাঃ) রসূলে পাক (সাঃ)-এর উটনীর রেকাব ধরে তাঁর সাথে কথা বলতে বলতে অগ্রসর হচ্ছিলেন এবং সূরা ফাত্হ, যার মধ্যে মক্কা বিজয়ের খবর দেওয়া হয়েছিল, তা তেলাওয়াত করতে ছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সোজা কাবাঘরের দিকে গেলেন এবং উটনীর উপরে বসে থেকেই সাতবার কাবাঘর তওয়াফ করলেন। এই সময়ে তাঁর হাতে একটি ছড়ি ছিল। কাবাঘর যা নির্মাণ করেছিলেন নতুন করে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁর পুত্র হযরত ইসমাঈল (আঃ) এক আল্লাহর এবাদতের জন্য, তার ভেতরে প্রবেশ করলেন এবং সেখানে যে তিন শ' ষাটটি দেবতার মূর্তি স্থাপন করা ছিল, সেগুলোর একটার পর একটার উপরে ছড়ি মারতে মারতে ঘুরছিলেন এবং বলছিলেনঃ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿٨١﴾

এটি হচ্ছে কোরআন করীমের সেই আয়াত যা সূরা বনী ইসরাঈলে আঁ হযরত (সাঃ)-এর উপরে নাযিল হয়েছিল হিজরতে পূর্বে এবং এই সূরাতে দেওয়া হয়েছিল হিজরতের খবর ও মক্কা বিজয়ের খবর। ইউরোপীয়ান লেখকরাও এ বিষয়ে একমত যে, এই সূরা হিজরতের পূর্ববতী এবং এতে পূর্বেই বলা হয়েছিলঃ

وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا ﴿٨٠﴾
وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿٨١﴾

(সূরা বানী ইসরাঈল; আয়াত ৮১-৮২)

অর্থাৎ, তুমি বল, 'হে আমার প্রভু! আমাকে এই শহরে (মক্কাতে) মঙ্গলমত প্রবেশ করাইও হিজরতে পরে বিজয় ও প্রাধান্য দিয়ে; এবং এই শহর থেকে আমাকে মঙ্গলমত বের করিও হিজরতের সময়ে এবং তুমি তোমার পক্ষ থেকে আমাকে প্রাধান্য ও সাহায্যসহ সব প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রেরণ করিও।' এবং একথাও তুমি বল, 'সত্য এসেছে এবং বাতিল অর্থাৎ শিরক বা অংশীবাদিতা পরাজিত হয়ে দূরীভূত হয়ে গেছে এবং বাতিল বা শিরকের জন্য পরাজিত হওয়া তো সব সময়ের জন্যই নির্ধারিত হয়ে আছে।' এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হতে দেখে এবং সেই সঙ্গে আবুবকর (রাঃ)-কে সেই সব বাণী তেলাওয়াত করতে দেখে সে সময়ে মুসলমানদের এবং কাফেরদেরও মনে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, তা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। বস্তুতঃ ঐ দিনেই ইব্রাহীমের মোকাম পুনরায় এক আল্লাহ্‌র এবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হলো। যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হোবল দেবতার মূর্তির উপরে তাঁর ছড়ি দিয়ে আঘাত করলেন এবং মূর্তিটি পড়ে গিয়ে ভেঙ্গে গেল, তখন হযরত জোবায়ের (রাঃ) আবু সুফিয়ানের দিকে মুচকি হেসে তাকালেন এবং বললেন,

আবু সুফিয়ান, মনে আছে, ওহোদের দিনে যখন মুসলমানরা জখমে জখমে জর্জরিত হয়ে একদিকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন তুমি তোমাদের অহংকারে শ্লোগান দিয়েছিলে 'উলো হোবল! উলো হোবল!' (হোবলের মহিমা বুলন্দ হোক, হোবলের মহিমা বুলন্দ হোক) এবং তুমি সেদিন হোবলকে মুসলমানদের উপর বিজয়ী বলে ঘোষণা করেছিলে। আজ দেখতে পাচ্ছ, হোবল খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে সামনে পড়ে আছে?'

আবু সুফিয়ান বললেন, 'জোবায়ের, ছেড়ে দাও, এসব কথা! আমি ঠিকই দেখতে পাচ্ছি, যদি মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খোদা ছাড়া অন্য খোদা থাকতোই, তাহলে আমি আজ যা দেখতে পাচ্ছি, তা কখনই হতো না।'

অতঃপর আঁ হযরত (সাঃ) কাবাঘরের ভিতরে ইব্রাহীম (আঃ) ও অন্যান্য নবীগণের যে সকল ছবি ছিল, তা সবই মুছে ফেলার হুকুম দিলেন এবং কাবাঘরের ভিতরেই, খোদাতায়ালার প্রতিশ্রুতিসমূহ পূর্ণ হওয়ার জন্য, দু'রাকাত নামায পড়লেন। তারপর বাইরে এলেন এবং বাইরে এসেও দু'রাকাত নামায পড়লেন। কাবাঘরের ভিতরের ছবিগুলো মুছে ফেলার জন্য রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিয়োজিত করেছিলেন হযরত উমর (রঃ)কে। 'ইব্রাহীম (আঃ)কে তো আমরা নবী হিসেবে মানি'- এই ধারণার বশবর্তী হয়ে উমর (রাঃ) ইব্রাহীম (আঃ)-এর ছবিটি মুছলেন না; রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন দেখলেন যে, ছবিটি যথাস্থানেই আছে, তখন তিনি বললেন, 'উমর! তুমি এটা কি করেছ? খোদা কি একথা বলেননি যে,

مَا كَانَ إِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ۭ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝

ইব্রাহীম তো না ছিল ইহুদী, না নাসারা। বরং সে ছিল খোদাতায়ালার নিকটে একনিষ্ঠ আত্মসমর্পণকরী এবং খোদাতায়ালার সাকল্য সত্যতাকে মান্যকারী এবং খোদাতায়ালার একত্ববাদী বান্দা এবং সে মুশরেকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। *(সূরা আলে ইমরান: আয়াত ৬৮)*

অতএব তাঁর (সাঃ) নির্দেশ অনুযায়ী এই ছবিটিও মুছে ফেলা হলো।

খোদাতায়ালার নিদর্শনাবলী দেখে সেদিন মুসলমানদের হৃদয় এমনভাবে ভরপূর হয়ে উঠেছিল এবং মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উপরে তাদের ঈমান এমনভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছিল যে, রসূলে করীম (সাঃ) যখন যমযমের পানি চাইলেন (যমযম সেই প্রস্রবণ যা সৃষ্টি করে ছিলেন আল্লাহ্তায়ালা ইসমাঈল বিন ইব্রাহীম -আঃ- এর জন্য নিদর্শন স্বরূপ) এবং সেই পানি থেকে কিছুটা পান করে বাকী পানি দিয়ে ওযু করলেন, তখন তাঁর মুখমণ্ডল ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে এক ফোঁটা পানিও মাটিতে পড়তে পারেনি, মুসলমানরা সঙ্গে সঙ্গে সেই পানি তাবারকস্বরূপ হাত দিয়ে মুছে নিয়ে নিজেদের চোখেমুখে ও শরীরে লাগাচ্ছিল। তখন মুশরেকরা বলাবলি করছিল যে, আমরা পৃথিবীতে এমন কোন বাদশাহ্ দেখিনি যাঁর প্রতি তার লোকেরা এত বেশী ভালবাসা রাখে।

যখন তিনি (সাঃ) ঐসব কাজ থেকে অবসর হলেন এবং মক্কাবাসীদেরকে তাঁর সামনে হাযির করা হলো, তখন তিনি বলেলেন, 'হে মক্কাবাসীরা! তোমরা দেখেছ যে, খোদাতায়ালার নিদর্শনসমূহ কীভাবে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে। এখন তোমরা বলো তোমাদের সেই সব অত্যাচার ও দুষ্কর্মের কি প্রতিশোধ তোমাদেরকে দেওয়া দরকার, যা তোমরা করেছিলে এক-আল্লাহ্র এবাদতকারী তাঁর গরীব বান্দাদের প্রতি?'

মক্কাবাসীরা বললো, 'আমরা আপনার কাছে সেই ব্যবহারই আশা করি যা ইউসুফ করেছিলেন তাঁর ভাইদের প্রতি।'

এ খোদাতায়ালারই এক কুদরত ছিল যে, মক্কাবাসীদের মুখ থেকে সেকথাই বেরিয়ে এলো যার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন আল্লাহ্তায়ালা সূরা ইউসুফে। বহু পূর্বেই আল্লাহ্ তাঁর রসূলকে (সাঃ) মক্কা বিজয়ে দশ বছর পূর্বে বলে দিয়েছিলেন যে, তুমি মক্কাবাসীদের সঙ্গে ঠিক তেমন ব্যবহার করবে যেমন করেছিল ইউসুফ তার ভাইদের সঙ্গে। সুতরাং যখন মক্কাবাসীদের মুখ দিয়ে তার সত্যায়ন বা তসদীক করা হলো (রসূলে করীম-সাঃ-ছিলেন ইউসুফ-আঃ-এর এক মসীল বা সদৃশ) এবং যখন আল্লাহ্তায়ালা ইউসুফের মতই তাঁকে তাঁর ভাইদের উপরে বিজয় দান করলেন, তখন তিনি (সাঃ) ঘোষণা করলেন,

لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ

(সূরা ইউছুফ: আয়াত ৯৩)

'আল্লাহ্‌র কসম! আজ তোমাদেরকে না কোন শাস্তি দান করা হবে, না তোমাদের বিরুদ্ধে কোনও প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে।'

রসূলে করীম (সাঃ) যখন কাবাতে আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপক ইবাদতে মশগুল ছিলেন এবং যখন তিনি তাঁর স্বজাতির প্রতি ক্ষমার বাণী প্রচার করছিলেন, দয়া প্রদর্শন করছিলেন, তখন আনসারদের মন ছোট হয়ে যাচ্ছিল; তাদের মনে এই ভুল ধরণার সৃষ্টি হচ্ছিল এবং তাঁরা একে অপরকে ইশারা ইংগিতে বলছিলেন যে, হয়তো আজ আমরা আমাদের রসূলকে আমাদের কাছ থেকে পৃথক করে দিতে যাচ্ছি। কেননা, তাঁর শহরের বিজয় খোদাতায়ালা তাঁর হাতেই সম্পন্ন করেছেন এবং তাঁর স্বগোত্র তাঁর উপরে ঈমান এনেছে। ঠিক সেই সময় আল্লাহ্‌তায়ালা ওহীর মাধ্যমে মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্‌কে (সাঃ) আনসারদের মনের এই সন্দেহ সম্পর্কে অবহিত করলেন। তিনি তখন মাথা তুলে আনসারদের প্রতি তাকালেন এবং বললেন,

'হে আনসারগণ! তোমার মনে করছ যে, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্‌ এই শহরের ভালাবাসায় অভিভূত হয়ে পড়েছেন এবং তাঁর স্বজাতির প্রেম তাঁর হৃদয়কে আপ্লুত করে ফেলেছে।'

আনসাররা বললেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্‌! হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন, আমাদের মনে এইরূপ ধারণারই সৃষ্টি হয়েছে।'

আঁ হযরত (সাঃ) বললেন, 'তোমরা কি জান না, আমি কে? আমি তো আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রসূল। তাহলে, এটা কি করে হতে পারে যে, তোমরা যারা ইসলামের অসহায় অবস্থার সময়ে নিজেদের জীবনের কোরবানী দিয়েছ, তাদেরকে ছেড়ে আমি অন্য কোথাও চলে যাব ?'

তিনি আরও বললেন, 'হে আনসাররা! এটা কখনই হতে পারে না। আমি আল্লাহ্‌র বান্দা এবং তাঁর রসূল। আমি আল্লাহ্‌র জন্যই নিজের মাতৃভূমি ছেড়ে চলে গেছি। অতঃপর, আমি কোনমতেই আমার মাতৃভূমিতে ফিরে আসতে পারি না। আমার জীবন তোমাদের জীবনের সঙ্গে এবং আমার মৃত্যু তোমাদের মৃত্যুর সঙ্গে গাঁথা রয়েছে।'

মদীনাবাসীরা আঁ হযরত (সাঃ)-এর এই কথা শুনে এবং তাঁর ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা দেখে তারা কাঁদতে কাঁদতে এগিয়ে এলো এবং বললো, 'ইয়া রসূলুল্লাহ্‌! আল্লাহ্‌র কসম! আমরা আল্লাহ্‌ এবং আল্লাহ্‌র রসূলের উপরে কুধারণা পোষণ করে ফেলেছি কেননা, আমাদের প্রাণ এটা কিছুতেই বরদাস্ত করতে

পারছিল না যে, আল্লাহ্‌র রসূল আমাদেরকে এবং আমাদের শহরকে ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যান।'

আঁ হযরত (সাঃ) বললেন, 'আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল তোমাদেরকে নির্দোষ মনে করছেন এবং তোমাদের আন্তরিকতার সত্যায়ন করছেন।'

যখন মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এবং মদীনার লোকদের মধ্যে ভালবাসাপূর্ণ এইসব কথাবার্তা হচ্ছিল, তখন মক্কাবাসীদের চোখ থেকে হয়তো দৃশ্যতঃ অশ্রু ঝরল না, কিন্তু তাদের হৃদয়ের অশ্রু অবশ্যই ঝরছিল। কেননা, যে মহামূল্য হীরা, যার চাইতে অধিক মূল্যবান পৃথিবীতে আর কিছু পয়দা হয়নি, যা খোদা তাদেরকে দিয়েছিলেন, তা তারা নিজেরা নিজেদের ঘর থেকে বের করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে এবং খোদাতায়ালার কৃপায় এবং তাঁর সাহায্যে দ্বিতীয়বারে মক্কায় এসেছিল, কিন্তু তার নিজের কৃতজ্ঞতার অঙ্গীকারের কারণে নিজের ইচ্ছায় এবং খুশীতে মক্কা ছেড়ে মদীনায় ফিরে যাচ্ছে।

যে কয়জন লোক সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) রায় * দিয়েছিলেন যে, তাদের অত্যাচারমূলক হত্যাকাণ্ড এবং নানাবিধ জুলুম ও নির্যাতনের অপরাধের দরুন তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে, তাদেরও অনেককেই তিনি কোন কোন মসলমানদের সুপারিশের কারণে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। ক্ষমাপ্রাপ্তদের মধ্যে একজন ছিল আবু জাহলের পুত্র একরামা। একরামার স্ত্রী মনে মনে মুসলমান হয়েছিল। সে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে আবেদন করল, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্! একরামাকেও কি আপনি ক্ষমা করে দিয়েছেন?' রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, 'হ্যাঁ, আমি ওকে মাফ করে দিয়েছি।'

একরামা তখন ইয়েমেনের দিকে পালিয়ে যাচ্ছিল। তার স্ত্রী তার প্রতি ভালবাসার দরুন তার পিছনে পিছনে তাঁর খোঁজে বের হয়ে গেল। যখন সে সমুদ্রগামী জাহাজে উঠে পড়েছে এবং আরবকে চিরদিনের জন্য ছেড়ে চলেছে, তখন পলাতক সেই সর্দারের স্ত্রী পেরেশান হয়ে তার নিকটে পৌঁছল এবং বললো, 'হে আমার চাচার পুত্র! (আরব স্ত্রীলোকেরা তাদের স্বামীদেরকে চাচার পুত্র বলে সম্বোধন করতো)। তুমি অত ভাল এবং অত দয়ালু মানুষটিকে ছেড়ে কোথায় যাচ্ছ।' একরামা বিস্মিত হয়ে তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলো, 'বলো কি? আমার এতসব শত্রুতার পরেও কি মুহাম্মদ (সাঃ) আমাকে ক্ষমা করে দিবেন?' একরামার স্ত্রী বললো, 'হ্যাঁ, আমি তাঁর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছি এবং তিনি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।' সে যখন ফিরে এসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে

---

* *যুরকানী: ২য় খন্ড, ও আস্ সিরাতুল হালবিয়া: ৩য় খন্ড*

উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলো, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমার স্ত্রী বলছে যে, আপনি নাকি আমার মত একটা লোককেও ক্ষমা করে দিয়েছেন?' আঁ হযরত (সাঃ) বললেন, 'তোমার স্ত্রী ঠিকই বলেছে। আমি তোমাকে মাফ করে দিয়েছি।'

'একরামা বলে উঠলো' 'যে ব্যক্তি এমন ঘোরশত্রুকে মাফ করতে পারে, সে কখনও মিথ্যা হতে পার না।' আমি সাক্ষ্যদান করছি যে, আল্লাহ্ এক তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্যদান করছি, হে মুহাম্মদ (সাঃ)! তুমি তাঁর বান্দা এবং তাঁর রসূল।'

অতঃপর, সে লজ্জায় এত বেশী মাথা নীচু করে ফেললো যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তার এই লজ্জিত অবস্থা দেখে তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বললেন, 'একরামা আমি শুধু তোমাকে ক্ষমাই করছি না, তুমি আজ আমার কাছে যা চাইবে, আমি তাই তোমাকে দিব, যদি তা দেওয়ার ক্ষমতা আমার থাকে।'

একরামা বললেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্! ইয়া রসূলাল্লাহ্! এর বেশী আমি কি চাইতে পারি। আপনি আল্লাহ্তায়ালার কাছে দোয়া করুন, আমি যে শত্রুতা করেছি আপনার সাথে, তা যেন আল্লাহ্ মাফ করে দেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আল্লাহ্তায়ালকে সম্বোধন করে বললেন,

'হে আমার আল্লাহ্! সেই সমস্ত শত্রুতা যা একরামা আমার বিরুদ্ধে করেছে, তা তুমি মাফ করে দাও এবং যে সমস্ত গালিগালাজ তার মুখ থেকে বের হয়েছিল, তার জন্যেও তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও।'

এরপর, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) উঠলেন এবং তাঁর নিজের গায়ের চাদর নিয়ে তা একরামার গায়ে জড়িয়ে দিলেন এবং বললেন,

'যখন, কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র উপরে ঈমান এনে আমার কাছে চায় তখন আমার ঘর তার ঘর হয়ে যায় এবং আমার জায়গা তার জায়গা হয়ে যায়।'

একরামার ঈমান আনার মাধ্যমে সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হলো যার বিবরণ দিয়েছিলেন মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সাহাবীদের কাছে। তিনি বলেছিলেন, 'আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি বেহেশ্তে আছি এবং সেখানে আঙ্গুরের একটা থোকা দেখলাম এবং লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কার জন্য ? তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বললো, 'আবু জাহলের জন্য'। তার কথা আমাকে অবাক করলো। আমি বললাম, 'বেহেশ্তে তো মুমিন ছাড়া কেউ প্রবেশ করতে পারে না। বেহেশ্তের মধ্যে আবু জাহলের জন্য আঙ্গুর দেওয়া হলো কি করে ?'

একরামা ঈমান আনলে পর, তিনি ঐ স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বললেন, 'আসলে, ঐ আঙ্গুর গুচ্ছ ছিল একরামার জন্যে। খোদাতায়ালা ছেলের জায়গায় বাপের নাম প্রকাশ করেছিলেন এবং স্বপ্নে, অনেক সময় ঘটনাকে এভাবেও প্রকাশ করা হয়।'*

যে কয়জন লোকের প্রতি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়েছিল, তাদের মধ্যে সে ব্যক্তিও ছিল যে রসূলে করীম (সাঃ)-এর মেয়ে হযরত জয়নব (রাঃ)এর মর্মান্তিক মৃত্যুর জন্য দায়ী ছিল। ঐ ব্যক্তির নাম ছিল, হাব্বার।

সে হযরত জয়নবের (রাঃ) উটের বেল্ট কেটে দিয়েছিল। ফলে তিনি (রাঃ) উটের পিঠ থেকে নীচে পড়ে গিয়েছিলেন এবং তাতে তাঁর গর্ভপাত ঘটেছিল, যার ফলে দিন কয়েকের মধ্যেই তিনি মারা যান। এছাড়াও, সে আরো অনেক মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ করেছিল। ঐ ব্যক্তিও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিকটে উপস্থিত হলো এবং বললোঃ

'হে আল্লাহ্‌র নবী! আমি আপনার কাছ থেকে পালিয়ে ইরানের দিকে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমি চিন্তা করে দেখলাম যে, আল্লাহ্‌তালা তাঁর নবীর মাধ্যমে আমাদের শিরকের ধারণা দূর করে দিয়েছেন এবং আমাদেরকে আধ্যাত্মিক ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। আমি অপর দেশের লোকদের কাছে যাওয়ার বদলে তাঁর কাছেই কেন ফিরে যাই না এবং নিজের পাপের কথা স্বীকার করে কেন তাঁর কাছে ক্ষমা চাই না।'

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেনঃ

'খোদা যখন তোমার হৃদয়ে ইসলামের ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন, তখন আমি কেন তোমার অপরাধ ক্ষমা করব না? যাও, আমি তোমাকে মাফ করে দিলাম। ইসলাম তোমার পূর্বের সকল পাপ মুছে ফেলেছে।'

এখানে এতটা সুযোগ নেই যে, আমি এই রচনাকে দীর্ঘ করি। নয়তো, এমন সব ভয়ানক অপরাধীকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) অতি সামান্য ওসিলাতেই ক্ষমা করে দিয়েছেন, যাদের অপরাধের ঘটনা ছিল বর্ণনাতীতভাবে হৃদয় বিদারক এবং তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দয়াশীলতা এমনভাবে প্রকাশিত হয়েছে যে, তাঁর দয়া দেখে যে কোন কঠিন হৃদয়ের মানুষও প্রভাবিত না হয়ে পারে না।

---

* *আস্ সিরাতুল হালবিয়া: ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১০৪*

হোনায়েনের যুদ্ধ

হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর মক্কায় প্রবেশ যেহেতু আকস্মিকভাবেই হয়ে ছিল বলা যায়, সেহেতু মক্কা থেকে কিছু দূরবর্তী কবিলাগুলো, বিশেষ করে যারা দক্ষিণে বসবাস করতো, তারা মক্কার উপরে আক্রমণের খবর পেয়েছিল তখন, যখন তিনি (সাঃ) মক্কায় প্রবেশ করে গেছেন। এই খবর শোনা মাত্রই তারা তাদের সেনাবাহিনী গঠন করা শুরু করে দিল। এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলো। হাওয়াযিন এবং সাকীফ নামক আরবের দু'টি গোত্র নিজেদেরকে খুব বাহাদুর মনে করতো। তারা তৎক্ষণাৎ নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে মালেক ইবনে আওফ নামক এক ব্যক্তিকে তাদের নেতা মনোনীত করলো। অতঃপর তারা পার্শবর্তী গোত্রগুলোকেও আহ্বান জানালো যে, তারা যেন এসে তাদের সঙ্গে যোগদান করে। এই কবিলাগুলোর মধ্যে একটি কবিলা ছিল বনু সায়াদ বিন কবীর। রসূলে করীম (সাঃ)-এর ধাত্রী হালিমা ছিলেন এই কবিলার। রসূলে করীম (সাঃ) বাল্যকাল এই কবিলার মধ্যেই অতিবাহিত হয়েছিল। এইসব কবিলা সম্মিলিতভাবে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা দিল। এবং এরা সকলেই তাদের মাল-সম্পদ ও স্ত্রী পুত্র কন্যাদেরকেও সঙ্গে নিল। তারা এটা এই জন্য করেছিল যে, সৈন্যরা যেন মনে রাখে যে, যদি তারা পলায়ন করে তাহলে তাদের বিবি-বাচ্চারা বন্দী হয়ে যাবে, এবং তাদের মাল-সম্পদ লুট হয়ে যাবে। এথেকে বুঝা যায় যে, তারা কতটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে যুদ্ধে যাত্রা করেছিল মুসলমানদেরকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে।

অবশেষে এই সেনাবাহিনী 'আওতাস' নামক উপত্যকায় এসে উপনীত হলো। এই উপত্যকাটি যুদ্ধ করার জন্য একটা উপযুক্ত ক্ষেত্র ছিল। কেননা, এখানে আশ্রয় গ্রহণ করার মত জায়গাও ছিল, পশুচারণের প্রান্তরও ছিল। মানুষের জন্য পানীয় জলও যথেষ্ট ছিল। এবং ঘোড় দৌড়ের উপযোগী প্রশস্ত ময়দানও ছিল। রসূলে করীম (সাঃ) যখন, তাদের সংবাদ পেলেন, তখন তিনি আব্দুল্লাহ্ বিন আবি হদ্‌রদ (রাঃ) নামক জনৈক সাহাবীকে পাঠিয়ে দিলেন সঠিক খবরাদি সংগ্রহের জন্য। আব্দুল্লাহ্ ফিরে এসে জানালেন যে, সত্যসত্যই তারা সেনাবাহিনী জমায়েত করেছে। এবং তারা মরণপণ যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছে। ঐ গোত্রটি খুব দক্ষ তীরন্দাজ। এবং ওরা যে স্থানে শিবির স্থাপন করেছে সেই স্থানটি এমন যে, সেখানে মাত্র একটা সীমিত জায়গার মধ্যেই যুদ্ধ পরিচালনা করা সম্ভব, এবং সেই জায়গাটাও আবার এমন খোলামেলা যে, সেখানে অবস্থানরত লোকদের উপরে শত্রুপক্ষ সহজেই তীর বর্ষণ করতে পারবে।

রসূলে করীম (সাঃ) এই যুদ্ধের জন্য মক্কার একজন ধনী ব্যবসায়ী সর্দার সাফওয়ানের কাছে অস্ত্রশস্ত্র এবং কিছু টাকা কর্জ চাইলেন। সাফওয়ান বললো, 'মুহাম্মদ! (সাঃ) আপনি কি নিজের শাসন ক্ষমতার বলে আমার মাল ছিনিয়ে নিতে চাচ্ছেন?'

আঁ হযরত (সাঃ) বললেন, 'না, আমি ছিনিয়ে নিতে চাচ্ছি না, বরং হাওলাত চাচ্ছি তোমার কাছে। এ জন্য আমি জামানত দিতেও রাজি আছি।' সে বললো, 'তাহলে আর আমার কোন আপত্তি নেই, আপনি এসব যুদ্ধ-সামগ্রী নিতে পারেন আমার কাছ থেকে।' এবং সে প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে কর্জ স্বরূপ দিয়ে দিল। এছাড়া সে তিন হাজার দীনারও ধার দিল। একইভাবে তিনি (সাঃ) তাঁর চাচাতো ভাই নওফেল বিন হারিসের কাছ থেকেও তিন হাজার টাকা হাওলাত নিলেন। এই সেনাবাহিনী যখন হাওয়াযিন গোত্রের দিকে রওয়ানা হলো, তখন মক্কাবাসীরা তাদের ইচ্ছা প্রকাশ করে বললো, 'যদিও আমরা মুসলমান নই, তবু আমরা যেহেতু ইসলামী হুকুমতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছি, সেহেতু আমাদেরকেও যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ দেওয়া হোক।' অতএব, তাদেরও দু'হাজার লোক মক্কা থেকে আঁ হযরত (সাঃ)-এর সঙ্গে রওয়ানা দিল।

পথিমধ্যে আরবদের একটা প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান 'যেয়ারতগাহ্' ছিল যাকে বলা হতো 'যাতে আসওয়াত।' এখানে একটা খুব প্রাচীন বরুই গাছ ছিল। গাছটিকে আরবের লোকেরা খুব বরকতময় মনে করতো। এবং আরবের কোন বীরপুরুষ যখন কোন অস্ত্র খরিদ করতো, তখন প্রথমে সে 'যাতে আসওয়াতে' গিয়ে ঐ অস্ত্র সেখানে ঐ গাছে লটকিয়ে দিত, যেন তা বরকতমণ্ডিত হতে পারে। সাহাবারা (রাঃ) যখন ঐস্থান অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন, তখন কেউ কেউ বললেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমাদের জন্যেও আপনি একটা 'যাতে আসওয়াত' নির্দিষ্ট করে দিন।'

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, 'আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ। এটা তো সেই মূসার জাতির মতই কথা হলো। তারা যখন কেনানের দিকে রওয়ানা হয়ে এসে কেনানের গোত্রগুলোকে মূর্তিপূজা করতে দেখলো, তখন তারা মূসাকে (সাঃ) বলেছিল ঃ

قَالُوْا يٰمُوْسَى اجْعَلْ لَّنَآ اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ

'হে মূসা! এদের যে রকম উপাস্য আছে, তেমন আমাদেরও একটা উপাস্য ঠিক করে দাও।' *(সূরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১৩৯)*

তিনি (সাঃ) আরও বললেন, 'এতো অজ্ঞতার কথা। আমার ভয় হচ্ছে, পাছে না এই ধরনের বাজে আকাংখার দরুন তোমাদের মধ্য থেকেও একটা দল এইসব কুকীর্তি শুরু করে দেয়।'

হাওয়াযিন এবং তাদের মিত্র কবিলাগুলো মুসলমানদের বিরুদ্ধে অতর্কিতে আক্রমণ পরিচালনার সুবিধার্থে কতকগুলো গোপন ফাঁড়ি বা এ্যাম্বুশ তৈরী করলো এবং আধুনিক যুদ্ধের অনুরূপ ট্রেঞ্চ ইত্যাদিও তৈরী করলো। যখন ইসলামী সৈন্যদলগুলো হোনায়েনে পৌঁছল। তখন তাদেরকে সামনে রেখে শত্রুপক্ষ ছোট ছোট গড় বা দেয়াল তৈরী করে সেগুলোর আড়ালে আড়ালে অবস্থান গ্রহণ করলো। এবং সেগুলোর মধ্য দিয়ে একটিমাত্র সরু রাস্তা রেখে দিল মুসলমানদের চলাচলের জন্য। তাদের অধিকাংশ সৈন্যই উক্ত কৌশল অবলম্বন করে আড়ালেই অবস্থান গ্রহণ করলো। বাকী সৈন্যদের অনেকেই উট ও ঘোড়ার উপরে সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হয়ে গেল। মুসলমানরা শুধু সামনে অবস্থানরত সৈন্যদেরকেই গোটা সৈন্যবাহিনী মনে করে তাদের উপরে আক্রমণ চালানোর উদ্দেশ্যে এগিয়ে গেল। এবং যখন শত্রুপক্ষের গোপনে লুকিয়ে থাকা সৈন্যরা দেখলো যে, তারা এখন সহজেই আক্রমণ চালাতে পারে, তখন সম্মুখভাবে দণ্ডায়মান সৈন্যরা আক্রমণ করে বসলো এবং পিছন থেকে তীরন্দাজ সৈন্যদল অজস্র তীর বর্ষণ শুরু করে দিল। মক্কার যে লোকেরা এই মনে করে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল যে, এবারে তারাও সুযোগমত তাদের বাহাদুরী প্রদর্শন করবে, তারা ঐ দ্বিমুখী হামলা বরদাস্ত করতে পারলো না। ফলে, তারা মক্কা অভিমুখে পালাতে শুরু করলো। মুসলমানদের অবশ্য, এই ধরনের বিপদ মোকাবেলা করার অভিজ্ঞতা ছিল। কিন্তু, মক্কাবাসীদের দু'হাজার লোক যখন তাদের উট ও ঘোড়াগুলিসহ লাইন ভেঙ্গে বিশৃঙ্খলভাবে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাতে লাগলো, তখন মুসলমানদের উট ও ঘোড়াগুলিও ভয় পেয়ে গেল এবং সেগুলিও পশ্চাদমুখী হয়ে বিশৃঙ্খলভাবে দৌড়াতে শুরু করলো। তিন দিকের আক্রমণের মুখে তখন কেবল রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এবং মাত্র বারজন সাহাবী (রাঃ) যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে রইলেন। তবে, এর অর্থ এই নয় যে, সাহাবীরা সবাই পালিয়ে গিয়েছিলেন। বরং তখনও প্রায় একশ' জন সাহাবী যুদ্ধ ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে ছিলেন, কিন্তু তাঁরা মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছ থেকে দূরে দূরে ছিলেন। আঁ হযরত (সাঃ)-এর কাছাকাছি ছিলেন মাত্র ডজন খানেক সাহাবী (রাঃ)। এই ঘটনার বর্ণনা করতে গিয়ে একজন সাহাবী বলেছেন ঃ

> 'আমি এবং আমার সাথী প্রাণপণ চেষ্টা করছিলাম আমাদের ঘোড়া ও উটকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে ফিরিয়ে আনার জন্যে। কিন্তু দু'হাজার সৈন্যের ঘোড়া ও উটের পলায়নপর পরিস্থিতিতে সেগুলো এমনভাবে ভড়কে ও বিগড়ে গিয়েছিল যে, লাগাম টানতে টানতে আমাদের হাত কেটে-ছিঁড়ে জখম হয়ে যাচ্ছিল, তবু কিছুতেই ঘোড়া ও উটগুলোকে ফেরানো যাচ্ছিল না। কখনও কখনও আমরা এত জোর লাগাম টানছিলাম যে, সেগুলোর মাথা

উল্টে গিয়ে পিঠে এসে ঠেকছিল। কিন্তু যখই আমরা সেগুলোকে এড়ী মারতাম তখনই সেগুলো যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে পিছন ফিরে আরও জোরে দৌড়াতে শুরু করতো। তখন এই ভয়ে আমাদের হৃদয় কাঁপছিল যে, পিছনে না জানি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর অবস্থা কী হয়েছে! কিন্তু আমরা কিছুই করে উঠতে পারছিলাম না।

একদিকে তো সাহাবাদের এই অবস্থা ছিল, অপরদিকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মাত্র কয়েকজন সঙ্গীসহ যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়েছিলেন এবং তাঁর ডানে, বামে, পিছনে, তিন দিক থেকেই তীর বর্ষিত হচ্ছিল; এবং পিছনের দিকে ছিল মাত্র একটি সরু রাস্তা, যে রাস্তা দিয়ে একসঙ্গে মাত্র কয়েকজন লোকই চলতে পারে, এবং এছাড়া অন্য আর কোন রাস্তাও ছিল না যার মধ্য দিয়ে পার হওয়া সম্ভব।

সেই সময় হযরত আবুবকর (রাঃ) তাঁর নিজের সওয়ারী থেকে নেমে এসে আঁ হযরত (সাঃ)-এর খচ্চরের বেল্ট ধরলেন, এবং আবেদন জানালেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্! কিছুক্ষণের জন্য একটুখানি পিছনে সরে আসুন। ততক্ষণ, ইসলামী সৈন্যদলগুলো পুনরায় একত্রে জমা হয়ে যাক।' আঁ হযরত (সাঃ) বললেন, 'আবুবকর! আমার খচ্চরের বেল্ট ছেড়ে দাও'! এই কথা বলেই তিনি তাঁর খচ্চরকে এড়ী মারলেন এবং এ সরু রাস্তা দিয়েই অগ্রসর হতে লাগলেন। তখন, ডান বাম সব দিক থেকেই আড়ালে অবস্থান গ্রহণকারী শত্রুসৈন্যরা তীর বর্ষণ করে চলছিল। তিনি (সাঃ) ঘোষণা করতে লাগলেনঃ

انا النبي لا كذب ؛ انا ابن عبد المطلب

'আমি নবী, মিথ্যাবাদী নই। আমি আব্দুল মুত্তালিবের পৌত্র।'

অর্থাৎ, আমি খোদাতায়ালার নবী, আমি মিথ্যাবাদী নই। কিন্তু, একথাও মনে রেখো যে, এ সময়ে শত্রুসৈন্যদের আক্রমণের মধ্যে পড়েও আমি যে সুরক্ষিত আছি, এর অর্থ এই নয় যে, আমার মধ্যে কোনও খোদায়ী আছে। বরং আমি একজন মানুষই এবং আমি আব্দুল মুত্তালিবের নাতি।

অতঃপর তিনি হযরত আব্বাসকে (রাঃ) ডাকলেন। হযরত আব্বাসের গলার আওয়াজ ছিল খুবই জোরালো ও গম্ভীর। তাঁকে আঁ হযরত (সাঃ) বললেন, 'খুব উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিয়ে বলো, হে ঐ সকল সাহাবারা, তোমরা যারা হোদায়বিয়াতে বৃক্ষের নীচে বয়াত করেছিলে, এবং হে ঐ সকল লোকেরা, তোমরা যারা সূরা বাকারার আমল থেকেই মুসলমান, তোমাদের আল্লাহ্‌র রসূল ডাক দিচ্ছেন।'

হযরত আব্বাস যখন অতি উচ্চৈঃস্বরে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর এই আহ্বান শোনালেন, তখন সাহাবাদেরকে কী অবস্থা হয়েছিল, তা কেবল তারই মুখে শুনে অনুমান করা সম্ভব, যিনি সে সময়ে উপস্থিত ছিলেন সেখানে। সেই সাহাবী (রাঃ) যাঁর উল্লেখ একটু আগে করা হয়েছে, তিনি বলেছেনঃ 'আমরা উটগুলোকে এবং ঘোড়াগুলোকে ফেরাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছিলাম, এমন সময়, আব্বাসের ডাক আমাদের কানে পৌঁছলো। তখন আমাদের মনে হয়েছিল যে, আমরা এই দুনিয়াতে নেই, আমরা কেয়ামতের দিনে আল্লাহ্র সম্মুখে দণ্ডায়মান এবং তাঁর ফেরেশ্তারা আমাদেরকে হিসাব দেওয়ার জন্য ডাকছেন। তখন আমাদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেদের তরবারি ও ঢাল হাতে উট থেকে লাফিয়ে পড়ে, এবং ভীত উটগুলোকে যেদিকে খুশী চলে যাওয়ার জন্য ছেড়ে দেয়। এবং কেউ কেউ নিজেদের তরবারি দিয়ে উটের গর্দান কেটে ফেলে। এবং সবাই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দিকে দৌড়াতে থাকে।'

ঐ সাহাবী (রাঃ) আরও বলেছেন, 'যেভাবে উটনী বা গাভী তার হারিয়ে যাওয়া বাচ্চার ডাক শুনে সেইদিকে দৌড়াতে থাকে, ঠিক তেমনি ভাবেই সেদিন আনসাররা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দিকে দৌড়ায়ে যাচ্ছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সাহাবীগণ, বিশেষ করে, আনসাররা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর চারিপাশে সমবেত হয়ে গেলেন। অতঃপর শত্রু পরাজিত হলো।'

মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পবিত্র করণ শক্তির একটি নিদর্শন হচ্ছে এই যে, সেই ব্যক্তি যে দিনকয়েক পূর্বেই তাঁর জানের দুশমন ছিল, এবং যুদ্ধে তাঁর বিরুদ্ধে কাফের সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিল, সেই আবু সুফিয়ানও সেদিন হোনায়েনের ময়দানে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সঙ্গে ছিলেন। যখন মক্কার কাফেরদের উট ও ঘোড়াগুলো পিছন ফিরে দৌড়াচ্ছিল, তখন আবু সুফিয়ান যিনি একজন খুব হোঁশিয়ার ও অভিজ্ঞ জেনারেল ছিলেন, তিনি উপলব্ধি করলেন যে, তাঁর ঘোড়াও ভয় পেয়ে ছুটতে থাকবে। কাজেই, তিনি তৎক্ষণাৎ ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়লেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খচ্চরের রেকাব বা বেল্ট ধরে তাঁর (সাঃ) সঙ্গে সঙ্গে হাটতে থাকলেন। আবু সুফিয়ান বলেছেনঃ

> 'ঐ সময় নাঙ্গা তলোয়ার ছিল আমার হাতে। এবং সেই আল্লাহ্র কসম! যিনি অন্তরের কথা জানেন, আমি এমন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হয়ে মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খচ্চরের পাশে খাড়া ছিলাম যে, আমাকে হত্যা না করে কারো সাধ্য ছিল না রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে পৌঁছে। এ সময় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) অবাক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন। হয়তো তিনি ভাবছিলেন যে, আজ থেকে মাত্র দশ/পনের দিন আগে

এই ব্যক্তি আমাকে কতল করার জন্য সেনাবাহিনী নিয়ে মক্কা থেকে বের হতে যাচ্ছিল, কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই খোদাতায়ালা তার হৃদয়ে এমন পরিবর্তন এনে দিয়েছেন যে, মক্কার সেই সেনাপতি আজ একজন সাধারণ সৈনিকের মত আমার বাহনের রশি ধরে খাড়া হয়ে আছে। এবং তার চেহারা একথা বলে দিচ্ছে যে, সে আজ মৃত্যুবরণ করে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে।'

আব্বাস (রাঃ) যখন দেখলেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) অবাক বিস্ময়ে আবু সুফিয়ানের দিকে তাকিয়ে আছেন, তখন তিনি বললেন,

'ইয়া রসূলাল্লাহ্! এতো আবু সুফিয়ান আপনার চাচার ছেলে আপনার ভাই। আজ তো আপনি ওর উপরে খুশী হবেন।'

আঁ হযরত (সাঃ) বললেন, 'আল্লাহ্ তার সমস্ত শত্রুতা মাফ করুন, যে শত্রুতা সে আমার সাথে করেছে'।

আবু সুফিয়ান বলছেন, ঐ সময় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাকে সম্বোধন করে যখন বললেন, 'হে ভাই! তখন আমি আমার ভালবাসা এবং আবেগে তাঁর যে পা খচ্চরের রেকাবে ছিল, তাতে চুমু দিয়ে বসলাম।' - (হালবিয়া)।

হোনায়েনের বিজয়ের পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ঐ সকল যুদ্ধ-সরঞ্জাম যা তিনি কর্জ স্বরূপ নিয়েছিলেন, তা সবই ফেরৎ দিলেন সেগুলোর মালিকদের কাছে। এবং সেই সঙ্গে তাদেরকে অনেক পুরস্কারও দিলেন। তখন ঐ লোকগুলির মনে হলো যে, এই ব্যক্তি সাধারণ মানুষ নয় এমন কি, সাফওয়ান মুসলমান হয়ে গেলেন।

এই যুদ্ধের একটা আশ্চর্য ঘটনার বর্ণনা এসেছে ইতিহাসে। শায়বা নামক মক্কার একটি লোক, যে কাবাঘরের একজন খাদেম ছিল, সে বলছেঃ

'আমিও এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু, আমার উদ্দেশ্য ছিল, যখন উভয় সেনাবাহিনী সংঘর্ষে লিপ্ত হবে, তখন আমি মওকা বুঝে মুহাম্মদ (সাঃ)-কে কতল করে ফেলবো। আমি মনে মনে ঠিক করেছি যে, আরব ও অনারব তো দূরের কথা সারা পৃথিবীর সব লোক যদি মুহাম্মাদের (সাঃ) ধর্ম গ্রহণ করে, তবু আমি করবো না। যখন যুদ্ধ খুব জোরে শুরু হলো, এবং এদিকের লোক ওদিকের লোকের সঙ্গে একাকার হয়ে গেল, তখন আমি শক্ত হাতে তরবারি ধরলাম এবং

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করতে থাকলাম সেই সময়, আমার মনে হলো, আমার এবং তাঁর (সাঃ) মাঝখানে একটা আগুনের কুণ্ডলী উঠছে এবং তা এত কাছে এসে পড়েছে যে, আমাকে এক্ষুণি ভস্ম করে ফেলবে। ঠিক তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আওয়াজ শুনতে পেলাম, 'শায়বা, আমার কাছে আস।' যখন আমি তাঁর কাছে গেলাম, তখন তিনি আমার বুকে হাত রেখে বললেন, 'হে আল্লাহ্! শায়বাকে শয়তানী চিন্তা থেকে মুক্তি দাও!'

শায়বা বলছেনঃ

'রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হাত রাখার সঙ্গে সঙ্গেই আমার হৃদয় থেকে সকল শত্রুতা ও বিদ্বেষ উড়ে গেল। এবং তখন থেকেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমার কাছে আমার চোখের চাইতে; আমার কানের চাইতে, আমার প্রাণের চাইতে বেশী প্রিয় হয়ে আছেন।' তিনি আমাকে বললেন, 'শায়বা আগে বাড় এবং লড়াই করো। তখন আমি আগে বাড়লাম এবং সে সময় আমার প্রাণে এই ছাড়া আর কিছু ছিল না যে, আমি নিজের প্রাণ দিয়ে হলেও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বাঁচাব। সেই সময় যদি আমার বাপ জীবিত থাকতেন এবং আমার সামনে আসতেন, তাহলে তাঁর বুকের মধ্যেও তলোয়ার বসিয়ে দিতে আমি কোন কুণ্ঠাবোধ করতাম না।' *

অতঃপর তিনি (সাঃ) তায়েফের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। তায়েফ হচ্ছে সেই শহর যার বাসিন্দারা পাথর মেরে মেরে মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে তাদের শহর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। শহরটিকে তিনি কিছুদিন ঘিরে অবরোধ করে রইলেন। কিন্তু, পরে অনেকে পরামর্শ দিলেন যে, এখন অবরোধ চালিয়ে গেলে অহেতুক সময় নষ্ট করা হবে। এখন সারা আরবের মধ্যে এই একটি মাত্র শহর আর কী-ই বা করতে পারবে। কাজেই, তিনি অবরোধ তুলে নিয়ে চলে এলেন। এবং কিছুদিন পরে তায়েফের লোকেরাও মুসলমান হয়ে গেল।

মক্কা ও হোনায়েনের বিজয়ের পর

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর পরাজিত শত্রুপক্ষের কাছ থেকে মুক্তিপণ হিসেবে যে ধন-সম্পদ পাওয়া গেল এবং যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুদের ছেড়ে যাওয়া যে সকল মাল

---

*সিরাত ইবনে হিশাম : ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৯, যাদুল মায়াদ যুরকানীর টিকার সূত্রে : ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৬৫

সামান হস্তগত হলো, তা দস্তুরমত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করে দিচ্ছিলেন। কিন্তু, তিনি ঐ সমস্ত মাল-পত্র মুসলমানদের মধ্যে ছাড়াও মক্কাবাসীদের এবং আশেপাশের লোকদের মধ্যেও বিতরণ করছিলেন। এ সকল লোকের অন্তরে তখনও পর্যন্ত ঈমান পয়দা হয়নি, বহুলোক তখনও কাফেরই ছিল এবং যারা মুসলমান হয়েছিল তারা সবেমাত্র ঈমান এনেছিল। কাজেই তাদের কাছে এই ব্যাপারটা অর্থাৎ একটা জাতি তাদের নিজেদের মাল-সম্পদ যে অপরাপর জাতির লোকদের মধ্যে বন্টন করে দিতে পার, তা একেবারে নতুন ছিল। এইভাবে মাল বন্টনের ফলে, তাদের হৃদয়ের পুণ্য ও খোদা-ভীরুতার পরিবর্তে লালসাই বৃদ্ধি পেলো। তারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে ভীড় করা শুরু করে দিল। এবং বার বার দাবী দাওয়া পেশ করে করে তাঁকে তার অস্থির করে তুললো। এমন কি ভীড়ের মধ্যে ঠেলতে ঠেলতে তাঁকে একটা গাছের তলায় নিয়ে গেল। এবং এক ব্যক্তি তাঁর ঘাড়ের চাদর ধরে পাক দিতে শুরু করলো, যার ফলে তাঁর শ্বাসরোধ হওয়ার উপক্রম হলো। তখন তিনি বললেনঃ

> 'হে লোকসকল! আমার কাছে যদি আরও কিছু থাকতো, তাহলে আমি তাও তোমাদের মধ্যে বাঁটোয়ারা করে দিতাম। তোমরা কখনও আমাকে কৃপণ ও ছোট মনের লোক দেখতে পাবে না।'

এই কথা বলে তিনি (সাঃ) তাঁর উটনীর কাছে গেলন এবং তার একটা পশম ছিঁড়ে নিয়ে উর্ধ্বে তুলে ধরলেন এবং বললেন,

> 'হে লোকসকল! তোমাদের মাল-সম্পদে এই পশমের সমানও প্রয়োজন নেই আমার কেবল সেই এক পঞ্চমাংশ হিস্যা ছাড়া যা আরবের কানুন মোতাবেক সরকারের পাওনা। এবং সেই এক পঞ্চমাংশও আমি আমার নিজের জন্য খরচ করি না। বরং তা তোমাদের কাজেই খরচ করা হয় এবং মনে রেখো যে, খেয়ানতকারী লোকেরা কেয়ামতের দিন তাদের খেয়ানতের কারণে খোদার সামনে লাঞ্ছিত হবে।*

লোকেরা বলে যে, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) রাজত্বের অভিলাষী ছিলেন। কিন্তু রাজা ও প্রজার মধ্যে কি কখনও এই প্রকারের সম্পর্ক হতে দেখা যায়? কারও কি এমন সাধ্য কখনও হয়েছে যে, রাজাকে ধাক্কা দিতে দিতে নিয়ে যায় এবং তাঁর গলায় কাপড় জড়ায়ে তাতে পাক দেয়? আল্লাহ্র রসূল (সাঃ) ছাড়া এরূপ দৃষ্টান্ত কে স্থাপন করতে পারে? তবু তো সমস্ত মাল-সম্পদ গরীবদের মধ্যে

---

* *আস্ সিরাতুল হালবিয়া : ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩৫*

বিতরণ করে দেওয়ার পরও এমন সংকীর্ণ চিত্তের লোকও ছিল যারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বাঁটোয়ারাকে পর্যন্ত ইনসাফের বাঁটোয়ারা বলে মানতে চায়নি। এমনকি যুল খোবায়সেরা নামক এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিকটে এসে বলেই ফেললোঃ

'হে মুহাম্মদ! (সাঃ) আপনি আজ যা করলেন, তা তো আমি দেখলাম'!

আঁ হযরত (সাঃ) বললেন, 'কি দেখলে তুমি?'

সে বললো, 'আমি দেখলাম যে, আপনি আজ জুলুম করলেন। এবং ইনসাফের সঙ্গে কাজ করেন নি।'

তিনি (সাঃ) বললেন, 'তোমার জন্য আফসোস! যদি আমি সুবিচার না করে থাকি তাহলে দুনিয়াতে আর কোন ব্যক্তি আছে যে, সে সুবিচার করবে?'

এমন সময়, সাহাবারা (রাঃ) উত্তেজনায় খাড়া হয়ে গেলেন। এবং যখন ঐ লোকটা ঐ মজলিস ছেড়ে চলে গেল, তখন তাঁদের কেউ কেউ বললেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্! এই ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য। আপনি আমাদেরকে অনুমতি দিন, আমরা ওকে কতল করে ফেলবো।'

আঁ হযরত (সাঃ) বললেন, 'এই ব্যক্তি যদি আইনের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখে তাহলে তো আমরা তাকে হত্যা করতে পারি না'।

সাহাবীরা (রাঃ) বললেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্! কোন ব্যক্তি যদি প্রকাশ্যে কিছু করে এবং তার অন্তরে অন্যকিছু থাকে, তাহলে কি সে শাস্তিযোগ্য হয় না?'

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, 'আল্লাহ্ আমাকে এমন হুকুম দেননি যে, আমি মানুষের সাথে তাদের অন্তরের চিন্তা-ভাবনা অনুযায়ী আচরণ করি। আমাকে বরং এই হুকুম দেওয়া হয়েছে যে, আমি মানুষের প্রকাশ্য আচরণ অনুযায়ী আচরণ করি'।

তিনি (সাঃ) আরও বললেন, 'এই ব্যক্তি এবং এর সঙ্গীরা একদিন ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে।'

বস্তুতঃ, হযরত আলী (রাঃ)-এর আমলে এই ব্যক্তি এবং তার গোত্রের অন্যান্য লোকেরা ঐ সকল বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব দিয়েছিলো যারা হযরত আলীর (রাঃ) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। এবং খারিজী হিসেবে আজও পর্যন্ত ইতিহাসে কুখ্যাত হয়ে রয়েছে।

হাওয়াযিনদের সঙ্গে যুদ্ধের পর মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মদীনায় চলে এলেন। এই দিন মদীনাবাসীদের জন্য এক নতুন আনন্দের দিন হলো। এক সময় আল্লাহ্র রসূল (সাঃ) মক্কাবাসীদের অত্যাচারে অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে মদীনার দিকে রওয়ানা দিয়েছিলেন, আর আজ, আল্লাহ্র সেই রসূল (সাঃ) মক্কা বিজয় করার পর আনন্দের সঙ্গে এবং নিজের অঙ্গীকার পূর্ণ করার জন্যেও, পুনরায় মদীনায় প্রবেশ করলেন।

তাবূকের যুদ্ধ

হযরত মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মক্কা বিজয়ের পর মদীনায় ফিরে এলেন। মদীনায় তখন খাযরাজ কবিলার আবু আমের মদনী নামক এক ব্যক্তি বাস করতো। সে ইহুদী ও খৃষ্টানদের সঙ্গে উঠাবসার কারণে এক প্রকারের সাধনা ও ধ্যান বা তপজপ করার অভ্যাস গড়ে তুলেছিল। যে কারণে লোকে তাকে মনে করতো একজন রাহেব বা সন্ন্যাসী। যদিও সে ধর্মতঃ খৃষ্টান ছিল তবুও ঐ ব্যক্তি, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মদীনায় পৌঁছার পর, মক্কার দিকে পালাতে গেল। তখন মক্কা বিজয় সম্পন্ন হয়েই গেছে। কাজেই, সে চিন্তা করল যে, এখন তাকে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার জন্য নতুন কোন ফন্দী অবলম্বন করতে হবে। অতএব, সে তার নাম পরিবর্তন করলো, এবং পোষাক-পরিচ্ছদও পরিবর্তন করলো। এবং মদীনার বাইরে কোবা নামক একটি পল্লীতে বসবাস শুরু করলো। বেশ কয়েক বছর বাইরে থাকার দরুন এবং নাম ও চেহারা সুরতে পরিবর্তন আনার কারণে মদীনার সাধারণ লোকেরা তাকে আর চিন্‌তে পারতো না। তবে, কিছু সংখ্যক মুনাফেক তাকে চিন্‌তো, যাদের সঙ্গে সে যোগাযোগ রাখতো। সে মদীনার মুনাফেকদের সঙ্গে একত্রে একটা দ্বিমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করলো এবং তা ব্যক্ত করলো এই ভাবেঃ

আমি সিরিয়াতে গিয়ে খৃষ্টান শাসকদের এবং আরব খৃষ্টান গোত্রগুলোকে উত্তেজিত করতে থাকবো। এবং তাদেরকে আক্রমণের জন্য উস্কানী দিতে থাকবো। এদিকে তোমরা (মুনাফেকরা) প্রচার চালাতে থাকবে যে, সিরিয়ার সেনাবাহিনী মদীনা আক্রমণের জন্য আসছে। যদি আমার এই পরিকল্পনা সফল হয়, তাহলে উভয় পক্ষের মধ্যে নিশ্চয় সংঘর্ষ বেধে যাবে। আর যদি পরিকল্পনা সফল নাও হয়, তাহলেও মুসলমানরা নিজেরাই গিয়ে সিরিয়া আক্রমণ করে বসবে। এবং তার ফলে, কায়সারের সঙ্গেই ওদের যুদ্ধ বেধে যাবে। ফলে, আমাদের কার্যসিদ্ধি হবে।

অতঃপর ঐ ব্যক্তি সিরিয়ার দিকে চলে গেল। এবং এদিকে মদীনার মুনাফেকরা প্রতিদিন এই গুজব রটাতে লাগলো যে, অমুক কাফেলার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল, তারা বললো, সিরিয়ার সেনাবাহিনী মদীনা আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। পরের দিন আবার তারা বললো, অমুক কাফেলার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল, তারা বলে গেল, সিরিয়ার সেনাবাহিনী মদীনা আক্রমণ করার জন্য আসছে। এইসব গুজব এমন ব্যাপকভাবে ছড়ানো হচ্ছিল যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মনে করলেন যে, ইসলামী সেনাবাহিনীকে অবিলম্বেই সিরিয়ার সেনাবাহিনীর মোকাবেলার জন্য পাঠাতে হবে। সেই সময়টাতে মুসলমানরা খুবই কষ্টে-সৃষ্টে দিন কাটাচ্ছিল। দেশে তখন আকাল পড়েছিল। বিগত বছরে খাদ্য-শস্য ও ফল-ফলাদি তেমন একটা উৎপন্ন হয়নি। এ বছর এখনও ফসল উঠেনি। সময়টা ছিল সেপ্টেম্বর মাসের শেষ কিংবা অক্টোবর মাসের প্রথম। তিনি (সাঃ) যুদ্ধের জন্য রওয়ানা দিলেন। মুনাফেকরা তো জানতো যে, এ সবই তাদের মিথ্যা চক্রান্ত। তারা এটাও জানতো যে, তারা এই সব চালাকী এজন্যই করেছে যে, যদি সিরিয়ার সেনাবাহিনী আক্রমণ করতে নাও আসে, তবু মুসলমানরা নিজেরাই গিয়ে সিরিয়া আক্রমণ করবে। এবং এভাবেই ধ্বংস হয়ে যাবে। সুতরাং যুদ্ধের পরিণতি তারা জানতো। ঐ সময়ে মুসলমানদেরকে এত বিশাল সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছিল যে, তারা বহু ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে কোনক্রমে বেঁচে এসেছিল। এবারে তারা দ্বিতীয় মজা দেখার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে উঠলো, যেখানে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) স্বয়ং (নাউযুবিল্লাহ) শহীদ হয়ে যাবেন। কাজেই, এদিকে মুনাফেকরা খুব জোরে শোরে এই গুজব ছড়াতে থাকলো যে, অমুক অমুক উপায়ে আমরা খবর পেয়েছি যে, শত্রু আক্রমণ করতে এলো বলে। অমুক উপায়ে আমরা এ খবরও পেয়েছি যে, সিরিয়ার সেনাবাহিনী দ্রুত অগ্রসর হয়ে আসছে। এবং তারা লোকদের কাছে এত বলে বলে বেড়াচ্ছিল যে, এত বিরাট সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করা কোনও চাট্টিখানি কথা নয়। কাজেই, তাদের উচিৎ হবে না যুদ্ধে যোগদান করা। তাদের এই সব চক্রান্তের উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে, মুসলমানরা যদি সিরিয়া আক্রমণ করতে যায় তো যাক, যাতে শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে। কিন্তু, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন ঘোষণা করলেন, আমাদেরকে সিরিয়া অভীমুখে যুদ্ধযাত্রা করতে হবে, তখন মুসলমানরা একনিষ্ঠ আনুগত্য ও প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বড় বড় স্বার্থত্যাগ ও আত্মত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। গরীব মুসলমানদের কাছে যুদ্ধের সরঞ্জামই বা ছিল কোথায়? রাষ্ট্রীয় কোষাগারও ছিল শূন্য। তাদের যে সকল ভাই সম্পাদশালী ছিলেন, তারাই কেবল এগিয়ে আসতে পারে তাদের সাহায্যের জন্যে। এমতাবস্থায়, দেখা গেল যে, প্রত্যেকে কোরবানী করার জন্য একে অপরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করে দিল।

হযরত ওসমান (রাঃ) সেদিন তাঁর সমস্ত সম্পদের অধিকাংশই নিয়ে এসে রসূলুল্লাহ্ (রাঃ)-এর খেদমতে পেশ করে দিলেন, যার পরিমাণ ছিল একহাজার সোনার দীনার। এমনিভাবে অন্যান্য সাহাবারাও (রাঃ) নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী চাঁদা দিতে থাকলেন। এবং গরীব মুসলমানদের জন্য সওয়ারী (অর্থৎ উট, ঘোড়া) ও নেজা-তলোয়ার ইত্যাদি সংগ্রহ করে দিতে লাগলেন। সাহাবাদের (রাঃ) মধ্যে কোরবানী করার প্রেরণা এমন ছিল যে ইয়েমেনের কিছু লোক যারা ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় হিজরত করে এসেছিলেন এবং খুবই গরীবি অবস্থায় দিন কাটাচ্ছিলেন তাঁদের কয়েকব্যক্তি হযরত রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন,

> 'ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমাদেরকেও আপনার সাথে নিন। আমরা তেমন কিছুই চাই না, শুধু এতটুকু হলেই চলবে যে, আমাদেরকে ওখানে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিন।'

কোরআন করীমে এদের সম্পর্কে বলা হয়েছে,

وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ ﴿٩٢﴾

অর্থাৎ- এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার জন্য তাদের কোন অপরাধ ছিল না। তারা তোমার কাছে এসেছিল, যেন তুমি তাদের জন্য শুধু এতটুকু বন্দোবস্ত করে দাও যে, তারা যেন সেখানে পৌঁছতে পারে। কিন্তু, তুমি তাদেরকে বলেছিলে, 'তোমাদেরকে সেখানে পৌঁছতে দেওয়ার মত কোন উপায় উপকরণ তো আমার হাতে নেই।' তখন তারা তোমার মজলিস থেকে উঠে চলে গিয়েছিল। এবং তাদের চোখ থেকে এই দুঃখে অশ্রু ঝরছিল যে, হায়! তাদের হাতে এমন কোন মাল-সম্পদই নেই যা খরচ করে তারা আজ ইসলামের খেদমত করতে পারে।

(সূরা তওবা : আয়াত ৯২)

এই ব্যক্তিদের সর্দার ছিলেন আবু মূসা। তাঁকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'আপনি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে কি চেয়েছিলেন?'

উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'খোদার কসম! আমরা উট চাইনি, ঘোড়া চাইনি। আমরা শুধু এ কথাই বলেছিলাম যে, আমরা তো খালি পায়ে থাকি; এত দীর্ঘ সফরে খালি পায়ে যাওয়া সম্ভব নয়। যদি আমাদেরকে শুধু একজোড়া করে জুতো দেওয়া হয়, তাহলেই আমরা সেই জুতো পায়ে দৌড়াতে দৌড়াতে গিয়ে আমাদের ভাইয়ের সাথে মিলিত হয়ে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারবো।'

যেহেতু সেনাবাহিনীকে সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করতে হবে, এবং মূতার যুদ্ধের পরিণতি যেহেতু মুসলমানদের দৃশ্যপটে ভেসে উঠছিল, সেহেতু প্রত্যেক মুসলমানের হৃদয়ে অন্যসব চিন্তার উপরে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর হেফাযতের চিন্তা প্রবল হয়ে উঠছিল। এই বিপদের আশঙ্কায় স্ত্রীলোকেরাও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল। এবং তারা তাদের স্বামী ও ছেলেদেরকে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করছিল। তাদের সেই আন্তরিকতা ও প্রেরণা উপলব্ধি করার জন্য এখানে একটি মাত্র ঘটনার উল্লেখ করাই যথেষ্ট হবেঃ একজন সাহাবী (রাঃ) বিয়ের পরে পরেই কোন কাজে বাইরে চলে গিয়েছিলেন। তিনি যখন ফিরে এলেন, ততক্ষণে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সেনাবাহিনী নিয়ে মদীনা ছেড়ে রওয়ানা হয়ে গেছেন। এই সাহাবী বেশ কিছুদিন বাইরে ছিলেন, বিধায় তিনি এই মনোভাবসহ ফিরছিলেন যে, বাড়ীতে ফিরে তিনি তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রীর সাক্ষাৎ পাবেন এবং আনন্দিত হবেন। বাড়ীতে ফিরে তিনি দেখতে পান যে, তাঁর স্ত্রী আঙ্গিনায় বসে আছেন। তিনি ভালবাসার টানে স্ত্রীকে সোহাগ করার ইচ্ছায় স্ত্রীর দিকে এগিয়ে গেলেন। তিনি যখন তাঁর স্ত্রীর একেবারে কাছে গেলেন, তখন তাঁর স্ত্রী তাঁকে দু'হাতে ধাক্কা মেরে সরায়ে দিলেন। সাহাবী বিস্মিত হয়ে তাঁর স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালেন এবং বললেন, 'এতদিন পর এলাম, অথচ এ কেমন ব্যবহার?' তাঁর স্ত্রী বললেন,'কেন, তোমার কি লজ্জা-শরম নেই? আল্লাহ্র রসূল যাচ্ছেন সেই বিপজ্জনক স্থানে, আর তুমি কিনা ব্যস্ত হয়ে এসেছ স্ত্রীর সঙ্গে পেয়ার করতে? প্রথমে যাও, নিজের কর্তব্য পালন করো, পরে এসব কথা হবে।' ঐ সাহাবী (রাঃ) তৎক্ষণাৎ বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন এবং তাঁর সওয়ারীর উপরে জিন বাঁধলেন এবং তিন মঞ্জিল পথ (তিনদিনের পথ) অতিক্রমণ করে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সঙ্গে মিলিত হলেন।

কাফেররা তো এটা মনে করেছিল যে, রসূলে করীম (সাঃ) তাদের ছড়ানো সব গুজবের প্রভাবে পড়ে কোন চিন্তা-ভাবনা না করেই সিরিয়ার সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করে বসবেন। কিন্তু, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তো ছিলেন ইসলামী চরিত্রের দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী। যখন তিনি সিরিয়ার নিকটবর্তী তাবূক নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন তিনি এদিকে সেদিকে লোকজন পাঠিয়ে দিলেন সঠিক খবরা খবর সংগ্রহের জন্য। এই দূতেরা এই নিশ্চিত খবর নিয়ে ফিরে এলো যে, এখন সিরিয়ার কোন সেনাবাহিনী কোথাও জমায়েত হয়নি। অতঃপর, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ঐ স্থানেই কিছুদিন অবস্থান করলেন এবং আশে পাশের সীমান্তবর্তী গোত্রগুলোর সঙ্গে চুক্তি সম্পাদিত করে কোন প্রকার যুদ্ধ না করেই ফিরে এলেন।

আঁ হযরত (সাঃ)-এর এই সফর ছিল দু' আড়াই মাসের। যখন মদীনার মুনাফেকরা জানতে পারলো যে, যুদ্ধ-বিগ্রহ কিছুই হয়নি, এবং মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ভালভাবেই ফিরে আসছেন, তখন তারা বুঝতে পারলো যে,

তাদের মুনাফেকী ও চক্রান্ত সব ধরা পড়ে গেছে মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে। এবারে আর শাস্তি থেকে তাদের নিস্তার নেই। তখন তারা তাদের কিছু লোককে মদীনা থেকে কিছু দূরে একটা রাস্তার পার্শ্বে লুকিয়ে বসায়ে রাখলো। সেই রাস্তাটি এত সংকীর্ণ ছিল যে, সেখান দিয়ে মাত্র একটি উট বা একটি ঘোড়া নিয়েই শুধু পার হওয়া সম্ভব। যখন, আঁ হযরত (সাঃ) ঐ স্থানের নিকটবর্তী হলেন, তখন আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে ওহীর মাধ্যমে জানালেন যে, শত্রুরা সামনে রাস্তার দু'পার্শ্বে খাপটি মেরে বসে আছে। তিনি (সাঃ) একজন সাহাবীকে আদেশ দিলেন, সেখানে গিয়ে ব্যাপারটা দেখে আসার জন্য। তিনি (রাঃ) তাঁর উট দ্রুত চালিয়ে সেখানে গেলেন এবং দেখতে পেলেন যে, সেখানে কয়েকটা লোক এমনভাবে খাপটি মেরে বসে আছে যে, তাদেরকে দেখেই তাঁর মনে হলো, তারা কারো উপরে আক্রমণ চালাবে। তিনি (রাঃ) পৌঁছা মাত্রই তারা সেখান থেকে পালিয়ে গেল। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদের পশ্চাদ্ধাবন করা সমীচীন মনে করলেন না। আঁ হযরত (সাঃ) যখন মদীনায় পৌঁছলেন, তখন যে সকল মুনাফেকরা যুদ্ধে যায়নি তারা নানা প্রকারের অজুহাত দেখাতে লাগলো। রসূলে করীম (সাঃ) তাদের প্রত্যেকের অজুহাত মেনে নিলেন। কিন্তু, তখন সময় এসে গিয়েছিল, মুসলমানদের কাছে মুনাফেকদের মুখোশ খুলে ফেলার। সুতরাং রসূলে করীম (সাঃ)-কে আল্লাহ্তায়ালা ওহী করে জানালেন যে, কোবার যে মসজিদটি মুনাফেকরা নির্মাণ করেছিল, যেখানে তারা নামায পড়ার বাহানায় একত্রিত হতো এবং ষড়যন্ত্র করতো, সেই মসজিদটিকে ভেঙ্গে ফেলতে হবে। এবং মুনাফেকদেরকে বাধ্য করতে হবে মুসলমানদের অন্যান্য মসজিদগুলিতে গিয়ে নামায পড়তে। কিন্তু, এত বড় চক্রান্তের অপরাধেও তাদেরকে না কোন দৈহিক শাস্তি দেওয়া হলো, না তাদের কোন আর্থিক জরিমানা করা হলো।

তাবূক থেকে ফিরে আসার পর তায়েফের লোকেরাও আনুগত্য স্বীকার করলো। তারপর আরবের বিভিন্ন গোত্রগুলো দলে দলে এসে ইসলামী হুকুমতের অধীনে আসার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করতে লাগলো। এবং অল্পদিনের মধ্যেই সারা আরবে ইসলামী পতাকা পত্ পত্ করে উড়তে থাকলো।

বিদায় হজ্জ এবং আঁ হযরত (সাঃ)-এর ভাষণ

হিজরী নবম বর্ষে মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহোতায়ালা আলায়হে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লাম হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় এলেন। সেদিন তাঁর উপরে কোরআন করীমের যে প্রসিদ্ধ আয়তটি নাযিল হয় তা হচ্ছেঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

অর্থাৎ, আমি আজ তোমাদের ধর্মকে তোমাদের জন্য সম্পূর্ণ করে দিলাম॥ এবং যে আধ্যাত্মিক পুরস্কারসমূহ খোদাতায়ালার পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাগণের জন্য অবতীর্ণ হতে পারে তা সমস্তই তোমার উম্মতের জন্য দান করলাম। তাছাড়া এটাও ফায়সালা করে দেওয়া হলো যে, তোমাদের ধর্ম শুধু মাত্র আল্লাহ্তায়ালার আনুগত্যের উপরে স্থাপিত। (সূরা মায়েদা : আয়াত ৫) এই আয়াত তিনি (সাঃ) মুজদালেফার ময়দানে হজ্জের উদ্দেশ্যে সমবেত সমস্ত লোকের সামনে উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করে শোনান। মুজদালেফা থেকে ফেরার পরে হজ্জের রীতি অনুয়ারী তিনি মীনাতে থামেন এবং ১১ই যিল্হজ্জ তারিখে তিনি (সাঃ) সমবেত সমস্ত মুসলমানদের সামনে দাঁড়িয়ে এক ভাষণ দান করেন। এই ভাষণে তিনি (সাঃ) বলেনঃ

'হে লোক সকল! আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোন। কেননা, আমি জানি না যে, এই বৎসরের পর আর কখনও আমি এই ময়দানে তোমাদের সাথে দাঁড়িয়ে আর কোনও বক্তৃতা দিতে পারবো কিনা।

'আল্লাহ্তায়ালা তোমাদের জীবন ও তোমাদের সম্পদ একে অপরের হামলা থেকে কেয়ামত পর্যন্ত পবিত্র ও নিরাপদ করে দিয়েছেন।

'আল্লাহ্তায়ালা প্রত্যেক ব্যক্তির উত্তরাধিকারের অংশ নির্ধারিত করে দিয়েছেন। এ ধরনের কোন ওসীয়্যত বৈধ হবে না, যা কোন বৈধ উত্তরাধিকারীর ক্ষতির কারণ হয়।

'যার ঘরে যে সন্তান পয়দা হবে, সে তারই সন্তান হবে। এবং কেউ যদি এই সন্তানের পিতৃত্বের উপরে দাবী উত্থাপন করে, তাহলে সে শরীয়ত মোতাবেক প্রাপ্য শাস্তি ভোগ করবে।

'যে ব্যক্তি অন্য কাউকে নিজের পিতা বলে দাবী করবে, কিংবা কাউকে নিজের মালিক বলে মিথ্যা দাবী করবে, তার উপরে খোদার এবং ফেরেশ্তাদের এবং সকল মানুষের অভিশাপ বর্ষিত হবে।

'হে লোক সকল! তোমাদের স্ত্রীদের উপরে তোমাদের যেমন হক্ (অধিকার) আছে তেমনি তোমাদের উপরেও তোমাদের স্ত্রীদের হক্ (অধিকার) আছে। তাদের উপরে তোমাদের অধিকার হচ্ছে যে, তারা সতীত্ব বজায় রেখে জীবন যাপন করবে। এবং তারা এমন অশালীন কিছু করবে না, যাতে মানুষের সামনে তাদের স্বামীদের কোনও সম্মানহানি ঘটে। এ জাতীয় কিছু যদি তারা করে, তাহলে তোমরা (কোরআন করীমের নির্দেশ অনুযায়ী তা যাচাই করবে এবং আদালতের ফায়সালা মোতাবেক) তাদেরকে শাস্তি দিবে, কিন্তু তাতে কোন

বাড়াবাড়ি করবে না। কিন্তু, যদি তারা এমন কিছু না করে, যা তাদের স্বামী ও বংশের জন্য অবমাননার কারণ হয়, তাহলে তোমাদের কর্তব্য হবে, তোমাদের সাধ্যমত তাদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদির সুবন্দোবস্ত করা। মনে রাখবে যে, সর্বদাই নিজেদের স্ত্রীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে হবে। কেননা, খোদাতা'লা তাদের দেখাশোনা করার দায়িত্ব তোমাদের উপরে ন্যস্ত করেছেন। নারীরা দুর্বল, তারা তাদের অধিকার নিজেরা রক্ষা করতে পারে না। কাজেই, তোমরা যখন তাদেরকে বিবাহ করো, তখন খোদাতায়ালা তাদের অধিকার রক্ষার জন্য তোমাদেরকে জামিন নিযুক্ত করে দেন। খোদাতায়ালার আইন মোতাবেক তোমরা তাদেরকে তোমাদের ঘরে নিয়ে আস। অতএব, খোদাতায়ালার অর্পিত সেই জামানতের কখনই খেয়ানত করবে না। এবং স্ত্রীদের অধিকার রক্ষার প্রতি সর্বদাই সতর্ক দৃষ্টি রাখবে।

'হে লোক সকল! তোমাদের হাতে এখনও কিছু যুদ্ধবন্দী রয়ে গেছে। আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তোমরা তাদেরকে তাই খাওয়াবে যা তোমরা নিজেরা খাও। এবং তাদেরকে তাই পরতে দিবে, যা তোমরা নিজেরা পর। যদি তারা এমন কোন অপরাধ করে ফেলে, যা তোমরা ক্ষমা করতে পার না, তাহলে তাদেরকে অন্যের কাছে দিয়ে দিবে। কেননা, তারা খোদারই বান্দা। তাই, কোনও অবস্থাতেই তাদেরকে কোনরূপ কষ্ট দেওয়া বৈধ হবে না।

'হে লোক সকল! আমি তোমাদেরকে যা বলছি, তা শোন এবং ভালভাবে মনে রেখো।

'প্রত্যেক মুসলমান প্রত্যেক মুসলমানের ভাই। তোমরা সবাই সমান। সব মানুষ,-তা তারা যে কোন জাতিরই হোক আর যে কোন ধর্মেরই হোক মানুষ হওয়ার কারণে, -পরস্পর সমান।- (এই কথা বলার সময়ে তিনি (সাঃ) তাঁর উভয় হাত উপরে তুললেন এবং এক হাতের আঙ্গুলগুলিকে অপর হাতের আঙ্গুলগুলির সঙ্গে মিলালেন এবং বললেন) যে ভাবে দুই হাতের আঙ্গুলগুলি পরস্পর সমান, সে ভাবেই সকল মানুষ পরস্পর সমান।

'তোমাদের কোন অধিকার নেই যে, তোমরা একে অন্যের উপরে কোন শ্রেষ্ঠত্বের দাবী কর। তোমরা পরস্পর ভাই।'

তিনি (সাঃ) আবার বললেনঃ

'তোমরা কি জান, এখন কোন্ মাস? এই এলাকা কোন্ এলাকা? তোমাদের কি জানা আছে, আজকের দিন কোন্ দিন?'

লোকেরা উত্তর দিল, 'হাঁ, এই মাস পবিত্র মাস। এই এলাকা পবিত্র এলাকা। আজকের দিন হজ্জের দিন।'

তাদের সকলেই উত্তর শুনে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলতে থাকলেন,

'যে ভাবে এই মাস পবিত্র মাস, যে ভাবে এই এলাকা পবিত্র এলাকা; যে ভাবে এই দিন পবিত্র দিন, তেমনি ভাবে আল্লাহ্তায়ালা প্রতিটি মানুষের জান, মাল ও সম্মান পবিত্র করে দিয়েছেন। এবং কারো জানের উপরে কিংবা মাল ও সম্মানের উপরে হামলা করা ঠিক তেমনি অবৈধ যেমন অবৈধ এই মাসের, এই এলাকায় এই দিনের অমর্যাদা করা। এই হুকুম শুধু আজকের জন্যই নয়, শুধু কালকের জন্যই নয়, বরং সেই দিন পর্যন্ত প্রত্যেক দিনের জন্য যেদিন তোমরা খোদার সঙ্গে গিয়ে মিলিত হবে'।

তিনি (সাঃ) আরও বললেন,

'এই সমস্ত কথা যা আমি আজ তোমাদেরকে বলছি তা তোমরা পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিও। কেননা, এমনও হতে পারে যে, যারা আজ আমার কথা আমার কাছ থেকে শুনছে, তাদের চাইতে যারা আমার কাছ থেকে আমার এই কথা শুনছে না, তারাই এই সকল কথার উপরে বেশী আমল করবে, বেশী বেশী পালন করবে।'

এই সংক্ষিপ্ত ভাষণ বলে দিচ্ছে যে, মানুষের মঙ্গল এবং তাদের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য রসূলে করীম (সাঃ) কত বেশী উদ্বিগ্ন ছিলেন। এবং নারীজাতি ও দুর্বলের অধিকার রক্ষার প্রতি কত বেশী আন্তরিক ছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জানতেন যে, তাঁর ইহজীবনের দিন শেষ হয়ে আসছে। হয়তো বা আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, তাঁর জীবনের সময় প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তাই, তিনি চাননিযে, যে নারীদেরকে মানব জন্মের আদি থেকেই পুরুষদের দাসী বানিয়ে রাখা হয়েছে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আদেশ-নির্দেশ দেওয়ার পূর্বেই তিনি জগৎ ছেড়ে চলে যান। তিনি চেয়েছিলেন যে, ঐ সকল যুদ্ধবন্দী যাদেরকে মানুষেরা ক্রীতদাস বলে আখ্যায়িত করে, এবং যাদের উপরে নানা প্রকার অত্যাচার চালিয়ে থাকে, তাদের অধিকার সুরক্ষিত করার পরই তিনি যেন দুনিয়া ছেড়ে চলে যান। তিনি চাননি যে, মানুষে মানুষে যে প্রকাশ্য পার্থক্য সৃষ্টি করা হয়েছে, যে ভেদাভেদ গড়ে তোলা হয়েছে, যার দরুন কাউকে আকাশে উঠানো হয়েছে, কাউকে পাতালে নিক্ষেপ করা হয়েছে, তা ঘুচিয়ে দেওয়ার আগে তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। তিনি চাননি যে, যে সকল কারণে, জাতিতে জাতিতে, দেশে দেশে মতবিরোধ দেখা দেয় এবং যুদ্ধ-বিগ্রহের সৃষ্টি হয়, তা সব সাকল্যে

দূরীভূত করার আগে তিনি এই দুনিয়া ছেড়ে চলে যান। একে অপরের হক্ আত্মসাৎ করা বা অধিকার খর্ব করা সব সময়েই বর্বর যুগের এক অভিশাপ বলে গণ্য করা হয়, তার অশুভ বাসনাকে যতক্ষণ না হত্যা করা হয়, ততক্ষণ তিনি পৃথিবী ছেড়ে যেতে চাননি। যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষের জান ও মালকে সেই পবিত্রতা সেই নিরাপত্তা দান না করা হয়, যা খোদাতায়ালার পবিত্র মাসগুলোকে খোদাতায়ালার পবিত্র ও কল্যাণমণ্ডিত স্থানসমূহকে দান করা হয়েছে, ততক্ষণ তিনি এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে চাননি।

নারীকে পুরুষের সমমর্যাদা দান, সব জাতির জন্য নিরাপত্তা ও শান্তি স্থাপন করণ, মানবজাতির মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠাকরণ ইত্যাদির জন্য এত বেশী গভীর উদ্বেগ ও আন্তরিকতা পৃথিবীর আর কোনও মানুষের মাঝে কেউ কি কখনও দেখেছে? হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কোন্ মানুষটি মানব জাতির জন্য এত ভালবাসা, এত আকুলতা, এত সংকল্প আর কোন মানুষের মধ্যে কি কখনও দেখা গেছে? এসব কারণেই তো ইসলামের মধ্যে নারীরা তাদের সম্পত্তির মালিক। যে মালিকানা অর্জন করতে পেরেছে ইউরোপ ইসলামের তেরশ' বছর পরে। এর কারণেই তো ইসলাম গ্রহণকারী প্রত্যেক ব্যক্তি অন্য সবার সমান হয়ে যায়, তা সে যত ছোট এবং যত নীচ জাতের লোকই হোক না কেন। স্বাধীনতা ও সাম্যের শিক্ষা ও আদর্শ কেবল ইসলাম, হ্যাঁ, কেবল ইসলামই কায়েম করেছে পৃথিবীতে। এবং এমনভাবে কায়েম করেছে যে, আজ পর্যন্ত দুনিয়ার আর কোন জাতি তা করতে পারেনি। আমাদের মসজিদে একজন সম্রাট কিংবা একজন সম্মানিত ধর্মীয় নেতা একজন সাধারণ মানুষের সমান। সেখানে তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য বা কোন ভেদাভেদ নেই। অথচ, অন্যান্য ধর্মের উপাসনালয়গুলোতে বড় ও ছোটর মধ্যে ভেদাভেদ আজও অব্দি বজায় রয়েছে। যদিও সেই জাতিগুলি স্বাধিকার ও সাম্যের কথা মুসলমানদের চাইতে অনেক বেশী জোর গলায় প্রচার করে চলেছে।

আঁ হযরত (সাঃ)-এর ওফাত

হজ্জের সফর থেকে ফিরে আসার সময় পথিমধ্যে আঁ হযরত (সাঃ) সাহাবীদের (রাঃ) কাছে তাঁর ওফাতের খবর দিলেন। তিনি (সাঃ) বললেন, 'হে লোক সকল। আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। আল্লাহ্‌র ডাক আমার খুব নিকটবর্তী হয়েছে। এবং আমাকে সেই ডাকে সাড়া দিতে হবে।'

তিনি (সাঃ) বললেনঃ

'আমাকে আমার মেহেরবান ও সদাসতর্ক প্রভু খবর দিয়েছেন যে, একজন নবী তাঁর পূর্ববর্তী নবীর অর্ধেক বয়স পেয়ে থাকেন। রসূলুল্লাহ্-সাঃ-কে বলা হয়েছিল যে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর বয়স কম বেশী ১২০ বছর। এথেকে তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে, তাঁর বয়স কম পক্ষে ৬০ বছর হবে। ঐ সময়ে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২/৬৩ বছর। তিনি এদ্বারা এই ইংগিতই দিয়েছিলেন যে, তাঁর আয়ূ শেষ হয়ে এসেছে। তবে, এই কথার তাৎপর্য এই নয় যে, প্রত্যেক নবীই তাঁর পূর্ববর্তী নবীর অর্ধেক আয়ূ পেয়ে থাকেন। এই হাদীসে আঁ হযরত (সাঃ) শুধু ঈসা (আঃ)-এর বয়সের কথা উল্লেখ করেছিলেন, এবং তা করেছিলেন তিনি তাঁর নিজের বয়সের ধারণা দেওয়ার জন্য। তাই আমার মনে হচ্ছে খুব শীগ্‌গীর আমার ডাক আসবে। এবং আমাকে যেতে হবে।'

'হে আমার সাথীরা! আমি যখন খোদার সামনে প্রশ্নের সম্মুখীন হবো, তখন তোমরা কি বলবে?'

তারা (রাঃ) বললেনঃ

'ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমরা বলবো যে, আপনি ইসলামের তবলীগ অতি উত্তমরূপে করেছেন। এবং আপনি আপনার জীবন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র দীনের খেদমতে নিয়োজিত রেখেছিলেন। এবং আপনি মানব জাতির কল্যাণসাধনাকে পরিপূর্ণতা দান করেছেন। আল্লাহ্! তুমি তাঁকে আমাদের পক্ষ থেকেও উত্তম থেকে উত্তম পুরস্কারসমূহে ভূষিত কর'।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেনঃ

'তোমরা কি এই কথার সাক্ষ্যদান করছ না যে, আল্লাহ্ এক, এবং মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রসূল; বেহেশ্‌ত সত্য, দোজখ সত্য এবং নিশ্চয় প্রত্যেক মানুষের জন্য মৃত্যু আসে, এবং মৃত্যুর পর প্রত্যেক মানুষ জীবন লাভ করবে এবং কেয়ামতও নিশ্চয় আসবে, এবং সকল মানব সন্তানকে আল্লাহ্‌তায়ালা কবর থেকে পুনরায় জীবিত করে একত্রিত করবেন?'

তাঁরা (রাঃ) বললেনঃ 'হ্যাঁ, ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমরা এই সকল কথারই সাক্ষ্যদান করছি। অতঃপর তিনি (সাঃ) আল্লাহ্‌কে সম্বোধন করে বললেনঃ

'তুমিও সাক্ষী থেকো যে, আমি তাদের কাছে ইসলামের নীতি-নিয়ম সব সবিস্তারে পৌঁছে দিয়েছি।'

রসূলে করীম (সাঃ) এই হজ্জ থেকে ফিরে এসে মুসলমানদের তালীম-তরবীয়ত বা শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ও চরিত্র গঠনের কাজে এবং তাদের আমল বা কর্ম ও আচরণের সংশোধনের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। এবং মুসলমানকে তাঁর মৃত্যুর দিনের জন্য তৈরী করতে থাকলেন। একদিন তিনি বক্তৃতা দিতে দাঁড়ালেন এবং বললেন;

'আজ আমার প্রতি আল্লাহ্তায়ালার কাছ থেকে এই ওহী অবতীর্ণ হয়েছেঃ

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۝ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۝

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۝ *(সূরা নাসর)*

অর্থাৎ- ঐ দিনের কথা মনে রেখো, যখন আল্লাহ্তায়ালার সাহায্য এবং তাঁর পক্ষ থেকে বিজয় অতীতের চেয়ে আরও বেশী করে আসবে এবং প্রত্যেক জাতি ও গোষ্ঠীর লোকেরা ইসলামের মধ্যে দলে দলে প্রবেশ করতে শুরু করবে। অতএব, হে মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এবং তুমি তোমার খোদাতায়ালার প্রশংসা করতে থাক এবং তাঁর কাছে এই প্রার্থনা করো যে, ধর্মের যে বুনিয়াদ তুমি স্থাপিত করেছে তার মধ্যে থেকে তিনি যেন সকল প্রকারের কমতি ও দুর্বলতা দূর করে দেন। যদি তুমি এই দোয়া করতে থাক, তাহলে খোদাতায়ালা অবশ্যই তোমাদের দোয়া শুনবেন।

অতঃপর তিনি (সাঃ) বললেনঃ 'খোদাতায়ালা তাঁর এক বান্দাকে বলেছিলেন,

> 'ইচ্ছা করলে তুমি আমার কাছে চলে আসতে পার, কিংবা ইচ্ছা করলে তুমি দুনিয়ার সংশোধনের কাজে আরও কিছুদিন থেকে যেতে পার। এই উত্তরে খোদার সেই বান্দা বলেছিল, 'আমি আপনার কাছে যাওয়াকেই বেশী পসন্দ করি।'

এই কথা যখন আঁ হযরত (সাঃ) উপস্থিত সাহাবাগণের (রাঃ) কাছে বললেন, তখন হযরত আবুবকর (রাঃ) কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। এতে সাহাবারা সবাই এই ভেবে বিস্মিত হয়ে গেলেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তো বিজয়ের কথাই বলছেন অথচ আবুবকর (রাঃ) কাঁদছেন কেন? হযরত উমর (রাঃ) বলেছেন, 'আমি বলেই ফেললাম, এই বুড়োর হলোটা কি? খুশীর খবর শুনে কাঁদছে কেন? কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জানতেন যে, আবুবকরই তাঁর কথা সঠিকভাবে উপলব্ধি

করতে পারতেন। তাই, তিনিই (রাঃ) কেবল এটা বুঝতে পেরেছিলেন যে, সূরার মধ্যে আঁ হযরত (সাঃ)-এর ওফাতের সংবাদ দেওয়া হয়েছে।

আঁ হযরত (সাঃ) বললেনঃ 'আবুবকর আমার কাছে খুবই প্রিয়। যদি আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে সীমাহীনভাবে ভালবাসা বৈধ হতো, তাহলে আমি সেভাবেই আবুবকরকে ভালবাসতাম।'

> 'হে লোক সকল! মসজিদে যত লোকের জন্য দরজা খোলা হতো আজ থেকে সেই সব দরজাই বন্ধ হয়ে যাবে, একমাত্র আবুবকরের দরজাই খোলা থাকবে।'

এই কথার মধ্যে এই ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত ছিল যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পর প্রথম খলীফা হবেন হযরত আবুবকর (রাঃ) এবং নামায পড়াবার জন্য মসজিদের ঐ দরজা দিয়ে তাঁকেই (রাঃ) আসতে হবে।

এই ঘটনার বেশ কিছুদিন পরে, যখন হযরত উমর (রাঃ) খলীফা ছিলেন, তখন একদিন তিনি মসজিদে বসে বলেছিলেনঃ

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۝

বলো দেখি সূরাটির মধ্যে কি বিষয়ে বলা হয়েছে?' কথাটি তিনি এমনভাবে বললেন যেন তিনি উপস্থিত সকলের পরীক্ষা নিচ্ছেন। সম্ভবতঃ তখন তাঁর মনে সূরাটি নাযিল হওয়ার সময়ের কথা মনে পড়েছিল। সুরাটি নাযিল হওয়ার সময় ইব্নে আব্বাসের (রাঃ) বয়স ছিল ১০/১২ বছর, এখন তার বয়স ১৭/১৮ বছর। অন্যান্য সাহাবী যখন কেউ কিছুই বলছিলেম না, তখন ইব্নে আব্বাস বললেনঃ

> 'হে আমীরুল মুমেনীন! এই সূরাটির মধ্যে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মৃত্যুর খবর দেওয়া হয়েছিল। কেননা, নবী যখন তাঁর কাজ সমাধা করেন, তখন তিনি আর দুনিয়াতে থাকতে চান না।'

হযরত উমর (রাঃ) বললেনঃ 'তুমি ঠিক বলেছ। আমি তোমার বুদ্ধির জন্য তোমাকে বাহ্বা দিচ্ছি। যখন এই সূরা নাযিল হলো, তখন একমাত্র আবুবকর (রাঃ)-এর মর্ম বুঝতে পেরেছিলেন, আমরা কেউ বুঝতে পারিনি।' অবশেষে সেই দিন এসে গেল, যা প্রত্যেক মানুষের জন্যই আসে। মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) দুনিয়াতে তাঁর কাজ সম্পূর্ণ করেছেন। আল্লাহ্র বাণী সম্পূর্ণরূপে এবং সফলরূপে নাযিল হয়েছে। মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পবিত্রকরণ শক্তি দ্বারা একটি নতুন জাতির, এবং সেই সঙ্গে এক নতুন আসমান ও এক নতুন যমীনের বুনিয়াদ স্থাপন করা হয়েছে। বপনকারী যমীনে হাল দিয়েছেন, পানি দিয়েছেন এবং বীজ

বপন করেছেন এবং ফসল উৎপন্ন হয়েছে। এখন ফসল তোলার জিম্মা তাঁর নয়। তিনি ছিলেন একজন মজদুরের মত। এবং একজন মজদুরের মতই এই দুনিয়া ছেড়ে তিনি চলে যাবেন। কেননা, তাঁর পুরস্কার এই দুনিয়ার কোন বস্তু নয়। বরং তাঁর পুরস্কার হচ্ছে তাঁর স্রষ্টা ও তাঁর প্রেরণকর্তার সন্তুষ্টি। যখন ফসল তোলার সময় এলো, তখন তিনি তাঁর প্রভুর কাছে এটাই বল্লেন যে, তাকে যেন দুনিয়া থেকে উঠায়ে নেওয়া হয়। এবং ফসল যেন পরে অন্যেরা তোলে।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) অসুস্থ অবস্থায়ও কিছুদিন কষ্ট করেই মসজিদে নামায আদায় করতে আসতে থাকলেন। কিন্তু শেষে মসজিদে আসার সেই শক্তিটুকুও আর রইলো না। সাহাবীরা (রাঃ) কখনই এটা চিন্তা করতে পারতেন না যে, তিনি (সাঃ) মারা যাবেন। যদিও তিনি (সাঃ) তাঁদেরকে বারবার তাঁর আসন্ন মৃত্যুর খবর দিচ্ছিলেন। একদিন সাহাবারা (রাঃ) সকলেই বসা ছিলেন, তখন রসূলে করীম (সাঃ) বললেনঃ

'কোন ব্যক্তির যদি কোন ভুল হয়ে যায়, তবে তার সংশোধন দুনিয়াতে হওয়াই ভাল, যাতে তাকে আর খোদার সামনে লজ্জিত হতে না হয়। যদি আমার দ্বারা অজান্তে কখনও কারো কোন ক্ষতি হয়ে গিয়ে থাকে, তবে সে তা এখন পূরণ করে নিক। কিংবা আমি যদি কাউকে না বুঝে সুঝে কোন কষ্ট দিয়ে থাকি, তবে সে তার প্রতিশোধ আজ নিয়ে নিক। কেননা, আমি চাই না যে, আমি খোদাতায়ালার সামনে লজ্জিত হই। একথা শুনে তো সাহাবারা বিব্রত ও বিচলিত হয়ে পড়লেন, এবং তাঁরা সবাই এটাই ভাবতে লাগলেন যে, হায়! হায়! কী ভাবে, কত কষ্ট করে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে আরামে রাখবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতেন। কীভাবে তিনি নিজে না খেয়ে তাদেরকে খেতে দিতেন, নিজের কাপড়ে তালি লাগিয়ে লাগিয়ে তাদেরকে কাপড় পরতে দিতেন। তথাপি, তিনি তাদেরকে বলছেন, যদি তিনি কখনও না বুঝে সুঝে কারো কোনও ক্ষতি করে থাকেন বা কাউকে কোন কষ্ট দিয়ে থাকেন, তাহলে সে যেন তার বদলা আজ নিয়ে নেয়। কিন্তু দেখা গেল যে, একজন সাহাবী এগিয়ে এলেন এবং বললেনঃ

'ইয়া রসূলাল্লাহ্! আপনি আমাকে কষ্ট দিয়েছিলেন, যুদ্ধের জন্য সারিবদ্ধ হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছিল। আপনি লাইন থেকে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন আপনার কনুই আমার শরীরে লেগেছিল। যেহেতু আপনি বলছেন যে, সমান্য হলেও যদি আপনি কাউকে কোন কষ্ট দিয়ে থাকেন, তার ও প্রায়শ্চিত্ত পৃথিবীতে হয়ে যাওয়াই ভাল, সেহেতু আমি আমার সেই কষ্টের প্রতিশোধ নিতে চাই।'

উপস্থিত সকল সাহাবী (রাঃ) যাঁরা শোকের সাগরে নিমগ্ন হয়ে ছিলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁদের অবস্থায় পরিবর্তন ঘটে গেল। তাঁদের চোখে রক্ত উঠে গেল এবং প্রত্যেকেই মনে করলেন যে, এই ব্যক্তি যে এই সময়ে উপদেশ গ্রহণের পরবর্তে এই ধরনের কথা বলছে, সে কঠিন শাস্তিরযোগ্য। কিন্তু ঐ সাহাবী কোন পরওয়াই করলেন না।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, 'তুমি ঠিক বলেছ। তোমার অধিকার আছে প্রতিশোধ গ্রহণ করো।'

এই কথা বলে তিনি পাশ ফিরলেন এবং তাঁর পিঠ ঐ সাহাবীর দিকে দিয়ে বললেন, 'তুমি আমাকে কনুই মারো।' সেই সাহাবী বললেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্! আপনার কনুই যখন আমার পিঠে লেগেছিল, তখন আমার শরীর নাংগা ছিল, কেননা তখন আমার কাছে পরার মত কোন জামা ছিল না।'

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, 'ঠিক আছে, আমার গায়ের কোর্তাটা উঠায়ে আমার নাঙ্গা শরীরে কনুই মেরে তোমার প্রতিশোধ নিয়ে নাও। সেই সাহাবী তাঁর শরীরের কোর্তা উঠালেন এবং তিনি (রাঃ) তাঁর দুই কম্পিত ঠোঁট ও অশ্রু ঝরানো চোখ নিয়ে আঁ হযরত (সাঃ)-এর পিঠে চুম্বন দিলেন।'

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, 'এ তুমি কি করছ?'

ঐ সাহাবী বললেন, 'আপনি যখন বলছেন যে, আপনার মৃত্যু নিকটবর্তী, তখন আপনাকে স্পর্শ করবার এবং আপনাকে আদর করবার সুযোগ আমি আর কখন পাব? সন্দেহ নেই, যুদ্ধের সময় আমাকে আপনার কনুই লেগেছিল বটে, কিন্তু কার প্রাণ চাইবে যে, সেই কনুই লাগার বদলা নিয়ে নেয়? আমার মনে হলো, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন বলছেন যে, আজ তাঁর কাছ থেকে প্রতিশোধ নেওয়া যাবে, তখন আমি কেন এই বাহানায় তাঁকে একটু আদর করে নেই না ?'*

যে সকল সাহাবী এতক্ষণ ক্রোধে অস্থির হযেছিলেন, এই কথা শুনে তাঁদের প্রত্যেকের হৃদয় এই আফসোসে ভরে গেল যে, 'আহা' এই সুযোগ যদি আমিও নিতাম।'

অসুখ বাড়তে থাকলো। মৃত্যুও নিকটতর হতে থাকলো। মদীনায় আগের মতই সূর্য উঠছিল, আগের মতই আলো ছড়াচ্ছিল। কিন্তু সাহাবাদের চোখে

** বুখারী : কিতাবুল মাগাযী,*

অন্ধকার ঘনায়ে আসছিল। দিনের আলো বৃদ্ধি পাচ্ছিল, সাহাবাদের চোখের সামনে আঁধারের পর্দা ভারী হয়ে উঠছিল। অবশেষে, সেই সময় এসে গেল, যখন আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)-এর রূহ্ দুনিয়া ছেড়ে আপন স্রষ্টার সমীপে গিয়ে উপস্থিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামের শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হতে লাগলো, শ্বাস নিতে তাঁর কষ্ট হতে লাগলো। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে বললেন,

'আমার মাথা তোমার বুকের উপরে উঠিয়ে নাও। শুয়ে শুয়ে শ্বাস নিতে আমার কষ্ট হচ্ছে।'

হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁর মাথা বুকে তুলে নিয়ে হেলান দিয়ে বসলেন। মৃত্যুর কষ্ট তাঁর (সাঃ) উপরে প্রভাব বিস্তার করছিল। তিনি (সাঃ) একবার এদিকে একবার ওদিকে মাথা নাড়াচ্ছিলেন এবং বলছিলেন, 'আল্লাহ্‌র লানত ইহুদীদের ও নাসারাদের উপরে, কেননা তারা তাদের নবীদের মৃত্যুর পর তাঁদের (আঃ) কবরগুলোকে মসজিদ বানিয়েছে' (অর্থাৎ করবগুলোকে পূজো করছে)।*

এটাই ছিল, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামের শেষ উপদেশ তাঁর উম্মতের জন্য। তাঁর উম্মতের প্রতি তাঁর শেষ উপদেশ ছিল, 'তোমরা আমাকে সকল নবীর চাইতে বেশী মর্যাদায় দেখতে পাবে, সকলের চাইতে বেশী সফলকাম দেখতে পাবে, তোমরা এটা যেন কখনই ভুলে যেও না যে, আমি আল্লাহ্‌র বান্দা। মনে রাখবে, খোদার মাকাম খোদারই। আমার কবরকে তোমরা কখনও একটা কবরের চেয়ে বেশী কিছু মনে করো না অন্যান্য উম্মতেরা তাদের নবীদের কবরগুলোকেই মসজিদ বানিয়ে সেখানে বসে তারা চিল্লাকুশী করে, নযরনেয়াজ দেয়। কিন্তু তোমরা এসব কখনই করবে না। তোমাদেরকে খাড়া করা হয়েছে আল্লাহ্‌র এবাদত করার জন্য।'

এই কথাগুলি বলার সময়ে তাঁর (সাঃ) চোখ বন্ধ হয়ে আসল এবং তাঁর (সাঃ) মুখে উচ্চারিত হচ্ছিলঃ

إِلَى الرَّفِيقِ الْأَعْلَى إِلَى الرَّفِيقِ الْأَعْلَى

(আমি আরশে মোয়াল্লায় অধিষ্ঠিত আমার দয়াল বন্ধুর কাছে যাচ্ছি এই কথা বলতে বলতে তাঁর (সাঃ) রূহ দেহ ছেড়ে চলে গেল।।

---

* *বুখারী : কিতাবুল মাগাযী*

আঁ হযরত (সাঃ)-এর মৃত্যুতে সাহাবাগণের অবস্থা

এই খবর যখন মসজিদের মধ্যে সাহাবারা (রাঃ) পেলেন (তাঁদের প্রায় সকলেই নিজেদের কাজকর্ম ছেড়ে মসজিদে এসে অপেক্ষা করছিলেন আঁ হযরত (সাঃ)-এর স্বাস্থ্যের কোন ভাল খবর শোনার আশায়) তখন তাঁদের উপরে পাহাড় ভেঙ্গে পড়লো। হযরত আবুবকর (রাঃ) ঐ সময়ে কিছুক্ষণের জন্য কোন কাজে বাইরে গিয়েছিলেন। হযরত উমর (রাঃ) মসজিদেই ছিলেন। তিনি যখন ঐ কথা লোকদেরকে বলতে শুনলেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এন্তেকাল করেছেন, তখন তিনি খাপ থেকে তরবারি বের করলেন এবং বললেন, 'আল্লাহ্‌র কসম! যে ব্যক্তি এই কথা বলবে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মারা গেছেন, আমি তাঁর কল্লা উড়ায়ে দিব। এখনও পর্যন্ত দুনিয়াতে মুনাফেকরা রয়ে গেছে, সুতরাং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মারা যেতে পারেন না। যদি তাঁর রূহ দেহ থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে থাকেও, তবে স্রেফ মূসা (আঃ)-এর মত আল্লাহ্‌র সহিত সাক্ষাতের জন্যে গেছে, তা আবার ফিরে আসবে, এবং দুনিয়ার সব মুনাফেকদের কল্লা ক্বীমা করে ছাড়বে।' এই বলে উন্মুক্ত তরবারি হাতে নিয়ে ঐ মর্মবিদারী খবরের আঘাতে পাগলের মত এদিকে সেদিকে টলতে থাকলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ কথাই বলতে থাকলেন, 'যদি কেউ বলে যে, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মারা গেছেন, তবে আমি তাকে কতল করবো।' সাহাবারা (রাঃ) বলেছেন যে, যখন আমরা হযরত উমরকে এ ভাবে টলতে দেখলাম, তখন আমাদেরও মনে সংশয়ের সৃষ্টি হল এবং আমরাও বলতে লাগলাম, উমর ঠিকই বলেছেন, রসূলুল্লাহ্ এন্তেকাল করেননি। লোকেরা নিশ্চয় ভুল করছে। এবং উমরের কথা শুনে আমরাও মনে মনে সান্ত্বনা লাভের চেষ্টা করলাম। এই সময়ে কিছুলোক দৌড়ে গিয়ে হযরত আবুবকরকে (রাঃ) এই অবস্থার খবর দিলেন। তিনিও মসজিদে এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু কারো সাথে কোনও কথা না বলে সরাসরি ভিতরে চলে গেলেন। এবং হযরত আয়েশাকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন,

'রসূলুল্লাহ্ (সঃ) কি এন্তেকাল করে গেছেন?

হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, 'হ্যাঁ।'

তখন হযরত আবুবকর (রাঃ) হযরত রসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) কাছে গেলেন, মুখের উপর থেকে কাপড় সরালেন এবং তাঁর কপালে চুমু দিলেন। তাঁর চোখ থেকে ভালবাসায় টলমল করা অশ্রু বিন্দু টপটপ করে ঝরতে লাগলো। তিনি বললেন, 'আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্‌তা'লা আপনার উপরে দু'বার মৃত্যু পাঠাবেন না। (অর্থাৎ, এটা হতে পারে না যে, একদিকে আপনি দৈহিকভাবে মৃত্যুবরণ করবেন,

অপরদিকে, আপনার উপরে দ্বিতীয় মৃত্যু এভাবে আসবে যে, আপনার জামাত ভুল বিশ্বাস ও ভুল ধারণার মধ্যে নিপতিত হবে)। এই কথা বলে তিনি বাইরে এলেন। এবং কারো সাথে কোন কথা না বলে ভীড় ঠেলে মিম্বরের দিকে এগিয়ে গেলেন। যখন তিনি মিম্বরের উপরে খাড়া হলেন, তখনও হযরত উমর উন্মুক্ত তরবারি হাতে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন।

উদ্দেশ্য, যদি আবুবকর (রাঃ) বলেন, যে, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মারা গেছেন, তাহলে, তিনি তাঁকে হত্যা করবেন। যখন তিনি (রাঃ) কথা বলতে শুরু করলেন তখন হযরত উমর (রাঃ) তাঁর কাপড় ধরে টানতে লাগলেন, এবং তাঁকে চুপ করাতে চাইলেন। কিন্তু, হযরত আবুবকর (রাঃ) ঝট্‌কা টান দিয়ে তাঁর হাত থেকে কাপড় ছাড়ায়ে নিলেন এবং কোরআন শরীফের এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন,

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ

অর্থাৎ, হে লোক সকল, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তো আল্লাহ্‌তায়ালার রসূল। তাঁর পূর্বে বহু রসূল গত হয়ে গেছেন। এবং তাঁরা সবাই মারা গেছেন। কেন, তিনিও যদি মারা যান অথবা নিহত হন, তাহলে কি তোমরা তোমাদের ধর্মকে ছেড়ে দিয়ে ফিরে যাবে? ধর্ম তো খোদার, ধর্ম তো মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নয়। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৪৫)-এই আয়াত নাযিল হয়েছিল ওহোদের যুদ্ধের সময়, যখন মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) শহীদ হয়ে গেছেন, এই গুজব শুনে বহুলোক নিরুৎসাহ হয়ে বসে পড়েছিল। এই আয়াত পাঠ করে হযরত আবুবকর (রাঃ) বললেন,

مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللّٰهَ فَإِنَّ اللّٰهَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ

'তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ্‌র এবাদত করতো তার মনে রাখা উচিৎ যে, আল্লাহ্‌তায়ালা চিরঞ্জীব, তাঁর উপরে কখনই মৃত্যুর প্রভাব পড়ে না।

وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ

'এবং যে ব্যক্তি মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর এবাদত করতো, তাকে আমি বলে দিতে চাই যে, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মারা গেছেন।'

হযরত উমর (রাঃ) বলেছেন, যখন আবুবকর (রাঃ) 'ওমা মুহাম্মাদুন ইল্লা রসূলুন' আয়াত পড়তে শুরু করলেন, তখন আমার সম্বিৎ ফিরতে লাগলো। এবং আয়াত তেলাওয়াত শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার আধ্যাত্মিক চক্ষু খুলে গেল। এবং আমি বুঝতে পারলাম যে, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সত্যি সত্যি মারা

গেছেন। তখন আমার হাঁটু কাপতে লাগলো এবং আমি নাচার হয়ে মাটিতে পড়ে গেলাম। সেই ব্যক্তি যে আবুবকর (রাঃ)-কে কতল করতে উদ্যত ছিল, সে নিজেই আবুবকরের (রাঃ) সত্যভরা শব্দগুলো দ্বারা কতল হয়ে গেল। সাহাবারা (রাঃ) বলেছেন, 'ঐ সময় আমাদের অবস্থা এত শোচণীয় হয়েছিল যে শোকের আঘাতে ঐ আয়াত আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম। ঐ সময়ে হাস্‌সান বিন্ সাবেত, যিনি মদীনার একজন খুব বড় কবি ছিলেন তিনি এই কবিতাটি আবৃত্তি করলেনঃ

كنت السواد لناظرى فعمى عليك الناظر

من شاء بعدك فليمت فعليك كنت أحاذر

(হে মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)! 'তুমি তো ছিলে আমার চোখের পুতুলী, আজ তোমার মৃত্যুতে আমার চোখ অন্ধ হয়ে গেল; আমার ভাই মরুক, ছেলে মরুক বা আমার স্ত্রী মরুক, কারো মৃত্যুতেই আমি পরওয়া করি না। আমি তো কেবল তোমারই মৃত্যুর ভয় করছিলাম)।' *

এই কবিতা ছিল প্রতিটি মুসলমানের প্রাণের ধ্বনি। এরপর বহুদিন ধরে মুসলমান পুরুষ, মুসলমান নারী, মুসলমান ছেলেমেয়েরাও মদীনার পথে পথে এই কবিতা আবৃত্তি করতো আর ঘুরে বেড়াত ঃ

'হে মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম তুমি তো ছিলে আমাদের চোখের পুতুলী, তুমি মারা গেলে তো আমরা অন্ধ হয়ে গেলাম। এখন যদি আমাদের নিকট আত্মীয়, কোন প্রিয়জন মারা যায়, তাতে আমাদের কোন পরওয়া নেই। আমাদের তো কেবল তোমার মৃত্যুর ভয় ছিল।' ....

'আল্লাহুম্মা সাল্লেআলা মুহাম্মাদেঁও ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন ওয়া বারেক ওয়া সাল্লেম, ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ'।

* *আস্ সিরাতুল হালবিয়া : ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৭৩*